শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তি"

(১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, ১৩২৬ সাল।)

মঙ্গলাচরণম্।

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসু-নিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্ব-কর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎ-পাদাম্ভোরুহ-যুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

নববর্ষে প্রার্থনা।

নব-বরষের শুভ পরভাতে
তোমায় চরণ স্মরিয়া।
গত-বরষের যাহা কিছু সব
ও চরণে দিনু ঢালিয়া॥

আকুল পরাণে ব্যাকুলিত হ'য়ে
দুয়ারে তোমার দাঁড়ায়ে।
অযোগ্য বলিয়া চা'বেনা কি ফিরি?
দিবেনা কি বল হৃদয়ে?॥

দাও হৃদে-শক্তি বিশুদ্ধা ভকতি
ত্রিতাপ-তাপিত পরাণে।
তোমার-ই শিক্ষা যাচিয়া বেড়াই
আমার সারাটি জীবনে॥

ওহে ও দয়াল! বিতরি করুণা
মলিন মানস-দর্পণে।
করহে অঙ্কিত ভাবের প্রতিমা
দাও শক্তি "ভক্তি" সেবনে॥

নববর্ষারম্ভে বক্তব্য।

—:০:—

সাধক বলিয়াছেন ;—"আর কোন ধন চাইনা আমি, দাস হব হে অভিলাষী।" বড় সুন্দর—বড় প্রাণারাম কথা। দাস হ'তে চায় কেন, না দাস প্রভুর সেবা করিয়া আনন্দ পায় ; আর সেই সেবা-জনিত আনন্দের কাছে সে ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ বোধ করে, তাই তাহার দাস হ'বার—সেবক হ'বার জন্য এমন প্রাণ খোলা প্রার্থনা।

হয়তো কেউ বলিবেন সেবানন্দ কি এতই সুখের ? তা হবেই বা না কেন ; শ্রীভগবান নিজেই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

"সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্য সামীপৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

অর্থাৎ, আমি (ভগবান) আমার ভক্তকে সালোক্য (আমার সহিত সমান লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (আমার নিকট বাস), সারূপ্য (আমার সমান রূপ) একত্ব (আমার সহিত এক হওয়া) এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলে বা কেহ দিলেও তাঁহারা আম্যর (ভগবানের) সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে চায়না বা গ্রহণ করেনা।

সেবানন্দের সুখ এমন না হইলে কেন সকল ত্যাগ করিয়া ভক্ত কেবল সেবা লইয়াই পড়িয়া থাকিতে চায়। তবে সেবানন্দের কথা কেবল মাত্র লোক মুখে বা শাস্ত্রমুখে শুনিয়া গেলেই হইবেনা, সেবা করা চাই। সে কমই হউক আর বেশীই হউক।

যাঁহার আদেশরূপ কৃপাশক্তি লইয়া অযোগ্য হইয়াও এই কয়েক বৎসর ভক্তিদেবীর সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি, তিনি ৮ বৎসর ভক্তি চালাইয়া ৯ম বর্ষ হইতে ভক্তির সেবা কার্য্য এদীন হীনকে দিয়া বলিয়াছিলেন,—"বৎস! নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, সময় বৃথা নষ্ট করিওনা, মঙ্গলময় নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন।" আরও বলিয়াছিলেন, "ভয় বা বৃথা চিন্তা করিয়া

নির্ভরতায় কলঙ্ক করিওনা, তিনি যখন যেমন রাখিবেন তাহাই উত্তম বলিয়া জানিবে।" এইরূপ আদেশের সঙ্গে সঙ্গে যেদিন হইতে সেবা কার্য্য পাইলাম, সেইদিন হইতেই তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। কিন্তু দুর্ব্বল মন সর্ব্বদা সে ভাব ঠিক রাখিয়া, সে অমূল্য উপদেশ বাক্য স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে পারেনা। আর তাই পারিনা বলিয়াই মধ্যে মধ্যে দারুণ যন্ত্রণাপ্রদ আঘাত পাই ও বিচলিত হইয়া পড়ি।

যাহা হউক এইভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই অযোগ্য হইলেও এ কাঙ্গালের হাতে আজ ৯ বৎসর ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া সেবা লইয়া আসিতেছেন, প্রতিবারের ন্যায় এবারেও আবার ভক্তির পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক উৎসাহ দাতা সকলের নিকট সানুনয় প্রার্থনা তাঁহারা যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় যথানুরূপ সাহায্য দানে কুণ্ঠিত না হয়েন।

ভক্তি, নিজ মহীয়সী ক্ষমতাবলে ক্রমে আজ সপ্তদশ বর্ষ পার হইয়া ১৮শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন, ইহাতে বাহাদুরী আমার কিছুই নাই, বরং যাহা কিছু ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহাই আমার, তজ্জন্য ভক্তিদেবী মোটেই দায়ী নহেন। তিনি সর্ব্বদাই নিষ্কলঙ্কিনী।

মনে মনে বড়ই সাধ হয়, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই ভক্তির সেবায় নিযুক্ত দেখি। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার কবে হইবে বলিতে পারিনা। স্বীকার করি আমাদের শত ত্রুটী আছে, কিন্তু সেগুলি দেখাইয়া দিয়া পুনরায় যাহাতে তদ্রূপ না হয় তজ্জন্য উপদেশ দেওয়ার লোকও যে আমরা পাইতেছিনা; যাহা দু'একজন পাইয়াছিলাম অদৃষ্ট ক্রমে তাঁহারাও একে একে নিজ নিজ সাধনোচিত ধামে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের ভাগ্যক্রমে উৎসাহ দিবার লোক না মিলিলেও যাহাতে ভক্তিদেবীর সেবা হইতে আমি অবসর লই তাহার জন্য প্রকারান্তরে অনেকেই অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন। আপত্তি নাই—যাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি তাহাই করুন, তাহাতে আপত্তি করিবার বা বলিবার কিছু নাই; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যতদিন দেবী নিজে না নির্দ্দয়া হইবেন ততদিন লোকের কথায় এ সেবা হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবেনা, ইহাই বিশ্বাস। আমার ন্যায় ভিক্ষা-পাত্র-মাত্র সার ব্যক্তি এত বড় কথা কেন বলে, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া এখানে বলিব।

আর্থিক লাভের প্রত্যাশা, যশের প্রত্যাশা বা কাগজ বাহির করিয়া দশজনের একজন হইয়া "বড় বনিয়া" যাইবার প্রত্যাশা যদি থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিন মাদৃশ দীন-ভিখারী কাগজ চালাইতে পারিতনা। তবে কেন এ প্রয়াস, তদুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে, "যাঁহার কৃপায় অজ্ঞানান্ধকারময় জীবনেও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, যিনি নিজগুণে কৃপা করিয়া নিজ-শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বুঝাইয়া এ পথে চালাইয়াছিলেন, তাঁহার আদেশ পালন।" অন্যের পক্ষে ইহা যেমনই হউক আমার কাছে কিন্তু এ আদেশ পালন মহামহিমাময় বলিয়াই মনে হয়, তাই যে মত করিয়াই হউক, ভক্তির সেবা লইয়া পড়িয়া আছি। ভক্তির যাহা আয় তদ্দারা ভক্তির খরচা বাদে কিছুই থাকেনা, আর আমারও তেমন সামর্থ নাই যে, যদ্দারা ভক্তিকে আরও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া—কলেবর বৃদ্ধি করিয়া প্রকাশ করি। সেই কারণে ভক্তির জন্যই ভক্তির গ্রাহক, পাঠক, অনুগ্রাহক, উৎসাহদাতা সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। জন-সমাজে যতই ভক্তির প্রচার বৃদ্ধি হইবে প্রকারান্তরে যতই আয় বাড়িবে ভক্তিও ততই নানা প্রকার অঙ্গ-সৌষ্ঠবে সুশোভিতা হইবেন।

পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি এখনও আবার বলিতেছি, ভক্তি আমার নিজস্ব অথবা আরের সম্পত্তি নয়, এ সর্ব্বসাধারণের জিনিস, যিনি ইচ্ছা করিবেন তিনিই ভক্তি-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। এবং যাঁহার দ্বারা যত টুকু সাহায্য হইবে, দেখিবেন ভক্তি ততটুকুই উন্নত হইয়াছেন। এ বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে এইমাত্র ব্যক্তব্য যে, এই ১৭শ বৎসর যাবৎ যে সকল মহাত্মাগণ ভক্তিদেবীর সেবার নিমিত্ত, অর্থ, প্রবন্ধ, গ্রাহকসংগ্রহ এবং সদুপদেশাদি যে কোন প্রকারেই হউক সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের সকলকেই আমরা ভক্তির পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, আর যাহাতে আগামী বর্ষেও এইরূপ অনুগ্রহ থাকে তজ্জন্যও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি আশা করি আমাদিগের নিবেদন অরণ্যে রোদন হইবেনা। অলমিতি।

বিনীত—

বৈষ্ণব-দাসানুদাস "ভক্তি-সেবক।"

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

(৩)

বৃন্দাবন দাসকে দেনুড়ে রাখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে গিয়াছিলেন এ সংবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। নীলাচল হইতে ফিরিবার সময় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট হইতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত টীকা টীপ্পনি সমেত একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লইয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবন দাসকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটই ভাগবত অধ্যয়ন করেন।

"নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঁও এই অভিমত॥"

বৃন্দাবন দাস যে নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য তৎসম্বন্ধেও নিজ গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

"ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥"

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়না বরং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ন্যায় আকুমার ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়াই শুনা যায়। কত বৎসর বয়সে বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব হয় তাহার কোনও বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়না। পূর্ব্বোক্ত অচ্যুত বাবু ও দীনেশ বাবুর মতে ১৫১১ শকে কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব বলিয়া স্থির হইয়াছে। আবার অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় অনুমান করেন ১৫১৫ শকে বৃন্দাবনদাসের তিরোভাব হয়।

আমরা ১৫১১ শকে তিরোভাব স্বীকার করিতে পারিনা, কারণ গ্রন্থান্তরে দেখি ১৫১৩ শকে নরোত্তম ঠাকুর খেতুরি গ্রামে মহোৎসব করেন এবং তখন শ্রীজাহ্নবাগোস্বামিনীর সহিত তথায় বৃন্দাবন দাস উপস্থিত ছিলেন। প্রবাদ যে, বৃন্দাবন দাস খেতুরি হইতে মহোৎসব দর্শনান্তে দেনুড়ে আসিয়া, তক্ক

রামহরিকে নিজ পাটবাটীর সেবা-ভার অর্পণ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন ও তথায় অল্পদিন বাস করিয়া লীলা সম্বরণ করেন। শ্রীশ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনীতে যে পদ-কর্ত্তৃগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, গ্রন্থকার ৮২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান বলিয়া লিখিয়াছেন যদি ১৪২৯ শকে জন্ম হয় আর ৮২ বৎসর বয়সে তিরোভাব হয় তাহা হইলে ১৫১১ শকই তিরোভাবের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় কিন্তু যখন ১৫১৩ শকে খেতুরির মহোৎসব বর্ণনা রহিয়াছে ও তাহাতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উপস্থিতি রহিয়াছে তখন ১৫১১ শকে তিরোধান স্বীকার করা যায় কিরূপে। এ ক্ষেত্রে আমরা ১৫১৫ শকের অনুমানই মানিয়া লইতে বাধ্য হইলাম।

এইবার আমরা উক্ত মহাপুরুষের গ্রন্থ সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করিলে গ্রন্থাকার বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে একজন সুপণ্ডিত ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী কবি বলিয়াই স্বভাবতঃ মনে হয়। যদিও গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন, তথাপি এমন মধুরতা পরিপূর্ণ যে, আলোচনা করিলে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও অনেক অপ্রচলিত শব্দ তাঁহার রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পয়ারের অক্ষরের ও মিলের যদিও সকল স্থানে সামঞ্জস্য নাই তথাপি কবির কবিত্বগুণে ও ভাবের প্রাবল্যে উপলব্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটেনা। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ের অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা ও বহু শাস্ত্র প্রকাশক লোক-গুরু প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলিয়াছেন ;—

"* * * শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের আদি গ্রন্থ,—বঙ্গভাষার আদি মহাকাব্য। এই মহাগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে কি এক অলৌকীক মহাশক্তি অনুপ্রাণিত। যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এই মহাগ্রন্থের অনুশীলন বা সেবা করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত মানবকৃত প্রশংসার সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারেনা। এই মহাগ্রন্থের গুণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলে ভাষার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে,—

মনুষ্যের প্রতিভা ও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়া উঠে;—সমস্ত শক্তিই যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়।" আরও বলিয়াছেন—

"নর-জগতে প্রেমের ভাষা নাই; যদি থাকে, সে ভাষা পরিস্ফুট নহে। এ কথা অনেকের নিকট সত্য,—আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, এই মহামহিমান্বিত গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে প্রেমেরই ভাষা পরিস্ফুট হইয়াছে। না হইবে কেন? গ্রন্থের প্রতিপাদ্য পরদেবতা যিনি, তিনি প্রেমময়, তাঁহার পার্ষদগণও প্রেমময়, তাঁহাদিগের লীলা তরঙ্গও প্রেমময়, কবিও একজন মহাপ্রেমিক,—তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রেমে অহরহ মাতুয়ারা; সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে যে প্রেমের অক্ষয় অমিয়-ধারা প্রবাহিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রেমের অমিয়মন্দাকিনী। এই মন্দাকিনীর অমৃতজলে যিনি অবগাহন করিবেন, সংসারের পাপতাপ তাঁহার নিকট হইতে দূরে রহিবে, প্রেমের তরঙ্গে মনপ্রাণ অনুক্ষণ আন্দোলিত হইতে থাকিবে, আর সংসারের জ্বালাময়ী যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়াও তিনি সংসারের অতীত রাজ্যেই বিচরণ করিতে থাকিবেন। এই নিমিত্তই পূজ্যপাদ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী জগদ্বাসীর নিকট মুক্তকণ্ঠে এই সুসংবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন:—

"ওরে মূঢ় লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইএর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেই মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতে করিতে প্রকৃতই মনে হয়—

"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥"

বস্তুতঃ প্রেমের নিগূঢ় মহিমা,—ভক্তিতত্ত্বের সমগ্র সংসিদ্ধান্ত এই মহাগ্রন্থে সরল ও সুললিত ভাষায় অতি সুন্দর সমালোচিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থও বঙ্গভাষায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। চারিশত বৎসরের পূর্ব্বকালীন বঙ্গীয় সমাজের অতি বিচিত্র চিত্র এই গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণেই চিত্রিত হইয়াছে।"

এ সম্বন্ধে আর কত বলা যায়, আর এতদপেক্ষা বলেই বা কি করিয়া। এক্ষণে কবিরাজ গোস্বামী যে, চরিতামৃতের মধ্যলীলায় দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন ;—

আচার্য্য গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
তারে নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিল ভগবান ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিঁহো হইলা মুর্চ্ছিত।
অচেতন হইয়া তিঁহো পড়িলা ভূমিত ॥
আস্তে ব্যস্তে আচার্য্য গোসাঞি তারে কৈল কোলে।
শ্বাস রহিত দেহ দেখি হইলা বিকলে ॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥
অনেক করিল তভো না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল।
'উঠহ গোপাল' বলি উচ্চ স্বর কৈল ॥
শুনিতেই গোপালদাসের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥

এই লীলা বলিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপে ইহা করিল বর্ণন॥

এই যে বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার কথা বলিতেছেন, ইহা কিন্তু আমরা চৈতন্য ভাগবতের মধ্যে দেখিতে পাইনা। সুতরাং বলিতে হয় যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে অথবা অপ্রকাশিত ভাবে কোথাও পড়িয়া আছে। ১৩১৭ সালে কালনা "ভক্তি-তত্ত্ব-প্রচারালয়" হইতে "শ্রীচৈতন্যভাগবতের, অন্ত্যলীলা, অপ্রকাশিত অংশ" নাম দিয়া একখানি তিন অধ্যায় পদ্য গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল এবং সেখানি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাহার ভাষার ও রচনা প্রণালীর ভাব দেখিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের রচিত বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলা। হয়ত অন্য কোন বৃন্দাবন দাস নামধারী ব্যক্তি উহা রচনা করিয়া থাকিবেন। অবিশ্বাসের আরও একটী প্রধান কারণ এই যে, যে গোপালের বিষয়টী চৈতন্য ভাগবতে নাই বলিয়া অংশ বিশেষ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া চৈতন্য ভাগবতের অসম্পূর্ণতা কীর্ত্তন করিয়াছি উক্ত কালনার প্রকাশিত গ্রন্থেও উহা দেখিতে পাই নাই। কাজেই আমরা উহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক যত দূর আমরা চৈতন্যভাগবতের প্রকাশ সর্ব্ববাদি সম্মত দেখিতে পাই তাহার আলোচনা করিতে পারিলেই জীবন ধন্য হয়। এবং শত মুখে গ্রন্থকারের জয় ঘোষণা না করিয়া পারা যায় না। আর অধিক বাহুল্য না করিয়া আমরা এই খানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম, ভক্ত পাঠকগণ একবার প্রাণ ভরিয়া বলুন—জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়, জয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়। জয় ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের জয়। আগামীবার হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনী আলোচনার চেষ্টা করিব।

ভগবদাবির্ভাবের কারণ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।)

—:০:—

পাঠকগণ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-তত্ত্বের আলোচনা করিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু নানা প্রকার দৈব-দুর্ব্বিপাকে হইতেছেনা, অন্যান্য কারণের মধ্যে নিজ শারিরীক অসুস্থতাও, আছে। যাহা হউক লীলা-তত্ত্ব আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাবের কারণ জানা আবশ্যক। আর সেটী বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিকও হইবেনা তাই সংক্ষেপে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। গীতায় শ্রীভগবান কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ হে ভারত! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় তখনই আমি সাধুদিগকে রক্ষা ও পাপীদিগকে বিনাস (সদ্ভাবের উদ্দীপন ও অসদ্ভাব নষ্ট) করিবার জন্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকি।

এখন ভাবিতে হইবে যে, এই ধর্ম্ম-সংস্থাপন কি? ধর্ম্মতো অনাদি কাল হইতেই আছে; তবে আবার তাহার সংস্থাপন কিরূপ? অনাবৃষ্টির জন্য ভূমি উত্তপ্ত ও নানারূপ আবর্জ্জনাদির সংযোগ বশতঃ খাল, বিল প্রভৃতির বারি অপরিস্কার হইলে যখন ভূমিকম্প ও উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-বারির দ্বারা বন্যার প্লাবন হয় ও তাহার ফলে যেমন তট-ভূমির অন্তর্গত বারি সমূহ পরিস্কৃত হয় এবং কোন স্থলে নূতন প্রবাহিনীর উৎপত্তি ও পুরাতনের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সেইরূপ রজস্তম গুণের বৃদ্ধি বশতঃ জীবগণের অহংভাব উদ্দীপিত ও ধর্ম্ম-ধ্বজিগণের দ্বারা নানারূপ কপট ভাবের আবর্জ্জনা সংযুক্ত হইতে হইতে যখন ধর্ম্মমতগুলি গ্লানিযুক্ত হয়, সেই সময়ে সাধুগণের ব্যাকুল প্রার্থনায় ব্যক্ত

চৈতন্য সমুদ্র হইতে মায়িক জগতে যে তরঙ্গের প্লাবন হয় তাহাই অবতার। অবতারের আবির্ভাবে প্রচলিত ধর্ম্মমত গুলি গ্লানি শূন্য,—কোন কোন মতের আকার পরিবর্ত্তিত, ও নূতন নূতন ভাবের সংযোগে দেশ কাল পাত্রানুযায়ী ধর্ম্মের সহজ পন্থা প্রকাশিত হয়, ইহারই নাম ধর্ম্ম-সংস্থাপন। অন্যান্য যুগের ধর্ম্মমতে সচ্চিদের ভাব প্রবল ছিল কিন্তু দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে সেভাবাশ্রিত আনন্দের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, চৈতন্য স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী অনন্ত শ্রীভগবানকে ভাবযোগে ঘনীভূত করিয়া তাঁহার সহিত যে প্রেমের খেলা হয়, তাহাই এক্ষণে জীবগণের পক্ষে একমাত্র আনন্দময় সরল পথ।

শ্রীভগবান মায়াতীত হইয়াও মায়িক জগতে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া লীলার দ্বারা যে আদর্শ স্থাপন করেন, অজ্ঞানীগণ তাহারই স্থূলভাব অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম মার্গে, ও জ্ঞানীগণ সূক্ষ্মভাব আয়ত্ত করিয়া যোগ মার্গে, অগ্রসর হইতে থাকেন। অজ্ঞানীগণ কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইতে যখন তাহাদের রজস্তম গুণ ক্ষীণ হইয়া যায় ও সমস্ত কর্ম্ম সাত্ত্বিক ভাবে ভগবৎ প্রীত্যর্থে সম্পন্ন হয় তখন তাহারা শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস প্রভৃতি দৈবী সম্পদ সকল জ্ঞান রাজ্যেই লাভ করা যায়, এই সকল সম্পদ লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত সাধক যখন প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিবার জন্য বিষয় ভোগ করেন তখন তাঁহার মন বিষয়ের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের দিকে সংযুক্ত থাকে ও শ্রীভগবানের অবতার-লীলার ভাব-সমূহ তাঁহার জীবন-পথের পরিচালক স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়।

দ্বাপরের শেষে তামসিক ও রাজসিক কর্ম্মের এত প্রাবল্য হইয়াছিল যে, সংসারীগণ কাম্য কর্ম্ম জনিত ভোগ সুখ ভিন্ন জীবনের যে অপর লক্ষ্য আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, এদিকে ত্যাগী সন্ন্যাসীগণের মধ্যে কেহবা তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ ও কেহবা জ্ঞান মার্গে মোক্ষ লাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, ফলে এই পথগুলি নীরস ও পতন ভয় সমাকুল হওয়ায় সংসারী বা ত্যাগীগণের মধ্যে কাহারো আধ্যাত্মিক পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় নাই। ভোগ সুখ, সিদ্ধি ও মুক্তিলাভ করিয়াও কি যেন একটা অভাব তাঁহাদের প্রাণে অনুভূত হইতেছিল, নানারূপ পানীয় থাকিতেও মাতৃস্তন্য ভিন্ন যেমন শিশুর পরিতৃপ্তি লাভ হয় না, সেইরূপ নির্ম্মল উচ্ছ্বাসময় আনন্দের

তরঙ্গ হৃদয়ের মধ্যে অনন্তভাবে প্রবাহিত না হইলে সাধকের আধ্যাত্মিক পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। পার্থিব বা স্বর্গাদি ভোগ সুখের অবসাদ ও ভোগান্তে পতন ভয় অবশ্যম্ভাবী, তপস্যা জনিত সিদ্ধির ফলে শক্তিলাভ করিলেও অহংকারের ছিদ্র পথে ক্রমশঃ তাহা ক্ষয় হইয়া যায়, জ্ঞানমার্গগামী মুক্ত পুরুষগণ গুণাতীত হইয়া প্রকৃতির পারে ব্যক্ত ব্রহ্মে বিচরণ করেন বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিতে ব্রহ্মোপাসনা করায় একদিকে যেমন ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের অন্ত পান না, অন্যদিকে প্রকৃতির বিচিত্র বেশ ও মোহনমূর্ত্তির আকর্ষণে পাছে যোগ ভঙ্গ হয় এজন্য সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হয়। ব্রহ্মেস্থিত মুক্ত পুরুষগণের ক্ষণেকের তরেও যুক্ত ভাব নষ্ট হইলেই পতন অনিবার্য্য, তবে অনেকের পক্ষে এ পতন সাময়িক, কেননা তাঁহারা প্রথমতঃ প্রকৃতির নির্ম্মলাংশে বিদ্যা প্রকৃতিতে পতিত হন ও পূর্ব্ব জ্ঞানের সহায়ে পুনরায় তাহার পারে চলিয়া যান। প্রকৃতি মুক্তপুরুষগণকে প্রথমতঃ প্রভুভাবে আকর্ষণ করায় কেহ কেহ বা শক্তির মোহে ধীরে ধীরে অধঃপতিত হইয়া ক্রমে প্রকৃতির দাস হইয়া পড়েন। ফলে জ্ঞানমার্গগামীগণ মুক্ত হইয়াও সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পারেন না, রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "যে ছেলে বাপের হাত ধরিয়া চলে, তাহার একটু অন্যমনস্ক হইলে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু বাপের কোলে উঠিলে আর সে ভয় থাকে না।" জ্ঞানীগণ হাত ধরিয়া চলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়, কিন্তু ভক্তগণ পূর্ণ নির্ভরতার বলে কোলে উঠেন সুতরাং শ্রীভগবান তাঁহাদের ভার গ্রহণ করায় তাঁহারা সদাই নির্ভয়।

সংখ্যায় কম হইলেও দ্বাপরের শেষে যে ভক্ত ছিলেন না এমন নহে, তবে তাঁহারা ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিতে শান্ত ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। এরূপ আরাধনায় ভক্তির সহিত ভয় মিশ্রিত থাকে বলিয়া পূর্ণানন্দ লাভ হয় না। সমযোগ্য ভিন্ন নির্ভয় হৃদয়ে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসা সম্ভব নহে, শ্রীভগবান রসঃ স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার বোধে, ভালবাসিয়া আত্মসমর্পণ না করিলে আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ অসম্ভব। জীবের পিপাসিত কণ্ঠে পূর্ণানন্দের অমৃত ধারা সেচন করিবার জন্যই চিদানন্দঘন হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হইয়াছিল। ভাবাশ্রয়ে শ্রীভগবানকে আপনার জন বোধে ভালবাসিয়া আরাধনা করার স্থায় আনন্দময় সাধন

পথ আর নাই, গীতায় তিনি বলিয়াছেন "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" ফলতঃ ভাবাশ্রয়ে আরাধনায় তাঁহাকে যেমন প্রাণের প্রাণ আপনার হইতেও আপনার বোধে নির্ভয় প্রাণে ভালবাসিয়া তাঁহার সহিত প্রেমযোগে যুক্ত হওয়া যায়, এরূপ স্বভাব সঙ্গত যোগের কৌশল—পূর্ণানন্দ ও পূর্ণপরিতৃপ্তি লাভের অমোঘ অথচ সহজ উপায় আর কোন পথেই নাই, ইহার সাধনে আনন্দ ও সিদ্ধিতে পূর্ণানন্দ। কলিযুগের আবির্ভাবে জীবের শক্তিক্ষয় ও ভ্রান্তি বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই বোধ হয় অপার করুণাময় শ্রীভগবানের এই দুর্লভ দান। সখ্য ও মধুর ভাবে শ্রীভগবানকে সমযোগ্য এবং বাৎসল্য ভাবে তাঁহাকে প্রতিপাল্য সুতরাং আপনার হইতেও হীন বোধে ভালবাসার তন্ময়তা কি মধুর, ইহাতে ভয়ের ও ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির লেশ মাত্র নাই, কেবল মাধুর্য্য ও অনুরাগের তন্ময় ভাব; স্বভাব সঙ্গত সহজ যোগ। এই ভাবাশ্রিত প্রেম-যোগের তীব্র মধুর আকর্ষণে সফলতা অতি শীঘ্র করতলগত হয়। দ্বাপরান্তে দয়াময় শ্রীভগবান আপনাকে সহজে ধরা দিবার এই অপূর্ব্ব কৌশল শিক্ষা দিয়া জীবের মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, এই আনন্দময় ধর্ম্ম-পথে বিধি নিষেধের কঠোরতা নাই, প্রত্যবায়ের ভয় নাই † কেবল ভাবের খেলা—অনুরাগের তন্ময়তা ও ভাল বাসার বিশুদ্ধ আনন্দ। আনন্দের এ অমৃতধারা পান করিলে "চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হয়, * এ অনুরাগের আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিলে অতি দুরাচার পাপীর জন্ম জন্মান্তরীয় পাপের অন্ধকার বিনষ্ট হয় ও সাধু পদ বাচ্য হইয়া তাহারা অতুল শান্তি লাভ করে, পাঠকগণ গীতার উক্তি স্মরণ করুন।

---

† নেহাভি ক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

অর্থাৎ ইহাতে নিষ্ফলতা নাই বিঘ্ন নাই, এবং ইহার সম্বন্ধ মাত্রও মহা ভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

* চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়নঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥

অর্থাৎ হরিভক্তি পরায়ন হইলে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয় আর হরিভক্তি হীন দ্বিজও চণ্ডালের অধম।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতো হি সঃ
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি
কৌন্তেয় প্রতি জানিহি নমে ভক্তঃ প্রনশ্যতি॥

অর্থাৎ অত্যন্ত দুরাচার পাপীও যদি অনন্য ভাবে আমার ভজনা করে তাহা হইলে সেও সাধু পদবাচ্য হয় ও ধর্ম্মাত্মা হইয়া অতুল শান্তিলাভ করে, হে কৌন্তেয়! নিশ্চয় জানিও যে আমার ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।

আগমনী।

(শ্রীরাগ চৌতাল।)

—:•:—

এস মা এস মা এসগো মা উমা,
হররমা হর-হৃদি বিহারিণী।
এস মা বিমলা ওমা ও বগলা,
এস মা মঙ্গলা মঙ্গল-দায়িনী॥
গিরিশ গৃহিনী গিরির নন্দিনী,
জগত জননী জগত পালিনী,
সর্ব্বস্বরূপিণী সর্ব্বানী ঈশানী
সুরাসুর আদি নরের বন্দিনী॥
দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধ'রে,
দশদিক রক্ষা কর মা সবারে;
অর্পণে বরদে অন্ন দে অন্নদে!
অভয় পদে অভয় দেমা ত্রিনয়নী॥
বামে কমলিনী দক্ষে * বীণাপাণি,
কার্ত্তিক গণেশে লইয়া জননী;

---

* দক্ষে—দক্ষিণে।

বিশ্বেশ্বরে মাগো ল'য়ে পুরো ভাগে—
আসিতে হইবে অসিত বরণী॥
দেখে যা দেখে যা ওমা ও শৈলজা,
দুঃখানলে ভাজা হ'তেছি জননী;
পেটে নাই মা অন্ন দেহ জীর্ণ শীর্ণ—
বস্ত্রাভাবে মোরা প'রেছি কোপিনী॥
কি আছে মোদের বল শিবরাণী,
কি দিয়ে পুজিব বিশ্ব বিমোহিনী;
নয়নের জল "মঙ্গলার" সম্বল—
রেখেছে ধোয়া'তে চরণ দু'খানি॥

দীনহীন—শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহপাত্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

(২)

—:০:—

মহামনা বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন রথারোহণে তাঁহার সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় কংস নিজ ভগ্নি ও ভগ্নিপতীর সন্তোষার্থে রথের সারথী হইয়া যাইতে ছিলেন, হটাৎ দৈববাণী শুনিলেন যে;—

"অস্যাস্তামষ্টমো গর্ব্ভো হন্তা যাং বহসেহবধু।"

অর্থাৎ—রে মূঢ়! তুমি যে দেবকীর সারথ্য করিয়া আজ আনন্দিত তাহারই অষ্টম গর্ব্ভজাত সন্তান তোমার বিনাশ সাধন করিবে।

অতিশয় খল-স্বভাব পাপমতি কংস ঐ দৈববাণী শ্রবণ মাত্র ক্রোধে আরক্ত নয়ন হইয়া অশ্ব-রজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবকীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে বধোদ্যত হইলে, উপস্থিত বিপদাগত দেখিয়া বসুদেব কংসকে বলিলেন;—

শ্লাঘণীয় গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজ যশস্কর।
স কথং ভগিনীহন্যাৎ স্ত্রিয় মুদ্বাহপর্ব্বণি॥

অর্থাৎ—নিখিল বীরগণ আপনার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে, ভোজবংশশ্রেষ্ঠ সেই সকল গুণে গুণী আপনি বিপ্রকারে বিবাহ দিবসে স্ত্রীজাতি, বিশেষতঃ নিজ ভগিনীকে হনন করিবেন। আপনার ন্যায় গুণী ব্যক্তির এরূপ হীনোচিত কার্য্য কখনই শোভা পায় না।

বসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কংশ বলিল "আমি এইমাত্র দৈববাণী শুনিলাম যে, এই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই আমার জীবন নাশ করিবে," সুতরাং আমার নিজ জীবন নিরাপদ করিবার জন্যই আমি এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সকলেই এরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাতে আমার দোষ হইতে পারে কি? বসুদেব বলিলেন,—"হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনি মৃত্যুকে ভয় করিয়া এক্ষণে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে চাহেন, কিন্তু ইহাতেই কি আপনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবেন? তাহা নয়, মৃত্যু যখন হউক আপনার হইবেই; অনর্থক এরূপ কার্য্য করিয়া কেন অপযশের ভাগী হইতেছেন? জীবমাত্রকেই একদিন না একদিন অবশ্যই মরিতে হইবে। কেননা—

"মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহজায়তে।
অদ্যবাব্দ শতান্তেবা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুব॥"

অর্থাৎ—জন্মধারী জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য্য। জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আজ হউক বা শত বৎসর পরে হউক, জন্ম হইলেই তাহার মৃত্যু সুনিশ্চয়। সুতরাং মৃত্যু যখন জীবের অনিবার্য্য তখন আপনি বীরপুরুষ হইয়া কেন এমন নিঃসহায়া স্ত্রীলোকের বধ সাধন করিয়া পাপভাগী হইতেছেন। শাস্ত্রে জীব বধ মাত্রেকেই পাপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে আবার নিঃসহায়া স্ত্রীলোকের বধ যে কত অনিষ্টকর তাহা আর কি বলিব। ইহাতে বীরের বীরত্ব, পুণ্যবন্তের পুণ্য, সৌভাগ্যশালীর সৌভাগ্য, এক কথায় সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই নষ্ট হয়। সুতরাং এমন পাপ জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বীর নামে কলঙ্ক করিবেন না। আরও বলি—

"ব্রজং তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথাতৃণ জলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥"

অর্থাৎ—গমনশীল পুরুষ যেমন গমনকালে একটী পদ অগ্রে স্থাপন করিয়া পরে অপরপদ উত্তোলন করে এবং জলৌকা (জোঁক) যেমন একটী তৃণ আশ্রয় করিয়া অপর তৃণকে পরিত্যাগ করে জীবও সেইরূপ নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে। সুতরাং আপনি ক্ষান্ত হউন আর বৃথা হত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন না। বিশেষতঃ—

"এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণী মিমাংত্বং দীনবৎসলঃ॥"

অর্থাৎ—এই বালিকা আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী, আপনার দ্বারা কন্যার ন্যায় স্নেহে প্রতিপালনীয়া, এই মঙ্গলযুক্ত নব বিবাহ-বাসরে ইহার বিনাশ করা ভবাদৃশ দীনজনরক্ষকের কখনই কর্ত্তব্য নয়।

এইভাবে মহাভাগবত বসুদেব কর্ত্তৃক নানা প্রকারে উপদেশ পাইয়াও আসুরিক স্বভাব বিশিষ্ট কংস কিছুতেই দেবকীর বিনাশ সাধনে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেনা দেখিয়া বসুদেব মহাশয় "উপস্থিত বিপদ হইতেতো রক্ষা করি, শেষে যাহা হইবার হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

নহ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বাগাহ। শরীরিণী।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেস্যা যতস্তেভয় মুখিতম্॥

অর্থাৎ—হে সৌম্য! দৈববাণী আপনাকে যেমন বলিয়াছেন তদনুসারে এই দেবকী হইতে আপনার কোনই ভয় নাই। ইহার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান হইতেইতো আপনার ভয়? আমি আপনাকে ইহার সমস্ত সন্তানই প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি। তথাপি আপনি উদ্বাহপর্ব্বে ভগ্নি-বধপাপে লিপ্ত হইবেন না।

যদিও কংস অসুর স্বভাব অতিশয় খল প্রকৃতি। তথাপি বসুদেবের এই কথায় তাহার যথেষ্ঠ বিশ্বাস জন্মিল। তাহার ধারণা হইল যে, বসুদেব মুখে যাহা বলিবে তাহা কার্য্যে করিতেও কোন দ্বিধা করিবেনা। সুতরাং আর কেন, বসুদেবতো দেবকীর সমস্ত সন্তানই আমাকে প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আমি তখন তখনই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইব। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কংস বসুদেবের পুত্রার্পণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া দেবকীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক

গৃহে গমন করিলেন। বসুদেবও আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া কংসের প্রশংসা করিতে করিতে দেবকীর সহিত নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

বসুদেবও দেবকী পরমানন্দে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমে সর্ব্বদেবময়ী দেবকী দেবী যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র হইয়াছে দেখিয়া বসুদেব মনে মনে ভাবিলেন আমি কংসের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে, দেবকীর তাবৎ সন্তানই তাহাকে অর্পণ করিব, এক্ষণে যাহাতে সেই সত্য রক্ষা হয় তাহার জন্যই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। পুত্র যাইবে বলিয়া দুঃখ করিলে চলিবেনা। একমাত্র শ্রীভগবানই সত্য আর সকলই যখন মিথ্যা, তখন অপত্য স্নেহের মোহে পড়িয়া কেন আমি সত্য হইতে বিচ্যুত হই?

এই ভাবিয়া বিশুদ্ধাত্মা সত্য-নিষ্ঠ বসুদেব প্রথমপুত্র কীর্ত্তিমানকে লইয়া কংস সমীপে গমন করিলেন। কংস বসুদেবের এই আশ্চর্য্য সহনশক্তি ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন—

"প্রতি যাতু কুমারোঽয়ং নহ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্।
অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল॥

অর্থাৎ—হে বসুদেব! তোমার ব্যবহারে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি এই পুত্রটীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাও। দৈববাণীতেতো দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হইতেই আমার ভয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এটী হইতে আমার কোন ভয় নাই। বসুদেব "তথেতি" (তাহাই হউক) বলিয়া পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু অব্যবস্থিত-চিত্ত অসংমতি কংসের এরূপ দয়াতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মনে মনে স্থির বুঝিলেন এখন ফিরাইয়া দিলে বটে, কিন্তু আবার তুমিই ইহাকে বধ করিবে। এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে বসুদেব গৃহে গমন করিলেন।

লীলাময়ের লীলার চাতুরি বোঝে কার সাধ্য। এই সময় আবার দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার কথার পরে বলিলেন—

"নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ।
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ॥
সর্ব্বেবৈ দেবতা প্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধু সুহৃদো যে চ কংস মনুব্রতাঃ॥"

অর্থাৎ—হে কংস! ব্রজধামে নন্দ প্রভৃতি যে সকল গোপগণ এবং তাঁহাদের পত্নীগণ ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেব প্রভৃতি এবং যদুকুল স্ত্রী দেবকী প্রভৃতি সকলেই দেবতা। গোপকুল ও যদুকুলের জ্ঞাতি বন্ধুগণ যতই তোমার আনুগত্য করুক না কেন উঁহাদিগকে দেবতা বলিয়াই জানিবে। তোমার পরিচয়টাও কিছু বলি। তুমি জন্মান্তরে কালনেমি নামক অসুর ছিলে ঐ জন্মে বিষ্ণু-হস্তে নিহত হইয়া বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম লইয়া কংস নামে পরিচিত। এখন বুঝিয়া লও বিষ্ণু তোমার কে? এই যে দেবগণ আসিয়াছেন ইহাদের দ্বারাই বিষ্ণুর আবির্ভাব হইবে এবং ভূভার হরণ ও ভূত-দৈত্যগণের বিনাস হইবে। আমি ভবিষ্যৎ বলিলাম এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।

এখানে হয়তো কেহ বলিতে পারেন, শুদ্ধচিত্ত দেবর্ষি আসিয়া আবার কংসকে এইভাবে উত্তেজিত করিয়া পাপে লিপ্ত করেন কেন? তদুত্তর এই যে, কংস যদি এই ভাবে উত্তেজিত না হয় তাহা হইলে দেবকীর সন্তানগণ বিনষ্ট হয়না, আর তাহা না হইলেও পৃথিবীতে অসুরবংশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কারণ দেবকীর গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে একে একে অসুরগণেরই আবির্ভাব হইয়াছিল। তাই অসুর বিনাশার্থ উত্তেজিত করিবার জন্য ভগবৎ প্রেরণায় দেবর্ষি নারদ আসিয়া ঐভাবে কংসকে উত্তেজিত করিয়া যাহাতে অসুরগণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বিনাস হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়াই দেবর্ষি নারদকে অযথা "কুঁদুলে" বলিয়া বুঝি, কিন্তু যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই দেবর্ষি নারদের মহামহীয়সী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সহজ কথায় এইটী ধরিলেই হয় যে, যদি নারদ এমন "কুঁদুলে"ই হইবেন তবে স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে অত ভালবাসিবেন কেন? আর শাস্ত্রই বা দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদেরই শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া কেন বলিলেন "দেবর্ষিনাঞ্চ নারদ।"

যাহা হউক এইভাবে দেবর্ষি নারদ কংসকে ইঙ্গিত করিয়া দিয়া অর্থাৎ দেবকীর পুত্রকে ফিরাইয়া দিয়া ভাল কর নাই, উহার সমস্ত সন্তানই বিনাশ কর, এই ভাবের ইঙ্গিত করিয়া বিনাযন্ত্রে হরিগুণগান করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

আগামীবারে কংসের মন্ত্রণা ও অন্যান্য ঘটনার সহিত বলরামের প্রকাশ প্রভৃতি বর্ণনার ইচ্ছা রহিল।

আমার সাধু দর্শন।

(২)

——:০:——

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে যেদিন গিয়া সাধুর নিকট নানা উপদেশ শুনিয়া আসি, সেইদিন হইতেই আমি মধ্যে মধ্যে অবসর পাইলেই সাধুর নিকট যাই। এইভাবে কয়েকদিন মাত্র তাঁহার সঙ্গ পাইয়াই কেমন জানি একটা নেশার মত হইয়া গেল; বৈকাল হইলেই প্রাণ যেন সেই কুলু-কুলু-নাদিনী স্রোতস্বিনী ভাগিরথীরতটে, সেই সদা প্রফুল্লিত সুমিষ্ট ভাষী সাধুর নিকটে যাইবার জন্য উধাও হইয়া ছুটে। সবদিন সেখানে যাইবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠেনা সত্য, কিন্তু যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

আজ বড়ই শুভসংযোগ হইয়াছে, এক সঙ্গে স্কুলের ৪ দিন ছুটি তারপর আবার কাকাবাবুও ঘরে নাই। বেলা তখন আন্দাজ অপরাহ্ন পাঁচটা আমি শুধু কাকী মাকে যাইয়া ধীরে ধীরে বলিলাম—"আমি আজ একটী সাধু দর্শনে যাইতেছি আসিতে বিলম্ব হইবারই সম্ভব। আমার জন্য ভাবিবেন না। যদি মা আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁহাকে সাধু দর্শনের কথা না বলিয়া অন্য যাহা হউক একটা কিছু বলিয়া দিবেন।

এখানে মায়ের নিকট মিথ্যা বলিবার জন্য কাকীমাকে অনুরোধ করার এক প্রধান কারণ, মা'র ধারণা সাধু সন্ন্যাসীর সহিত বেশী মেলা মেশা করিলে নাকি সংসারে মন লাগিবেনা। তাঁহার এই বিশ্বাস হইয়াছে সেইদিন, যেদিন আমারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাই মা'র ইচ্ছা আগে একটা বিবাহ দিয়া আমাকে সংসারে জড়িত না করা পর্য্যন্ত যেন আমি সাধু সন্ন্যাসীর সহিত বেশী মেলা মেশা না করি।

যাহা হউক কাকীমাকে এইভাবে বলিয়া আমি ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে সেই পূর্ব্ব কথিত সাধুর নিকট হাজির হইলাম। গিয়া দেখি খুব জোরে কীর্ত্তন হইতেছে। আঃ কক্ষণ শুনিয়া বুঝিলাম প্রাচীন পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের একখানি

শুদ্ধ কীর্ত্তন হইতেছে। যে পদখানি কীর্ত্তন হইতে ছিল তাহা তখন আমার জানা না থাকিলেও পরে অনুসন্ধান করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম সেখানি এই—

"জয় নন্দ-নন্দন গোপীজন বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর
সুর মুনিগণ মনোমোহন ধাম।
জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরি লোচন মঙ্গল
জয় নদীয়া বধু নয়ন আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেম বর্দ্ধন নবঘনরূপ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর
জয় জগমোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন গণ-ভয় ভঞ্জন
গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্ধ॥

যেমন মধুর কণ্ঠ আর তেমনই মধুরতর একএকটী আখর গানের সঙ্গে সঙ্গে সাধু পুরুষ দিতেছেন। ছেলে বেলা হইতে অনেক বড় বড় ওস্তাদের গান শুনিবার সুযোগ হইয়াছে কিন্তু এত মিষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী গান কখনও কোথায়ও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক কীর্ত্তন শেষ হইল, অমনি ভক্তগণ সকলেই মহাপুরুষের বদন পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন সকলেরই আগ্রহ মহাপুরুষ কি বলেন শুনিব। ২।৪ মিনিট কোন কথা হইলনা; হটাৎ একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন "কত মনে করি সর্ব্বদার জন্য এইভাবে চিত্ত আনন্দে ভরপুর রাখিব, কিন্তু যেমন এখান হইতে উঠিব অমনি যেন সেভাব কোথায় চলিয়া যায়, আচ্ছা! ইহার কি কোন উপায় নাই?

সাধু পুরুষ ঈষৎ হাসিয়া উত্তরে বলিলেন—বৎস! উপায় ঐ পায়। বুঝ্‌লে? সেই আনন্দময়ের শ্রীচরণ আশ্রয় ভিন্ন জীবের আর কিছুতে কি কোনরূপ উপায় আছে?

ভক্ত।—দেব! আশ্রয় করিতে পারি কৈ? এমন অস্থির মন যে, আপনার নিকট যে বিষয় শুনিয়া গেলাম পরক্ষণেই ভিন্ন মতাবলম্বী একজনের নিকট আর একরকম কথা শুনিয়া পূর্ব্বের ভাব ঠিক কি এইভাব ঠিক কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, সব যেন গোলমাল হইয়া কেমন এক রকম হইয়া গেল। কেউ বলিল, আচার্য্য শঙ্কর যে ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়াছেন উহাই ঠিক, কেহ বলেন বুদ্ধদেব যে মত বলিয়াছেন উহাই ঠিক আবার কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে মত প্রচার করিয়াছেন উহাই ঠিক, এইরূপ এক একজন এক এক রকম কথা বলেন, এই সব কারণে সবইতো গোলমাল হইয়া যায়। আপনি দয়া করিয়া বলুন কোন মত ঠিক এবং আমাদের অবশ্য অবলম্বনীয়।

সাধু! আমার কথা এই যে, সব মতই ঠিক। তবে এক এক মত এক এক সময় উপযোগী। সব মতের লক্ষ্যই এক। সমুদয় ধর্ম্ম-মত-ই যখন একই ভগবদ্ধামে উত্থিত হইবার স্তর বা সিঁড়ি মাত্র, তখন কোনটী ভাল আর কোনটী মন্দ বলিবে। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সকল সময় সকল মত ঠিক লাগেনা এক এক সময় এক এক মতের প্রাধান্য দেখা যায়। একবার একজন কবি লিখিয়াছিলেন—

"ভিন্ন ভিন্ন পথ ভিন্ন ভিন্ন মত
কিন্তু গম্য একস্থান।
যে যেমনে পার ট্রেনে ষ্টীমারে
হও তথা আগুয়ান।"

সব মতেরই লক্ষ্য এক কেবল আচরণ প্রভেদ মাত্র। তবে আমি—শুধু আমি কেন শাস্ত্রও এই কলিযুগের জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্ম মতকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য ধর্ম্ম-মতকে অসত্য বলিতে পারিনা আর শাস্ত্রও অন্য ধর্ম্ম-মতকে তিলমাত্র অবজ্ঞা কিম্বা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবার আদেশ দেন নাই। পরন্তু সমুদয় ধর্ম্ম মতই সত্য এবং সর্ব্বদা আদরণীয়। যাবতীয় জীবই উচ্চনীচ অধিকার ভেদে বিভিন্ন স্তরে অবস্থান

করিতেছে, এবং উপাসনা ভেদে উপলব্ধি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হইতেছে বটে কিন্তু সকলেই সেই একই রাজ্যের একই আনন্দময় ধামের যাত্রী।

ভক্ত।—তবে আমাদের কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতই গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন? আর আপনি যে মহাপ্রভুর মতকেই শ্রেষ্ঠ বলিলেন তাহার কারণ কি?

সাধু।—কারণ অনেক আছে সোজাসুজি দেখিলেই তুমি বুঝিবে কেন শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি, শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও কোন ধর্ম্ম-মতকে অবজ্ঞা করেন নাই, এমন কি ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে প্রবল বিদ্বেষ-বহ্নি বরাবর প্রজ্বলিত ছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই প্রতিদ্বন্দ্বী মত সমূহের সমীচীন সামঞ্জস্য বিধান করিয়া —সেই বিদ্বেষ বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া চিরশান্তিই স্থাপনা করিয়াছেন। তারপর বিরুদ্ধ মত পোষণ কর্ত্তা কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্রও ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্বেষ ভাব রাখেন নাই; বরং—

"মহতের মর্য্যাদা হয় অঙ্গের ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন॥"

এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া জগতের সমুদায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু উপদেশ দিয়া নয় নিজে আচরণ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি যে দেশে, যে জাতিতে, যে আশ্রমে, যে ধর্ম্মমতে থাকুন না কেন, যে কোন বিষয়ে তিনি বড় হউন না কেন, তিনি অবশ্যই পূজ্য।

ভক্ত।—মহাপ্রভু কি নিজ জীবনে আচরণ দ্বারা ইহা দেখাইয়াছেন?

সাধু।—দেখাইয়াছেন বৈকি? বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সঙ্গে যখন মহাপ্রভুর বিচার হয় তখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম শঙ্কর মতাবলম্বী হইলেও কত বিনীত কত শ্রদ্ধাযুক্ত ভাবে মহাপ্রভু তাঁহার নিকট শিষ্য ভাবে উপবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন;—

"আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥"

আবার মহাপ্রতাপশালী বৈদান্তিক শিরোমণী সন্ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারের সময় নিজ দৈন্যতা দেখাইয়া তাঁহার সহিত একাসনে উপবেশন পর্য্যন্ত করিতে চাহেন নাই আরও কত অলৌকিক ব্যাপার যাহা

মানুষে সম্ভব হয়না এমন সব আচরণ দেখাইয়াছেন তাহা সময়ান্তরে তোমাকে বলিব অদ্য এখনই আমাকে শ্রীনবদ্বীপধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; ৩।৪ দিন পরে পুনরায় ফিরিবার ইচ্ছা আছে। তোমরা কয়েকদিন সকলে মিলিয়া আনন্দ কর আমি আসিয়া আবার তোমাদের সহিত মিলিত হইব। মহাপুরুষ এইভাবে উপস্থিত ভক্তগণকে বলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, আমিও তেমন সুবিধা মত কোন কিছু বলিবার অবসর না পাইয়া ক্ষুন্নমনেই বাড়ী ফিরিয়া চলিলাম। রাস্তায় আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম, তাইতো, যে চারদিন ছুটি, সেই চারদিনইতো সাধু পুরুষ এখানে থাকিবেন না, কি করা যাইবে! যাহা হউক একবার পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়াই যাই, দেখি তিনি কি বলেন। এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট যাইয়া সমস্ত বলিলাম, তিনি বলিলেন তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমার এখানে আসিও আমি নিয়ম করিয়াছি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ২ ঘণ্টা ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিব। তাঁহার আদেশ মত পরদিন হইতেই তাঁহার বাড়ীতে নিয়মত পাঠ শুনিতে যাইতে লাগিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি পণ্ডিত মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত নিয়ম করিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমদিন যাইয়াই মধ্য লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির ব্যাপার শুনিলাম, আমার সহিত এই বিষয় লইয়া তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল আগামীবারে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

আনন্দ-সন্দেশ।

—:০:—

গত ১৩২৪ সালের ৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতীবার "ভৈমী একাদশীরদিন মাসিলা, ভক্তি-নিকেতনে" একটী সভাস্থাপিত হইয়াছে, উক্ত সভার নাম হইয়াছে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত-সম্মিলনী।" প্রতি বৃহস্পতীবার সন্ধ্যার পর উক্ত ভক্তি-নিকেতনে উক্ত সম্মিলনীর সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে শ্রীহরিবাসর, শ্রীনগর সঙ্কীর্ত্তনও বিশেষ বিশেষ অধিবেশন করিয়া সম্মিলনীর ভক্তগণ বিমল আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। ভক্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে এবং কয়েকটী বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বর্ত্তমান বৎসর হইতে শ্রীভক্তি পত্রিকা উক্ত সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইবে, এবং প্রতিমাসে সভায় সংক্ষিপ্ত বিবরণী শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সম্মিলনীর সভ্যগণকে শ্রীভক্তি পত্রিকা অর্দ্ধ মূল্যে দিবার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে "সম্পাদক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত-সম্মিলনী" মাসিলা ভক্তি-নিকেতন পোঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া।" এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া অথবা সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারেন।"

ভক্তি ১৮শ বর্ষ ২য়, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩২৬ সাল।

বিরহিণী রাধা।

সখিরে! পুষেছিনু কাল-পাখী, হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি।
করিয়া যতন।
কি দোষে সে নিরদয় শূন্য করি এ হৃদয়॥
করিল গমন॥
ছি ছি সখি লাজ ভয় কুলমান সমুদায়
দ'লেছি চরণে।
শেষে সে চরণে দলি অনায়াসে গেল চলি
ছাড়ি বৃন্দাবনে॥
যবে সে নাগরী স্বরে সঙ্কেতে ডাকিত মোরে
যমুনা পুলিনে।
শুনি সে বাঁশির স্বর ভুলিতাম আত্মপর
শ্যামের কারণে॥
এত ভালবাসা দিয়ে প্রাণ মন সমর্পিয়ে
নারিনু রাখিতে।
ধিক্ পুরুষের প্রাণ প্রেমের কি এই দান
ছিল কপালেতে॥
দিন নাই রাত নাই যখনই ডাকিত, রাই,
গিয়াছি তখন।
শ্রাবণের অন্ধকারে অবিরত বৃষ্টি ধারে
মেঘের গর্জ্জন॥
চমকি চপলা বালা করে লুকোচুরী খেলা
জলদে লুকায়।

ঝিল্লি আর ভেকদল ডাকিতেছে অবিরল
গভীর নিশায় ॥
এমন দুর্য্যোগ রাতে শ্যামের কুঞ্জেতে যেতে
বেজেছে বাঁশরী।
কনক নূপুর খুলি একাকি গিয়াছি চলি
ভয় পরিহরি ॥
সেই হরি শেষে কিনা ফিরে চেয়ে দেখিল না
গেল মথুরায়।
স্মৃতি রেখে গেল তার শেল সম রাধিকার
হৃদয়েতে হায় ॥
আজ মনে ভাবি বসি শ্যামের সে মুখ শশী
সে মধুর হাসি।
পাই যেন শুনিবারে বাজিছে যমুনা-তীরে
শ্যামের সে বাঁশ ॥
স্বপনে ঘুমের ঘোরে প্রতিদিন হেরি তারে
কত কথা কই।
ভাঙ্গিলে সে সু-স্বপন কি করে যে প্রাণ মন
কি বলিব সই ॥
কেন জলধর কায় ব'লেছিল রাধিকায়
হৃদয় ঈশ্বরী।
এখন কি একবার মনে নাহি হয় তার
ছি ছি কি চাতুরী ॥
রাধিকারমণ আজি নৃপতির বেশে সাজি
রাজদণ্ড করে।
মথুরায় সিংহাসনে হেথা রাধা মরে প্রাণে
সে কি মনে করে ॥
আমার চখের জল ব'রে যাক্ অবিরল
নাহি ক্ষতি তার।

অন্য সাধ আর নাই সুখে থাক্ এই চাই
আছে সে যথায়॥
যথায় থাকুক শ্যাম হউক যতই বাম
তবু সে আমার।
এই কথা মনে মনে ভাবি যবে নিরজনে
ঘুচে হৃদি ভার॥
জপিতে জপিতে নাম যদি ছাড়ি ধরাধাম
কত সুখ তায়।
পর জন্মে শ্যাম হব মথুরায় চলে যাব
ছাড়ি রাধিকায়॥
মোরে কাঁদায়েছে যত তাহারে কাঁদাব তত
বুঝাব যাতনা।
অন্য সাধ নাহি আর এই ইচ্ছা রাধিকার
শুধু এ কামনা॥

শ্রী শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ।

কৃষ্ণ-তত্ত্ব। (১)

(লেখক— অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।)

—:০:—

আত্মা অন্বেষণের জন্যই আত্ম-জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যে আত্ম জ্ঞানেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয় সেই জ্ঞানই পরিপূর্ণ আনন্দ বস্তু, ইহাই দার্শনিক তত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মাকে জানিলে আর অপর কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকেনা, ঋষিগণ চিরদিনই এই আত্মার একত্বের অন্বেষণ করিয়াছেন; এই একত্বানুভূতি আমাদের অন্তঃ প্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই আত্মার অন্বেষণকে শাস্ত্র তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নামে অভিহিত করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞ জানি যাঁহারা তাঁহারা এই পরিপূর্ণ

আত্মাকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে, সেই আত্মার দ্বিতীয় নাই—তিনি অদ্বিতীয়—তিনি অদ্বয়। "তান্ত্রিকগণ এই আত্মজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়াছেন তত্ত্ব" উপনিষদবিদ্‌দিগের নিকট যিনি ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়াছেন এবং সাত্বতগণ যাঁহাকে ভগবান বলিয়া দ্যোতিত করিয়াছেন তিনিই তান্ত্রিকদিগের "তত্ত্ব" ফলতঃ তত্ত্ব, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান একার্থ ব্যঞ্জক। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—তত্ত্বের তিনটী সংজ্ঞা। তাই ভাগবত বলিয়াছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতিশব্দ্যতে॥ ভাঃ ১।২।১১

যিনি ব্রহ্ম, তিনি নির্ব্বিশেষ প্রকাশ! শক্তি, ধর্ম্ম বা গুণ রহিত সত্বা মাত্র প্রকাশই ব্রহ্ম। যাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি অনভিব্যক্ত তিনি আত্মা বা পরমাত্মা; ইনিই সবিশেষ বা কিঞ্চিত বিশেষ অর্থাৎ কতিপয় শক্তি বিশিষ্ট প্রকাশের নাম পরমাত্মা। আর সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সম্পদ, এবং পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টী যাঁহার আছে তিনিই পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি প্রকাশ অর্থাৎ ভগবান।

যিনি সূর্য্য তাপের ন্যায় নির্ব্বিশেষ সত্বা মাত্রে স্ফূর্ত্তিবান জ্ঞানকাণ্ডে তিনি ব্রহ্ম। মায়াশক্তি সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপে যাঁহার প্রকাশ যোগ মার্গে তাঁহাকে পরমাত্মা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; আর যিনি সর্ব্ব-রসময় ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দিব্য-মঙ্গল-বিগ্রহরূপে স্ফূর্ত্ত ভক্তি পথে তিনি ভগবান নামে অভিহিত। চরিতামৃত কারও এই কথা বলিয়াছেন—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভোগ বা কর্ম্ম ইহার চরম উদ্দেশ্য নয়। তত্ত্ব জিজ্ঞাসাকে মূল সূত্র করিয়া মানবকে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

এক্ষণে এই অদ্বয় জ্ঞান বা তত্ত্ব কাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে। অবশ্য যাহাতে ভগবত্তার পূর্ণ চরম বিকাশ হইয়াছে, যিনি স্বয়ং ভগবান যিনি সমস্ত

অবতার হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু যাঁহাতে পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞান ও পরম মহত্ত্ব বিদ্যমান তিনিই এই তত্ত্ব। যিনি অনন্যাপেক্ষি হইয়া সকল অবতারের মূল স্বরূপ, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য অবতার হইয়াছে তিনিই তত্ত্ব বস্তু। যাঁহার ভাব অচিন্ত্য, যিনি আনন্দ স্বরূপ তিনিই তত্ত্ব বাচ্য। তত্ত্ব বস্তু তিনি, যিনি এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির মূল কারণ যে প্রকৃতি তাঁহারও কারণ। যিনি নিজে অনাদি অথচ সকলের আদি; যিনি সর্ব্বেশ্বর, সকলের প্রভু ও কর্ত্তা যিনি আনন্দঘন রূপে— অপ্রাকৃত মূর্ত্তি। এখন দেখা যাউক এই পরমা তত্ত্বের অভিধা কি?

ব্রহ্মসংহিতা রামানুজাবির্ভাবের পরবর্ত্তী গ্রন্থ হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিতান্ত আদরের সামগ্রি। স্বয়ং মহাপ্রভুই ইহার সিদ্ধান্তে বিমুগ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে নিজে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন—

সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাই ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্র-মধ্যে অতিসার॥

এই সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ নির্ণয় করিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥"

চরিতামৃতকার ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।"

এই কৃষ্ণ প্রাপ্তির ত্রিবিধ সাধন বলিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী অবতারণা করিয়াছেন—

"সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিনের পৃথক লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান প্রকাশে॥
ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়ি বৃত্তে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥

জ্ঞান মার্গে নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগ মার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাষে॥
রাগ ভক্তি বিধি ভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ॥

এই কৃষ্ণ অদ্বয় তত্ত্ব তাহাও তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

সেই অদ্বয় তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
যাঁহাবিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন॥

সুতরাং "কালত্রয়া বাধ্যত্বং তত্ত্বত্বম্‌" এই প্রাচীন উক্তির সার্থকতা সম্পাদিত হইল। শুধু তাই নয়—

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণ জ্ঞান পুর্ণানন্দ পরম মহত্ব॥"

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এ কথায় কি বুঝিব? "যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা।"

দীপহৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন
মূল এক দীপ তাঁহা করিয়ে গণন।
তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ॥

আমরা যদি শ্রুতি অন্বেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিব যে, শ্রুতিতে যাঁহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" বলিয়াছেন তিনিই কৃষ্ণ। যিনি অণু হইতেও অণু তথা মহৎ হইতেও মহৎ সেই পরম বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় বস্তুই কৃষ্ণ।

শিশু গৌরাঙ্গ।

—:০:—

শচী গৃহ কাজে, আঙ্গিণার মাঝে,
সোণার শিশুটি খেলে।
কহিলে না মানে, যা দেখে নয়নে
সকলি টানিয়া ফেলে॥

হামাগুড়ি দিয়া, প্রাঙ্গণ জুড়িয়া,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে।
কখন দাঁড়ায়, হাটিবারে চায়,
পদেক বাড়ায়ে পড়ে॥
ধূলা-মাটী গায়, কত যে মাখায়,
জননী যতই বলে।
আরো বেশী করি, দেয় গড়াগড়ি,
এদিকে ওদিকে চলে॥
কভু বা কাঁদিয়া, বাহু পসারিয়া,
উঠিবারে চায় কোলে।
আঁচলেতে ধরি, মা-মা-মা-মা করি,
ডাকে, সুমধুর বোলে॥
ধূলা ঝাড়ি মায়, কোলেতে উঠায়,
আদরে পিয়ায় স্তন।
চুম্বি চাঁদ মুখ, পায় যত সুখ,
জানে কি তা, অন্য জন॥
প্রায় সর্ব্বক্ষণ, করয়ে ক্রন্দন,
কাঁদিতে কাঁদিতে থামে।
হরি হরি বলি, দিলে করতালি,
তবে সে নিমাই থামে॥
সঙ্কেত বুঝিয়া, যত নগরিয়া,
কিবা সে পুরুষ নারী।
চাঁদ মুখ চেয়ে, করতালি দিয়ে,
কাঁদিলেই বলে হরি॥
নদীয়ার নারী, আসি সারি সারি,
হরি হরি সবে কয়।
করিয়া কৌতুক, চুম্বি চাঁদ মুখ,
টানিয়া বুকেতে লয়॥

একবার বুকে করিলে তাঁহাকে,
ছাড়িতে না লয় মনে।
বাৎসল্যেতে মন, দ্রবিয়া তখন,
দুগ্ধ ধারা ঝরে স্তনে॥
বিজয় পামরে, কতদিন পরে,
না জানি এ সুখ পাবে।
রমণী হইয়া, নদীয়াতে গিয়া,
নিমাই কোলেতে লবে॥

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-প্রকাশ।

(১)

নদীয়ার চাঁদ, শচীমাতার নয়নমণি আজ বহুদিন নদীয়া ছাড়া। পিতার পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদনার্থে শ্রীগয়াধামে গমন করিয়াছেন। তিনিতো সেখানে পরমানন্দেই আছেন; কিন্তু নদীয়াবাসী যে আর তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছে না। সেই নদীয়ার পথ, ঘাট, সেই হাট, বাজার, লোকজন, দোকান পশার সবই আছে, সেই গঙ্গার ঘাটে সকালে বিকালে পণ্ডিত মণ্ডলীর একত্র সমাবেশ, সেই শত ব্রাহ্মণের শাস্ত্র চর্চ্চার কোলাহল কিছুরই অভাব নাই কিন্তু তবু যেন কি এক হৃদয় বিদারকারী দারুণ অভাবে সকলে কাতর। কাজ কর্ম্ম করিতে হয় তাই করে কিন্তু তার ভিতরে যেন কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব। এক কথায় সবই আছে কিন্তু যেন প্রাণ নাই। যেখানে দু'পাঁচজন একত্রে মিলিত হয়েন সেই খানেই ঐ কথা—"নিমাই পণ্ডিত অনেক দিনতো গয়াধামে গিয়াছে, কৈ এখনও ত আসিল না, যতই উদ্ধত স্বভাবের প্রকাশ করুক তাহার অভাবে কিন্তু আমরা কিছুতেই আনন্দ পাইতেছি না।" কেউ কেউ বা প্রাণের আবেগে শচীমাতার নিকট গিয়া কোন খবর আসিল কি না, নিমাই

পণ্ডিত কেমন আছে, কবে আসিবে ইত্যাদি সংবাদ লইতে ব্যস্ত হয়। মোট কথা সকলেই নিমাইর অভাবে সর্ব্বদা বিরহে মুহ্যমান।

নদীয়ারতো এই অবস্থা। এইভাবে কিছুদিন যায়, একদিন অপরাহ্নে হটাৎ মেঘ-বিনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় নবদ্বীপ পুরন্দর ন'দেবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া, শচীমাতার আঁধার ঘর আলো করিয়া উদয় হইলেন। আজ আর তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা, শচীমাতারতো কথাই নাই; তিনিতো যেন মৃত দেহে জীবন পাইলেন। কেনইবা হবেনা? যে নিমাইর চন্দ্র বদন না দেখিয়া শচীমাতা এক মুহুর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেন না সেই বদন-শশীর দর্শনে আজ ছয় মাস বঞ্চিত। তারপর আবার ঘাটে পথে যেখানে সেখানে নিমাইর কথা শুনিতে পাইতেন। কেহ চুপি চুপি কিছু বলিলে মনে করিতেন ঐ বুঝি আমার নিমাইর কথা বলে, অমনি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন "তোমরা কি নিমাইর কোন খবর পেয়েছ? বাপ আমার ভাল আছেতো?" সকলেতো আর সমান নয়? কেউ কেউ আবার শচীদেবীকে শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিত "নিমাই পাগল হইয়া হয়তো কোন দিকে চলিয়া গিয়াছে।" আবার কেউ কেউ বলিত "নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া যাইবারই সম্ভব।" এইভাবে নানা জনের কাছে নানা প্রকার কথা শুনিয়া শচীদেবী অত্যন্ত অধীরা হইয়াছিলেন। আজ সেই নয়ন তারা—সেই পূর্ণশশী নিমাই আসিয়াছে কাজেই শচীদেবী আনন্দে আত্মহারা। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া "বাপ্‌রে, নিমাইরে, আয় বাপ্, আয়রে, এমন করিয়া কি দুঃখিনী মাকে ভুলিয়া থাকিতে হয় বাপ।" এই বলিতে বলিতে একেবারে বাহিরে উপস্থিত।

নিমাই মাকে দেখিয়াই ভক্তিভরে মায়ের চরণ বন্দনা করিলেন, শচীমাতাও স্নেহভরে হাত ধরিয়া তুলিয়া শিরঘ্রাণ বদন চুম্বনাদি দ্বারা স্নেহাশীষ প্রদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিয়া বলিলেন, "নিমাইরে! অভাগিনী মাকে কি এমন করিয়াই ভুলিয়া থাকিতে হয়? বাপ, আমার যে আর তুমি ছাড়া কেউ নাই বাপ," নিমাই মিষ্ট বাক্যে মাকে শান্তনা দিয়া বলিলেন;—"মা! তোমার কৃপায় আমি নির্ব্বিঘ্নেই পিতৃদেবের-কার্য্য সমাধা করিয়া আসিয়াছি আমি পরম সুখেই ছিলাম, তোমার আশীর্ব্বাদে সাক্ষাৎ ভগবচ্চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" পুত্র বৎসলা জননী শচীদেবী দেখিলেন বাছার মুখ কমল

শুখাইয়া গিয়াছে, আর বেশী প্রশ্ন না করিয়া আনন্দে আলুথালুবেশে হারানিধিকে কোলে করিয়া নিজ অঞ্চল কোণে মুখ মুছাইতে মুছাইতে বাৎসল্য রসে নয়ন জলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল প্রচণ্ড তপনতাপে সন্তপ্ত শস্য ক্ষেত্র যেমন সুবৃষ্টিপাতে প্রফুল্লিত হইয়া উঠে আজ সুদীর্ঘকালপরে নদীয়া-বিহারী গৌরহরিকে পাইয়া নবদ্বীপবাসীরও সেইরূপ প্রফুল্লভাব প্রকাশ পাইল। বিদ্যুৎ বেগে নদীয়ার সর্ব্বত্র নিমাইর আগমন বার্ত্তা রাষ্ট্র হইয়া গেল। যে যেখানে যেমন ছিল সেই ভাবেই ছুটিয়া নিমাইকে দেখিতে আসিল। সনাতন মিশ্রতো হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাজির।

সকলেই আসিতেছে কিন্তু দেখিয়া বড় বিস্ময় হইতেছে, তাহাদের বিস্ময় কত? পুর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইতে দেখিলে বা অচল পর্ব্বতশ্রেণীর পবনবেগে গমন ভঙ্গি দেখিলেও বোধ হয় তাহারা এত বিস্মিত হইতনা, আজ নিমাইর ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহারা যত বিস্মিত। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে,—"মিশ্র নন্দন নিমাই কি ছিল আর কি হইয়াছে" এমন সময় হটাৎ একজন আসিয়া ঐ কথা শুনিয়া বলিল "কি হইয়াছে গো! নিমাই পণ্ডিতের কি হইয়াছে?" তার কথার উত্তরে অমনি ওরই মধ্যে যিনি একটু প্রধান তিনি বলিলেন "হবে আর কি, এতদিনে নিমাইর উপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে, যে নিমাই পণ্ডিতের দাম্ভিকতায় একদিন সকলকেই পরাস্ত হইতে হইত সেই নিমাই—সেই মহাদাম্ভিক নিমাই, সেই উদ্ধতের শিরোমণি নিমাই ছোট বড় সকলকার নিকটই হাতযোড় করিয়া বলিতেছে—

" * * তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদে।
"গয়া ভূমি দেখি আইলাম নির্ব্বিরোধে॥"

ওগো ন'দেবাসী! তোমাদের সকলের কৃপায় আমি নিরাপদে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসিয়াছি। তোমাদের কৃপাতেই আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। ধন্য তোমরা আর ধন্য তোমাদের কৃপা।" এই ভাবের বিনয় নম্র ব্যবহারে যথার্থই সকলে মহাবিস্মিত। আবার বয়োবৃদ্ধগণ মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াব লিতেছেন—

" গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ।"

মহা অশান্ত নিমাই পণ্ডিতের এই ভাবান্তরের কথা লোক পরম্পরায় চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল। প্রভুর প্রিয় সহচরগণ যাঁহারা পূর্ব্বে আসেন নাই তাঁহারা এক্ষণে এ সংবাদ শুনিয়া একে একে আসিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রমুখ বৈষ্ণবগণ যাঁহারা প্রভুর দর্শনে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে বহিরঙ্গ দর্শকগণ চলিয়া গেলে ইহাঁদিগের সহিত গৌরহরি মনোকথা কহিতে লাগিলেন।

আজ প্রভুকে দেখিলে মনে হয়, যেন নব পরিণীতা বালিকা বধূ প্রথম প্রাণবল্লভের দর্শন পাইয়া সেই নবসঙ্গ রসায়নে বিভোর হইয়া, তাঁহারই ভাবে গরগর হইয়া প্রিয় সহচরীর নিকট মনের কথা বলিতেছে। বহিরঙ্গ লোক নাই যাঁহারা আছেন সকলেই নিজ জন, তাই আজ তাহাদের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

" * * বন্ধু সব শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিল যথা যথা॥"

"বন্ধুগণ! প্রাণনাথ কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা খেলা অভুতপূর্ব্ব করুণার কথা তোমাদের না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। আর তোমারইতো কৃষ্ণের নিজজন তোমরা ভিন্ন সেকথা বুঝিবেই বা কে? যেমন আমি গয়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম অমনি এক অশ্রুত পূর্ব্ব সুমধুর ধ্বনি কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল স্থিরভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম—

" সহস্র সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।"

আবার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল আহ্বান ধ্বনিও কর্ণে প্রবেশ করিল। কে যেন কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে;—"দেখ দেখ বিষ্ণুর পাদোদক তীর্থ খানি।" ভাই সব, আমি এই আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। প্রাণকৃষ্ণের করুণার কথা মনে হইল। মনে করিলাম সেতো আজি কার কথা নয়, দ্বাপরে যখন শ্রীকৃষ্ণ গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন তখন এই স্থানে চরণ ধৌত করেন। সেই অবধি পাষণ্ড পতিতজনের উদ্ধারের লাগিয়া এই প্রস্তরে শ্রীচরণামৃত রাখিয়া গিয়াছেন। হায় হায়, দয়াময়! তোমারতো জীবের জন্য এতই করুণা প্রকাশ বটে, কিন্তু তবুতো জীব তোমায় ডাকেনা ভাবেনা ভজেনা। বন্ধুগণ! কত বলিব আর কতই বা বলিবার সাধ্য আছে;—

"যাঁর পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ত্ব
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক তত্ত্ব॥"

গঙ্গা পতিতপাবনী বটে কিন্তু সেও বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা বলিয়া, শিব আবার যাহাকে সযত্নে মস্তকে করিয়া রাখিয়া আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিতেছেন, সেই গঙ্গার উৎপত্তি স্থল বিষ্ণু পাদপদ্মের মহিমা কত বলিব।"

বলিতে বলিতে প্রেমে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল কেবল অঝোরে নয়ন ধারা ঝরিতে লাগিল। সমস্ত অঙ্গ যেন কদম্ব পুষ্পের ন্যায় হইয়া উঠিল, প্রতি লোমকূপ হইতে তীরবেগে স্বেদ প্রবাহিত হইতে লাগিল শ্রীমানের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন।

"কিবা সে লাবণ্যরূপে কি কহিব এক মুখে
আর তাতে ভাতিয়া চাহনি।"

আবার প্রেমে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইল, এমন সময় একজন অন্তঃরঙ্গ বৈষ্ণব অমনি প্রভুর ভাব বুঝিয়া সুর করিয়া গাহিলেন—

"বরণ দেখিনু শ্যাম জিনিয়াত কোটী কাম
বদন জিতল কোটী শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গীঠাম নয়ান কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
সই! এমন সুন্দরবর কাণ।
হেরি সে মূরতি সতী ছাড়ে নিজপতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥
এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥

নাভির উপরে লোম লতাবলী
সাপিনী আকার শোভা
ভুরুর বলনি কাম ধনু জিনি
ইন্দ্র ধনুকের আভা॥
চরণ নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জির তায়।
চণ্ডিদাস হিয়া সেরূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥"

প্রভু আরও বিকল হইয়া পড়িলেন, ভক্তগণ দেখিয়া অবাক্। সকলেই বলেন এরূপ কৃষ্ণ প্রেমতো কখন দেখি নাই। কৃষ্ণের বিশেষ কৃপা না হইলেতো এমনটি কখনও হয় না?

" শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন॥
চতুর্দ্দিকে প্রেমে বহিল প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসি হইলেন অবতার॥"

ভক্তগণতো বেশ প্রেমানন্দে প্রভুর সঙ্গে রঙ্গ করিতেছেন কিন্তু এদিকেতো শচীদেবী পথশ্রান্ত পুত্রকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। রাত্র দেখিতে দেখিতে অনেক হইয়াছে। অন্তর্যামী প্রভু আমার ক্রমে স্থির হইয়া শ্রীমানকে বলিলেন—

" কালি সত্তে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে।
তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে॥"

গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটির খুব নির্জ্জন, কাল সদাশিবকে লইয়া তুমি যাইও, অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তগণকেও এ সংবাদ দিও। ব্যথার ব্যথি না হইলেতো ব্যথা বুঝিবেনা? আমি যে কি প্রকার বিরহ ব্যথায় দিবানিশি জ্বলিতেছি তাহা তোমাদিগকে কাল বলিব।

ভক্তগণ প্রভুর কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আপনাপন গৃহে ফিরিলেন। এদিকে মহাপ্রভুও আহারাদি করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। গৌর-গরবে গরবিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও সময় বুঝিয়া পতির শ্রীচরণ সেবা-রসে নিমগ্ন হইলেন।

প্রিয়াজী সেবা করিতেছেন কিন্তু প্রভুর আমার যেন বাহ্যস্মৃতি আদৌ নাই। সর্ব্বদাই কৃষ্ণ ভাবে বিভোর বিশেষ আর্ত্তি ও বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া দেবীর সহিত দু'একটী কথা মাত্র বলিতে লাগিলেন সর্ব্বদাই মহাবিরক্তের ন্যায় উদাস উদাস ভাব—

"নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহাবিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥"

সাক্ষাৎ ভক্তি স্বরূপিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বহুদিন পরে পতির দর্শন পাইয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার চরণ যুগল সন্তপ্ত হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক পরিপূর্ণ আনন্দ রসে নিমগ্ন হইয়া নিদ্রাভিভূতা হইলেন। পাঠকগণ! এইবার একবার বাহিরের ব্যাপার দেখুন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের একটী কুঁদ পুষ্পের গাছ আছে, যে যতই পুষ্প লউকনা কেন সর্ব্বদার জন্যই উহাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প বর্ত্তমান থাকে তাই ভক্তগণ উহাকে কল্পতরু আখ্যা প্রদান করিয়াছে। প্রত্যহই প্রাতে পুষ্প চয়ন করিতে বহু বৈষ্ণব উক্ত কুন্দকল্পতরু মূলে সম্মিলিত হয়েন। আজও সকলে আসিয়া পুষ্প চয়ন মানসে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। পুষ্প চয়ন হইতেছে এমন সময় শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে তথায় আসিয়া মিলিলেন। গোপীনাথতো তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন কি হে, হাসি যে মুখে ধরেনা, ব্যাপার কি?

শ্রীমান্।—আর ব্যাপার কি, এতদিন পরে বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রমুখ তুলিয়া চাহিলেন, চিরদিনের আশা এতদিনে বুঝি পূর্ণ হইল।

"পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥"

শ্রীমানের কথা শুনিয়া সকলেই বল কি, বল কি, বলিয়া তাহার নিকট আসিয়া অন্যান্য বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গত কল্যকার প্রভুর ভাব শ্রীমানের মুখে শুনিয়া ভক্তগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত উল্লাস ভরে বলিলেন "গোত্রং নোর্দ্ধতাম্।" অর্থাৎ "গোত্র বাড়াউক কৃষ্ণ আমা-সবাকার।" গদাধরতো এই সমস্ত শুনিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে যেন বিবশ হইয়া পড়িলেন। সকলে বুঝিলেন এতদিনে যথার্থই প্রভুর কৃপা হইয়াছে। গদাধর হাত জোড় করিয়া বলিলেন "হা কৃষ্ণ কবে সে চিত্র দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল

করিব। কবে জগজ্জীব হা কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে, কবে সেদিন আসিবে।" গদাধরের প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন—

"সভেই ভজুক কৃষ্ণ চন্দ্রের চরণ"

গদাধর শ্রীমান পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—শ্রীমান্ নিমাই পণ্ডিতের ভাব কি রকম দেখিলে আর একটু বল না?

শ্রীমান্। কি দেখিলাম তাহা আর বলিব কত একবার যাইয়া দেখিয়া আইস। তোমাদের সে নিমাই পণ্ডিত আর নাই, গয়াধামে সে জ্ঞান-গর্ব্বিত উদ্ধত-স্বভাব বিশিষ্ট নিমাইর তিরোভাব হইয়া এখন কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা রসের গোরার আবির্ভাব হইয়াছে, যে নিমাইর সঙ্গ করিতে তখন আমরা সঙ্কুচিত হইতাম, বহির্ম্মুখ বলিয়া যাহার সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিতে চাহিতামনা এখন সেই নিমাইর দিকে চাহিলে আর সে সব কিছুই মনেও আসেনা বরং তাহার সহিত বসিয়া দু'দণ্ড ইষ্টগোষ্ঠী করিতে সাধ হয়। এখন আর তাহার দাম্ভিক ভাবের চিহ্নও নাই পরন্তু বিমল দৈন্যার্ত্তি মাখা কৃষ্ণ-প্রেমে ভরা অদ্ভুত মাধুর্য্যময় মূর্ত্তির বিকাশ হইয়াছে। এককথায় তাহার সহিত গতকল্য অল্প সময় মিশিয়া যে অদ্ভুত প্রেমের বিকাশ দেখিয়াছি, যে অপূর্ব্ব ভাব ব্যঞ্জক কথা শুনিয়াছি তেমনটী আর কখনও শুনি নাই বুঝি বা জীবনে আর শুনিবও না। বলিতে কি:—

"পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে পরিপূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্ব অঙ্গ মহাকম্প পুলকে পূর্ণিত।
হা কৃষ্ণ বলিবা মাত্র পড়িলা ভূমিত॥"

একবার কৃষ্ণনাম লইয়াই একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল—"সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত।" গদাধর বল কি শ্রীমান্! আমাদের কি এখন সৌভাগ্য রবি প্রকাশ হইবে।

শ্রীমান—হইবে কি গো; হ'য়েছে, চল চল শীঘ্র করিয়া পূজা আহ্নিক সারিয়া লও, গতকল্য আমাদিগকে গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে মিলিত হইতে বলিয়া দিয়াছে, তোমার যদি ইচ্ছা হয়তো যাইতে পার।

গদাধর আবার ইচ্ছা হয়তো কি, এমন শুভ সুযোগ কি ছাড়িতে আছে, তোমরা যাও আমি শীঘ্রই পূজা আহ্নিক সারিয়া যাইতেছি।

গদাধর এই বলিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে চলিলেন কিন্তু সেদিন আর তাহার ভাল করিয়া কৃষ্ণার্চ্চন হইলনা মনটো শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে বহু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে দেহখানিও আর যেন থাকিতে চাহেনা। তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া—

"শুক্লাম্বর গৃহপ্রতি চলিলা সত্বরে॥"

দৌড়াইয়া গিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে হাজির, গিয়া দেখেন সদাশিব, মুরারী, শ্রীমান পণ্ডিত, গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই সেখানে উপস্থিত আছেন; আর এক পাশে সেই চির পরিচিত সেই নিতান্ত অশান্ত নিমাই আজ নয়ন জলে বয়ান ভাসাইয়া গদ গদ স্বরে কি যেন বলিতেছেন। গদাধর বিশেষ গোলযোগ না করিয়া চুপি চুপি এক পাশে বসিয়া কৃষ্ণ কথা শুনিতে লাগিলেন।

যতই শুনিতে লাগিল ততই তাহার আনন্দ বাড়িতে লাগিল শেষে আর থাকিতে না পারিয়া "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলে ফিরিয়া দেখেন গদাধর ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে। এমন সময় মুরারী ও সদাশিব দুইজনে গদাধরকে ধরিয়া বলিলেন গদাধর তোমার সেই কাতর প্রার্থনা এতদিনে সফল হইল। তুমিইত নিমাইর উদ্ধত স্বভাব দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে—

"হেন কৃষ্ণ কর জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউক ছাড়ি অন্য মন॥"

তোমার সেই প্রার্থনার ফল আজ প্রত্যক্ষ দর্শন কর। এইভাবে সকল ভক্তগণ সঙ্গে প্রভুর মিলন হইয়া ক্রমেই কৃষ্ণ প্রেমের বন্যা প্রবল হইতে প্রবল তর—প্রবলতম হইয়া উঠিল। এই প্রেমের বন্যাই একদিন শান্তিপুর ডুবাইয়া নদীয়া ভাসাইয়া জগৎবাসির চির অশান্তিময় জীবনে সুস্নিগ্ধ শান্তিধারা বরিষণ করিয়া ধন্য করিয়া ছিল।

ধন্য লীলাময় তোমার লীলা, ধন্য তোমার কৃপা। কখন কোন ভাবে যে কি কর বুঝে কার সাধ্য। জয় লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের জয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতাষ্টনাম কীর্ত্তন।

—:•:—

কলিদর্পহারী, শ্রীগৌরাঙ্গহরি, শচীরদুলাল গোরা।
শ্রীগোলোকশূন্য, করি অবতীর্ণ, ধন্য করিল এ ধরা॥
করুণাপাথার, অবতার সার, শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর।
জীব-দুঃখ হেরি, গোলক-বিহারী, ভূ-লোকেতে অবতার॥
প্রেমভক্তিদাতা, জীবজনত্রাতা, পতিতপাবন প্রভু।
অগতিরগতি, লক্ষ্মীপ্রিয়া-পতি, পতিতজনার বিভু॥
দুর্ব্বলের বল, অনাথ-সম্বল, কাঙ্গাল-জনার নিধি।
দ্বিজকুলমণি, দাতাশিরোমণি, রূপগুণ অবধি॥
পণ্ডিত নিমাই, মহিমার ঠাঁই, নিতাই-সুখদাতা।
অদ্বৈত জীবন, নাম সঙ্কীর্ত্তন, প্রবর্ত্তক বিশ্বধাতা॥
গদাধরবন্ধু, করুণার সিন্ধু, দীনবন্ধু দয়াময়।
জগমনোহর, ভাবুক ঈশ্বর, রসিকেন্দ্র রসম[illegible]
রাধাভাব কান্তি, তপ্তস্বর্ণভাতি, গুপত শ্যামল অঙ্গ।
ভুবনমোহন, ভাবুকরমণ, রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ॥
রূপসনাতন- বিষয়নাশন, মুকুন্দমাধব প্রাণ।
ভকতসর্ব্বস্ব, পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য, পূর্ণানন্দ সনাতন॥
শ্রীবাসঅঙ্গন, নর্ত্তন-কীর্ত্তন, বিলাসক পরানন্দ।
শ্রীশচীনন্দন, বৈষ্ণবজীবন, নদীয়া-আকাশ-চন্দ্র॥
প্রেমরসপুর, রসিকচতুর, রামানন্দ অন্তরঙ্গ।
অমোঘের প্রাণ- দাতা ভগবান, পরম আনন্দ কন্দ॥
জগন্নাথ সুত, পরম অদ্ভুত, সার্ব্বভৌম দর্পহারী।
জগাই মাধাই, পতিত দুভাই- তারক গৌরহরি॥
বাঞ্ছাকল্পতরু, অখিলের গুরু, নবদ্বীপসুনাগর।
চিত্তসুরঞ্জন, দুঃখ বিমোচন, বেদ বিধি অগোচর॥

প্রেমে গরগর, গৌরাঙ্গসুন্দর, শচীর নয়নতারা।
জাতি না বিচারে, আচণ্ডালে তারে, প্রেমরসভোরা॥
ভাবেতে বিভোল, বলে হরিবোল, ঠমকে ঠমকে চলে।
পতিত জনারে, যতন করিয়া, আনন্দে ধরয়ে কোলে॥
জীব-দুঃখ হেরে, দুনয়ন ঝরে, প্রেমের পীযূষরাশি।
পশুপাখী করি, প্রেম অধিকারী, ধরাতল গেল ভাসি॥
গৌর-গোবিন্দ, প্রভু পূর্ণানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি।
শত অষ্ট নাম, গাও অবিরাম, সবে মন প্রাণ ভরি॥
প্রেমময় নাম, বড় প্রাণারাম, পরাণ শীতল হবে।
প্রেমের ভাণ্ডারী, শ্রীগৌরাঙ্গহরি, কোলেতে তুলিয়া লবে॥
শ্রীগুরু পদেতে, নতকরি মাথে, "মঙ্গলাপ্রসাদ" ভণে।
বৈষ্ণবেরগণে, সবে নিজগুণে, রতিদেহ নাম গানে॥

দীন হীন—শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ গুহপাত্র, ভক্তিতত্ত্ববিশারদ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

—:০:—

(১)

জয় কৃষ্ণদাস জয় কবিরাজ মহাশয়
সুকবি পণ্ডিত অগ্রগণ্য।
ভক্তি শাস্ত্রে সুনিপুণ অপার অসীম গুণ
সবে যাঁরে করে ধন্য ধন্য॥"

প্রিয় পাঠকগণ! আত্মশোধনার্থে আজ যে মহাপুরুষের জীবনী আলোচনায় অগ্রে উপস্থিত, তিনি যাঁহার মহামহিমাময় চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা বোধ হয় আর নূতন করিয়া কিছুই বলিতে হইবেনা। বেশীদিন নয় ৪০৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৯শে ফাল্গুন * শুভ

* কাহারও মতে ২২শে ফাল্গুন।

জ্যোৎস্না পুলকিত শুভ পূর্ণিমার রজনীতে সন্ধ্যাবেলা চন্দ্রগ্রহণ সময় সহস্র সহস্র মানবের মিলিত-কণ্ঠে যে সুধামধুর "হরিধ্বনির" তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহার কয়েক বৎসর পরেই সেই তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া এই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিল। কত তাপিত, কত ব্যথিত, কত তৃষিত যে সেই প্রেমের বন্যায় গা ভাসাইয়া, ভাবে গলিয়া, হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। যথার্থই তখন "শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়া ন'দে ভাসিয়া গিয়াছিল।"

তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিবার ভাষা কৈ? তখন প্রেমের স্নিগ্ধ বাষ্পে, ন্যায়ের তীব্র রশ্মির সংমিশ্রণ; বর্ষার বারি-বাষ্পের সহিত ভাদ্রের তীব্র তপন-তাপের মিশ্রণে বঙ্গদেশ—বিশেষতঃ নবদ্বীপ এক অপূর্ব্ব প্রীতিময় শরতের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছিল; তখন নবদ্বীপের বক্ষে বৈরাগ্য ও বিষয়াশক্তি একত্রে স্থান পাইয়াছিল। একাংশে তাপস ও অপরাংশে বৈষয়িক গণের, একাংশে বিরাগ ও অপরাংশে বাসনা আপনাপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া বেশ লীলা করিতেছিল।

তারপর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশও তখন যবন রাজের করতলগত ছিল। কাজেই বিধর্ম্মী রাজার কঠোর শাসনে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায়। যাঁহারা সাধারণের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতেন, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারও যে, বেশ ভাল ছিল তাহাও স্বীকার করা যায়না। তান্ত্রিক বীরাচারীগণের অত্যাচারে জন সাধারণ অত্যন্ত উদ্‌ব্যস্ত হইয়াছিল। কুতর্ক-কুশল পণ্ডিতগণ তর্কের কঠোর কুঠারাঘাতে বেদ ও বৈদীক ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত খণ্ড বিখণ্ড করিতেছিল। এই সব অত্যাচারে যখন বঙ্গবাসী বিশেষ ভাবে নিপীড়িত, সেই সময় এই বঙ্গবাসীগণের সৌভাগ্য-রবি প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রেম-ভক্তির প্রত্যক্ষ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই সময় বঙ্গবাসীর নিকট প্রত্যক্ষ হইলেন! যদিও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুপম অলৌকীক লীলা বর্ণনা এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নয়, তথাপি প্রসঙ্গ ক্রমে কিছু বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।—যিনি এক দিন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রেম-ভক্তির এক অপূর্ব্ব

তুফান তুলিয়া কত নাস্তিককে আস্তিক করিয়াছিলেন, কত পতিত পাষণ্ডিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি সংসার সাগর অতিক্রম করিয়া বিশ্বব্যাপি অসীম সন্ন্যাস পারাবারে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক কোটী কোটী নিমগ্ন প্রায় জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দের ন্যায় প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণের শিক্ষাগুরু ভারত বিখ্যাত মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু মহাবৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় মহাত্মাগণকেও সমস্ত ভুলিয়া দীনাতিদীন কাঙ্গালভাব প্রেমধর্ম্মে দীক্ষীত হইতে হইয়াছিল; সেই পতিতপাবন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতোপম লীলালেখক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা মাদৃশ নগণ্য বিষয়াশক্ত জীবের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি মহাপুরুষের জীবনী ও তৎসংক্রান্ত বিষয় সকলের পর্য্যালোচনা দ্বারা নিজ চিত্ত শোধনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ও বৈষ্ণব সমাজের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে এই বিবেচনায় লেখনি ধারণে সাহস করিলাম। করযোড়ে পাঠকগণের নিকট নিবেদন তাঁহারা যেন আমার ভাষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মূল উদ্দেশ্য বিষয় আপন আপন সুমার্জ্জিত বুদ্ধি বলে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করেন।

বঙ্গের আদি কবি ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মের কিছুকাল পরেই নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামে বঙ্গের দ্বিতীয় কবি মধুর ভাষী মহানুভব শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম হয়। গৌরপদ তরঙ্গিণীতে ইহাঁর পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম সুনন্দা বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু অন্য কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এদেশে প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের জীবনী সংগ্রহ করা কত দূর দুরুহ ব্যাপার তাহা আমরা বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী আলোচনা ব্যপদেশে দেখাইয়াছি। এখানেও কয়েকটী কারণ বলা হইতেছে। প্রথম কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের জীবনী সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কোথাও যথেষ্ঠ রূপে সংগ্রহ নাই, তারপর যদিও কিছু কিছু প্রমাণ গ্রন্থকারগণের নিজ নিজ গ্রন্থে আত্মপরিচয় রূপে পাওয়া যায় তাহাও যথেষ্ঠ বা সম্যক প্রকারে সংগ্রহ নয়। তার উপর আবার প্রবাদ বচনের ছড়াছড়ি। দ্বিতীয়তঃ এক

শ্রেণীর লোক দেখা যায় তাঁহারা যাহা কিছু জানেন তাহাও প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আরও দুঃখের বিষয় যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, ইহা মুদ্রিত হইবে তাহা হইলেত কথাই নাই, অনুসন্ধানকারিকে প্রতি নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া থাকেন। তারপর ৩য় কারণ একশ্রেণীর লোক মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে যদি অলৌকীক কোন কাহিনী শুনিতে পান তাহা একেবারে ঠাকুর মায়ের উপকথার মত উড়াইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু বেদব্যাস, কর্ণ, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতির জীবনী ও তাঁহাদের আচরণাদি শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ প্রয়োগ সত্ত্বেও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখাইতে পারেননা। যাহা হউক আমরা তর্ক করিতে চাইনা কেবল "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর" এই অমোঘ মহাজন বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়াই যাহা কিছু আলোচনা করিতে চাই।

ধরাধামে যখন ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হয় সেই সময় ঈশ্বর অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মের উদ্ধার করেন, এই কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। যাঁহারা অবতার স্বীকার করেন না তাঁহারাও মহদ্ব্যক্তির আবির্ভাব স্বীকার করেন। খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল ঐ সময়ে ভারতে মুসলমান রাজা ছিলেন। বিধর্ম্মী রাজার কঠোর শাসনে ভারত নিষ্পেষিত, ধর্ম্মভাব একবারে সঙ্কুচিত হইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। এমন সময়ে ১৪০৭ শকে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীল চৈতন্য মহাপ্রভু পারিষদগণ সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার দ্বারা আর্য্য-ধর্ম্মের উদ্ধার করেন। তাঁহার পারিষদগণ বহুল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পদ্য ও নাটক গ্রন্থ রচনা দ্বারা সমাজের এবং ভাষার বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। বিজাতীয় শাসনে এবং মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে ঐ সকল গ্রন্থের অনেকগুলি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, তথাপি এখনও যাহা আছে তাহা যদি সমস্ত মুদ্রিত হয় তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। আহা, এই সকল গ্রন্থকারের জীবনী কত আদরের! এই ঘোর বিপ্লবের সময়ে নৈহাটীর নিকট ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যকুলে * সম্ভূত মহানুভাব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

* প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী বলেন—'আমরাতো 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াই জানি 'কবিরাজ উপাধি বৈদ্য জাতির পরিচায়ক নহে,—কবিত্বের পরিচায়ক।"

আনুমানীক ১৪৪০ শকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্ত দিগ্‌দর্শনীর তালিকা মতে ১৪১৮ শকে জন্ম বলিয়া প্রমান প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কেহ কেহ ১৫০০ শকে ইহাঁর জন্ম অনুমান করেন। তাঁহারা বলেন যে তিনি ১৫৭৫ শকে "শ্রীমদ্ভাগবত-গূঢ়ার্থ-রহস্য" গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ সময়ে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনার সময়েও তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার চরিতামৃত গ্রন্থেই প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি তাঁহাদের অনুমান অভ্রান্ত হয় তাহা হইলে তাঁহার "স্বরূপ নির্ণয় গ্রন্থের পয়ারের সত্যতার গৌরব রক্ষা হয় কি? স্বরূপ নির্ণয় গ্রন্থে লিখিত আছে।

" সভেমেলি একদিন বসিয়া নির্জ্জনে।
গৌর লীলা অপ্রকট শুনিলাম কানে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোঁসাইর শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস।
তাঁর স্থানে রহিল সদা বৃন্দাবনে বাস॥
* * *
কোথাকারে গেল সবে দেখিতে দেখিতে।
তথাপিও প্রাণ মোর রহিল দেহেতে॥"

এখানে বলিয়াছেন যে শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া গৌর লীলা অপ্রকট শুনিলেন। ১৪৫৬ শকে নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অপ্রকট হয়েন; সুতরাং ইহার পূর্ব্বেই যে শ্রীকৃষ্ণ দাসের জন্ম হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইতেছে। এবাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিল ১৫০০ শকে জন্ম হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত-গূঢ়ার্থ-রহস্যের শক নিরূপণে বোধ হয় একশত বৎসরের ভুল হইয়াছে। হয়ত হস্তের দ্বারা নকল হইয়া আসিতে আসিতে সাত নকলে আসল নষ্ট হইয়াছে। আরও ইনি ব্রজে কৌস্তুরী মঞ্জরী ছিলেন, মঞ্জরীদের শ্রী চৈতন্য দেবের লীলার সময় জন্মই প্রমাণ্য। ইহাঁরা দুই সহোদর ছিলেন। কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাত্র ছিলেন এবং তাঁহারই শক্তি সঞ্চার হেতু ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ্ হইয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতা চৈতন্য ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতেন না।

কৃষ্ণদাসকে নিত্যানন্দ প্রভুর শক্তি সঞ্চার এবং তাঁহার ভ্রাতার নিত্যানন্দের ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাস ইত্যাদি বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে

যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রমাণও পাঠকগণের বিশ্বাস হেতু নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা;—

"গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য॥
অঙ্গনে বসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস॥
এইত দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।
বলদেব দেখি যে না করিল প্রত্যুদ্গম॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণ কার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ॥
উৎসবান্তে চলিলা তেঁহো করিঞা প্রসাদ।
মোর ভ্রাতার সহিত তাঁর কিছু হৈল বাদ।
চৈতন্য প্রভুতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ প্রভুতে তার বিশ্বাস আভাস॥
ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥
দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না করে সম্মান।
অর্দ্ধ কুক্কুটীর ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা দোঁহা না মানিয়া হও ত পাষণ্ড।
একে মানি আরে নামানি এইমত ভণ্ড॥
ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গি চলিলা রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥
এইত কহিল তাঁর সেবক প্রভাব।
আর এক কহিল তাঁর দয়ার স্বভাব॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
এই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥

নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলেন নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হইয়া মুঞি পড়িনু পাদেতে।
নিজ পাদপদ্ম দিলেন আমার মাথাতে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥

* * *

আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে বলিলেন বাণী॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবন যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতশান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল দেখো হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখুনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভুর আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবন করিনু গমন।
প্রভুর কৃপা পাঞা সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাহার কৃপায় পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥
যাহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৫ম পরিঃ।

এই কবিতাংশের দ্বারা প্রমাণ হইল যে নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিতে আদেশ দেন, কৃষ্ণদাস তদনুসারে শ্রীবৃন্দাবন

ধামে গমন করতঃ শ্রীরূপ গোস্বামীর আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং ভক্তি-সিদ্ধান্ত ও রস-ভাব শিক্ষা করেন। যথাঃ—

"সনাতন কৃত পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃত পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাহা হইতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ৫ম পরিঃ।)

কবি এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়া লজ্জাজনক বোধে লেখনী সংযত করিয়াছেন। যথা;—

আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥

আহা! যদি তিনি এই পরিচয়টি বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন তবে কি আজ এত কষ্ট পাইয়াও অবশেষে হতাশ হইতে হইত?

ইনি কৌমার বয়স হইতেই বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; বিবাহাদি কিছুই করেন নাই সুতরাং সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। কবিরাজ গোস্বামী কত শকে কাহার সহিত বৃন্দাবন গমন করেন, তাহা নিশ্চয়রূপে স্থির করা অতিশয় কঠিন। তবে আনুমানিক ১৪৫৩ শকে তিনি বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহাদিগের নিকটে ভক্তি সিদ্ধান্তাদি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় তিনি বৈরাগ্যের প্রকট মূর্ত্তি শ্রীল রঘুনাথ দাসের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার রস-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া গ্রন্থ-শিরোমণি শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহার কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য লীলার সমস্ত রসের ভাণ্ডারী শ্রীস্বরূপ দামোদর। এই স্বরূপ দামোদরের নিকট মহাপ্রভুর ভক্ত তরুণ যুবক শ্রীরঘুনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথও গুরু শ্রীল স্বরূপের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার রস-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। যথাঃ—

"চৈতন্য লীলারত্ন সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা যে কিছু শুনিল তাহা ইঁহা বিস্তারিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥"

ক্রমশঃ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

—:o:—

(৩)

দেবর্ষি নারদের নিকট কংস এইভাবে অসুর বিনাশার্থ দেবতাগণের উদ্যোগ ও নিজের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অচিরেই যে বিষ্ণু সপরিকরে ধরাধামে আবির্ভূত হইবেন তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। কংস যদিও প্রবল পরাক্রমশালী তথাপি এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া এবং নিজের অনিষ্ট আশঙ্কায় বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিল।

যে যেমন প্রকৃতির লোক তাহার বন্ধু বান্ধবও তেমন ভাবেরই মিলিয়া থাকে। কংসের যেমন প্রকৃতি তাহার মন্ত্রী ও অন্যান্য পারিষদগণও সেই ভাবেরই জুটিয়াছিল। মন্ত্রীগণের পরামর্শে দুর্দ্ধর্ষকংস যদুরাজ পিতা উগ্রসেনকে ও তৎপক্ষীয় যাদবগণকে নিগৃহীত করিয়া নিজে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিল। এবং দেবকী ও বসুদেবই তাহার প্রধান শত্রুর আশ্রয় স্থল মনে করিয়া তাহাদিগকে কি করা হইবে এ বিষয় নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়া শেষে উহাদিগের হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বুকে পাষাণ চাপাইয়া কারাগারে রাখিয়া দিল।

এইভাবে দিন যায়, ক্রমে দেবকীর যতগুলি সন্তান হইল সকল গুলিই কংস হস্তে বিনষ্ট হইল। কংস নারদের নিকট নিজের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছিল তাহার প্রতিবিধান কল্পে মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত মিলিত হইয়া তদানুচর প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বান ও নরকাসুর প্রভৃতির সহায়তায় যদুবংশের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল।

যাদবগণ কংসের অত্যাচারে বিশেষ ব্যথিত হইয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ এবং বিদেহ প্রভৃতি দেশে গমন পূর্ব্বক বসবাস করিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা যাইতে পারিলেন না তাঁহারা অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কংসের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

সময় কাহারও বাধ্য নয়, কেহ তাহাকে দেখুক বা না দেখুক, সে নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া যাইবেই। কংস যেমনই দুর্দ্দান্ত হউক, যতই পরাক্রমশালী হউক সময় তাহাকে ভয় করিবে কেন? সে তাহার নিজ কার্য্য সাধন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। এইভাবে ক্রমে দেবকীর ছয়টী পুত্র ক্রমান্বয় কংস হস্তে বিনষ্ট হইলে পর—মুনিগণ যাঁহাকে "অনন্ত" বলিয়া জানেন, তিনি দেবকীর সপ্তমগর্ভে প্রবেশ করিলেন। বিশ্ব-জীব-জীবন শ্রীহরি নিজরক্ষিত যদু-গণের কংস হইতে ভয় দূরীকরণ মানসে এক্ষণে যোগমায়াকে আদেশ করিলেন।

"গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।"

অর্থাৎ—হে মঙ্গলালয়ে দেবি! তুমি গোপ ও গো (গাভী) সকলে দ্বারা সুশোভিত ব্রজধামে গমন কর। এবং—

"দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥"

অর্থাৎ—দেবকীর গর্ভে সম্প্রতি আমারই অংশ শেষ নামক অনন্তদেব বিরাজ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া গোপরাজ নন্দের আলয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর। চিন্তা করিও না—

" অথাহমংশ ভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দ পত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥

অর্থাৎ—আমিও ইহার পরে সমস্ত অবতারের আশ্রয় অর্থাৎ পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্র হইয়া আবির্ভূত হইব আর তুমি নন্দপত্নী যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূতা হইবে।

যোগমায়াদেবী শ্রীহরির এতাদৃশ আদেশ শ্রবণ করিয়া "তাহাই করিব" এইরূপ বলিয়া দেবকীর নিকট গমন পূর্ব্বক সেই গর্ভাকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। মথুরাবাসী সকলে মনে করিল দুরাত্মা কংসের ভয়ে দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইল। কেহ কেহ বলিল কংস কোনরূপ মন্ত্রাদি প্রয়োগ করিয়া দেবকীর গর্ভপাত করাইল। যাহা হউক মোট কথা দেবকীর সপ্তম গর্ভজাত সন্তান দেবকীর নিকট কেহ পাইল না। তৎপরে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী বিশ্ব-জীব-জীবন ভগবান শ্রীহরি সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিত হইয়া পরিপূর্ণ রূপে বসুদেবের মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। এবং বসুদেব যেন দীক্ষা-

দ্বারা সেই জগতের হিতকর অচ্যুতাংশ দেবকীতে অর্পণ করিলেন। এইরূপে দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হইল *

এখানে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সাধারণ মানুষের ন্যায় ভগবানের জন্ম নয়। যেরূপভাবে স্ত্রীপুরুষ মিলন ব্যাপার দ্বারা জীব সৃষ্ট হয় ভগবানের আবির্ভাবে তাহা আদৌ আছে বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সত্য স্বরূপ ভগবান বসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশ হইলে তিনি উহা বৈধ দীক্ষা বিধানে দেবকীতে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন এবং উভয়ে সর্ব্বদা সেই ভগবানের চিন্তা দ্বারা গর্ভের পরিপুষ্টতা সাধন করিতে লাগিলেন।

সত্য স্বরূপ শ্রীহরিকে গর্ভে ধারণ করিয়া দেবকী দেবী অপূর্ব্ব শোভায় শোভমানা হইয়াছেন। আর তাঁহার নিকটেই যাঁহার সত্য প্রতিপালনে পাপমতি কংসও একদিন স্তম্ভিত হইয়াছিল সেই মহাভাগ বসুদেব সুকঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা, এত নির্য্যাতন তবুও মহামনা বসুদেবের সদা প্রফুল্ল বদন। কংসের প্রতি রাগ নাই কেবল অন্তরে অন্তরে ভব-বন্ধন ছেদনকারী শ্রীহরির চিন্তাই নিরন্তর হইতেছে।

নিরন্তর অসৎ সঙ্গী, দেহাভিমানী ধন-মদ-মত্ত কংস বসুদেব ও দেবকীর মহিমা জানে না। তাই যাঁহাদের দর্শন মাত্রে ভগবদ্ভাবের উদয় হয়, যাঁহাদের অকপট ব্যবহারে হিংস্র জন্তুও নিজ জাতিয়-বৃত্তি ভুলিয়া সরল হয় এমন দুইটী সাধুরত্নকে কংস ভাগ্য বলে পাইয়াও দর্শনের অন্তরালে অন্ধকারময় কারাগৃহে ঘোর অপরাধির ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেনই বা

* নিত্যধামগত শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি প্রভু "শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুগপৎ নন্দপত্নী যশোদাতেও বসুদেব পত্নী দেবকীতে আবির্ভূত হয়েন, তন্মধ্যে স্বাপ্নিক বিধানে যোগমায়ার সহিত দ্বিভুজ মধুর মূর্ত্তিতে গোপরাজ নন্দের হৃদয় হইতে শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ে এবং বৈধ দীক্ষা বিধানে চতুর্ভুজ ঐশ্বর মূর্ত্তিতে মহাভাগ বসুদেবের হৃদয় হইতে শ্রীমতী দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।" আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের মতই মূলে দিলাম, পাঠকগণ দেখিয়া লইবেন। (সঃ ভঃ)

হইবেনা। নিরন্তর যাহাদের অসৎ সঙ্গ, অসৎ আলাপ, অসদ্ ব্যবহার তাহাদের ভাগ্যে সৎসঙ্গ লাভ ঘটিবে কেন?

মোহান্ধ বৎস! তুমি যাহাকে ঘোর অন্ধকারে আবদ্ধ রাখিয়াছ, যাহার সতীত্বের প্রভা অনুভব করিবার সৌভাগ্যও তোমার হয় নাই, মনে করিয়াছ তাহার নিকট কেহ নাই, কেহ তাহাকে দেখিতেছে না? দুর্জ্জয় প্রহরিগণ নিরন্তর অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া কারাগৃহের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে বটে কিন্তু একবার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া কারাগৃহের প্রতি চাহিয়া দেখ দেবকীর গর্ব্ভে যে অমূল্য রত্ন বিরাজমান সেই রত্নের দিব্যালোকে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত হইতেছে, আর তোমার ন্যায় অভিমানী মোহান্ধ জীব সেখানে যাইতে না পারুক্ কিন্তু সেই পরম জ্যোতীর্ম্ময়মূর্ত্তির দর্শনাশায় ঐ দেখ দেবগণ দেবত্বকে তুচ্ছ করিয়া স্বর্গধাম হইতে দেবকীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেবকীর গর্ব্ভস্থ সন্তানকে স্তব করিতেছে।

কি বলিবে, তুমি উহা দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছ না? তাতো পাবেই না। নিরন্তর পাপ কথা শ্রবণে যে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হইয়াছে পার্থিব জগতের নশ্বর সৌন্দর্য্যের ঝলকে যে তোমার চক্ষু মজিয়া গিয়াছে, শুনিবে বা দেখিবে কেমন করিয়া! একবার অহঙ্কারের উচ্চ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া ব্যাকুল প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি দেবগণ পবিত্র স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া দেবর্ষিগণের সহিত তোমার কারাগারে উপস্থিত হইয়া কি আনন্দ বাজার বসাইয়া দিয়াছেন। আহা! মরি মরি! কি শোভা, কি অপূর্ব্ব সমাবেশ, ভাবিলেও প্রাণ পুলকিত হয়—

ব্রহ্মাভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্‌।

ব্রহ্মা এবং আশুতোষ শঙ্কর, নারদাদি ঋষিবৃন্দ ও দেবগণের সহিত সমাবিষ্ট হইয়া দেবকীর গর্ব্ভ সন্দর্শনে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়া গর্ব্ভস্থ শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন *

* ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তব প্রবন্ধান্তরে দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

নানাপ্রকার স্তব করিয়া দেবগণ ও দেবর্ষিগণ পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দেবকী দেবীরও দেব দর্শনে ও স্তব শ্রবণে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হইল। আর যেন ভয় নাই, ভাবনা নাই। তিনি নিজ অঙ্গ শোভায় নিজেই বিমুগ্ধ হইলেন।

এখানে দুর্ম্মতি কংশ সর্ব্বদাই দেবকীর গর্ভের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে প্রহরীগণকে বলিয়া দিয়াছেন, তথাপি শান্তি নাই এক একবার ছুটিয়া কারাগারে যাইয়া দেবকীকে দেখিয়া আইসেন। আজ দেবকীকে দেখিয়া কংসের মুখ মলিন হইল মনে মনে বলিলেন—

" আহৈষ মে প্রাণ হরোহরির্গুহাং
ধ্রুবংশ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী।"

অহো! নিশ্চয়ই আমার প্রাণহারী হরি এই গর্ভে বিরাজ করিতেছে, নতুবা দেবকীর এমন অপূর্ব্ব তেজ কেন হইবে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার গর্ভেতো এমন হয় নাই। এক্ষণে আমার বৈরী বধের উপায় কি করা যায়। আমি কি দেবকীকে বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? না না, তাহা কখনই হয় না অতিশয় স্বার্থপর হীনমতি পুরুষও যাহাতে নিজের বিক্রম নষ্ট হয় সেরূপ কার্য্য করিতে চায়না। এমতাবস্থায় আমি যদি এই গর্ব্ভবতী দেবকীকে বধ করি তাহা হইলে আমার বিশেষ অনিষ্ট হইবে, বিশেষতঃ সাধারণ স্ত্রী জাতী বিনাসেইতো যশ, শ্রী ও আয়ুক্ষয় হয়।

মহাপরাক্রান্ত কংস এইরূপ চিন্তা করতঃ ভগ্নিকে বধ না করিয়া কেবল সেই ভগবান শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখিয়া তাঁহার জন্যই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এখন কংসের যে অবস্থা হইয়াছে এরূপ অবস্থা সাধক বাঞ্ছা করিয়াও পায় না। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে যে, এসময় কংস--

" আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ॥

অর্থাৎ—প্রাণ ভয়ে ভীত কংস উপবেশন শয়ন অবস্থান ভোজন ভ্রমণ এবং পানাদি যে কোন কার্য্যেই সর্ব্বদা ভগবান হৃষীকেশকে চিন্তা করত বিষ্ণুময় সর্ব্ব জগৎ দেখিতে লাগিল।

এইভাবে কংসকে চিন্তান্বিত করিতে দেবকী দেবীর গর্ভে প্রপঞ্চাতীত পরমপুরুষ শ্রীহরি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

আমার সাধু দর্শন। (৩)

—:০:—

গতবারে মহাপুরুষের শ্রীধামনবদ্বীপগমন সংবাদ দিয়া পাঠকগণকে উৎকণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ দুইদিন হইল মহাপুরুষ পুনর্ব্বার সেই সুরধুনী তীরে নিজ মহামহিমাময় মনোহর মুর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে।

সন্ধ্যা অতীত, যাই যাই করিয়াও সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিতে বিলম্ব হইল, রাত্র তখন প্রায় ১১টা যেন একটু অবসর পাইলাম, ভরা পুর্ণিমার রাত্র, চতুর্দ্দিকে রজত ধবল জ্যোৎস্না ছড়াইয়া সমস্ত দিবসের সূর্য্যতাপে সন্তাপিত জীবকে শান্তি দিয়া, চন্দ্রদেব উচ্চাকাশে বিরাজ করিতেছেন। একবার মনে হইল রাত্র অধিক হইয়াছে যাইব না, আবার কেমন মনের মধ্যে ব্যাগ্রভাবে কে যেন বলিতে লাগিল "যাও যাও; গঙ্গাতীরে যাও, আজ বড় সুযোগ।" প্রাণ আর বাধা মানিলনা। আস্তে আস্তে একখানি কাপড় ও একখানি গামছা লইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলাম। কাপড় ও গামছা লইবার উদ্দেশ্য, যদি রাত্রে ফিরিতে না পারি তবে একেবারে ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করিয়া আসিব।

গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখি চাঁদের হাট। পণ্ডিত মহাশয়তো আছেনই তাঁহার সঙ্গে পাঁচ ছয়টি লোক। মহাপুরুষকে কোন ভক্ত ফুলের বড় বড় গ'ড়ে মালা দিয়া বেশ সাজাইয়া দিয়াছেন। কোন কথা না বলিয়া একটী ধারে চুপ করিয়া বসিলাম। তখন পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে মহাপুরুষের খুব কথোপকথন হইতেছে। আমি যেখান হইতে শুনিতে পাইলাম তাহাই পাঠকগণকে

উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব। জানিনা ইতিপূর্ব্বে কত কথাই হইয়া গিয়াছে। একটী কথার শেষ হইলে পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন।—"আচ্ছা প্রভু! শ্রীভগবানের এই যে ভুবনমোহন রূপে জগতে আবির্ভাব হওয়া ইহার কারণ কি?

মহা।—কারণ অনেক, তবে সোজাসুজি কারণ, ভগবান ভুবনমোহনরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয়রূপ প্রকাশেদ্বারা ভক্তগণকে অধিকতর আকর্ষণ করেন। এবং তাহাদিগকে সুখ দেন। আর একটু খুলিয়া বলি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপ নিজে দেখিয়াই চমৎকৃত হইয়াছেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বলিয়াছেন—

"রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার।"

কেনইবা হবেনা যে মদনের ন্যায় সুপুরুষ আর নাই, সেই মদনকে মোহিত করিয়াই না শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন নাম ধরিলেন? তবেই বুঝ এমনরূপে যে সাধারণ জীব আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কাজেই ভগবান আসেন—তাঁহার রূপের ছটায় দশদিক আলো করিয়া সকল জীবকে তাঁহার শ্রীচরণ সমীপে আকৃষ্ট করিয়া—আপনার করিয়া লইতে।

পণ্ডিত।—তবে এই রূপানুরাগ কি স্বভাবতই হয়? না সাধনা চাই?"

মহা।—বিনা সাধনায় কিছুই হইবার নয়, যদিও ইহজন্মে কিছু সাধনা না দেখিতে পাওয়া যায় তবু বুঝিতে হইবে পূর্ব্ব জন্মে এমন সাধনা ছিল যাহা দ্বারা এই রূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই দেখনা—ব্রজবাসীরা যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন কংসও ত সেই কৃষ্ণকেই দেখিলেন, কিন্তু আকৃষ্টতো হইলেন না। ব্রজবাসীর দৃষ্ট মাধুর্য্য কংস ধরিতে না পারিয়া সেই কৃষ্ণকেই যমের ন্যায় মহাভীষণ ভাবে দেখিলেন।

পণ্ডিত।—আচ্ছা ব্রজেতো ভগবান সকলের নিকটই সমান ভাবে প্রকাশ হইয়াছিলেন।

মহা।—না, ব্রজেও ভেদ দর্শন বড় কম নয়? স্নেহময়ী মা যশোদা বাৎসল্য ভাবে কৃষ্ণের যেরূপ দেখেন, ব্রজ বধূগণ মধুর ভাবের রসাস্বাদনকারী, কাজেই সেরূপ দর্শন করেন না। মা যশোদা দুধের গোপাল, স্নেহের পুতুলী দেখেন আবার কেউ কেউ মদনমোহন কেউ কেউ বা শৃঙ্গার রসময় মূর্ত্তি

দর্শন করেন। ভাব ভেদেইত রূপ ভেদ হয়। হিরণ্যকশিপুর কি ভীষণ ভাব, তাহার জন্য রূপের প্রকাশও দেখ ভয়ানক নৃসিংহ মূর্ত্তি।

পণ্ডিত।—এক শ্রেণীর লোক বলেন তিনি অনন্ত, অপরিসীম তাঁহার আবার নির্দ্দিষ্ট রূপ কি ?

মহা।—সবই ঠিক, তিনি অনন্তও বটেন, অপরিসীমও বটেন। কিন্তু তা বলিয়া কি তাঁর রূপ থাকিতে পারেনা, যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী তাঁহারা বলেন ভগবানের কোন রূপ নাই, কিন্তু সেটা ঠিক বলা যায়না। সবিশেষ ব্রহ্মবাদীরা জানেন তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরং"। জগতের যেদিকে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে ব্রহ্ম-শক্তিরই বিকাশ, যদি তাহাই হইল তবে যাঁহার শক্তি বিকাশে জড় জগতে এত সৌন্দর্য্য এত মাধুর্য্য প্রকাশিত হইতেছে, তিনি যে কত সুন্দর, কত মাধুরী-মণ্ডিত তাহাতো সহজেই অনুমান করা যায়। তবে সকলে সে ভাব লয় না। সাধারণতঃ তুমি যে ভাবের লোকের কথা বলিলে সেভাবের লোক জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মোহিত হয়, সেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আধার শ্রীভগবানকে ধারণা করিবার শক্তি তাহারা পায় না। একটু ভাবিয়া দেখ দেখি—এই যে তুমি আকাশের নীলিমায়, নিশার চন্দ্রিমায়, কুসুমের সুষমায়, পাখীর পাখায়, গাছের পাতায় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রত্যক্ষকর এ সকল কোথা হইতে আসিল, তবে এই সুন্দর—এই চিরসুন্দর লীলা-বিকাশের আধার সেই গোপী-হৃদয়-রঞ্জন ভক্ত-চিত্তহারী মদনমোহনের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের সাক্ষাৎ অনুভব যথার্থই দুর্লভ এবং বহু জন্ম জন্মান্তরের সাধন সাপেক্ষ।

পণ্ডিত।—আচ্ছা এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে কি হয় ?

মহা।—তুমিতো পণ্ডিত, তোমারতো সবই জানা আছে। যখন কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিয়াছিলেন—

আনীতা ভবতা যদা পরিণীতা সাধ্বী ধরিত্রী সুতা।
স্ফুর্জ্জদ্ রাক্ষস মায়য়া ন চ কথং রামাঙ্গমঙ্গীকৃতম্।

অর্থাৎ হে রাবণ! যদি ধরিত্রী সুতা ক্লেশ সহনশীলা শ্রীরামের বিবাহিতা সাধ্বী সীতাদেবীকে তোমার আনিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে এক কাজ করনা কেন? সীতাদেবী যখন শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষকেই জানেননা

তখন তুমি রাক্ষসী মায়ার সাহায্যে রামরূপ ধারণ করিয়া সীতা দেবীকেতো অনায়াসেই লাভ করিতে পার ?" ইহার উত্তরে রাবণ বলিয়াছিলেন "ভাই! যে যুক্তিটী তুমি বলিলে তাহার চেষ্টা কি আমি করি নাই ? কিন্তু অনুকূল ফল না হইয়া বরং বিপরিত ফলই হইয়াছিল—

"কর্ত্তুং চেতসি রামরূপমমলং দূর্ব্বাদল শ্যামলং।
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরং পরবধূ সঙ্গ প্রসঙ্গঃ কুতঃ॥

তুমি কি জাননা যে, যেরূপ ধারণ করিতে হইবে সেইরূপের চিন্তা আগে করিতে হয় ? আমি রামরূপ ধারণ করিব বলিয়া সেই দূর্ব্বাদল শ্যাম রাম চন্দ্রের রূপ যেমন চিন্তা করি অমনি আমার পরম পদ যে ব্রহ্মপদ তাহাও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, পর বধূ সঙ্গতো দূরের কথা।" তবেই এখন দেখ দেখি, রূপ চিন্তা দ্বারা কি হয় না হয় ? শ্রীভগবানের রূপ চিন্তার এমন শক্তিই বটে ? এ বিষয় কোন ভুল নাই।

বিল্বমঙ্গল একদিন শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া বলিয়া ছিলেন —

" মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতি মণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজোনু মম জীবিত বল্লভো নু
কৃষ্ণোহয়মভ্যু দয়তে মমলোচনায়॥

অর্থাৎ—এরূপ দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়া ছিলাম এ বুঝি স্বয়ং কন্দর্প যিনি রূপের ছটায় ত্রিভুবন শাসন করেন ইনি বুঝি সেই মহামারক কামদেব। কিন্তু শেষে বুঝিলাম মারক কন্দর্প নহেন, ইহাতেতো পূর্ণ মাধুর্য্য বিদ্যমান, যেন এক মধুর দ্যুতি-মণ্ডল। মারক মদনেতো এ মাধুর্য্য নাই। আবার মনে হইল মাধুর্য্যদ্যুতি বলি কেন ? ইনি স্বয়ংই মাধুর্য্য। ইনি নয়ন ও মনের অমৃত ; শেষে বুঝিলাম ইনি আর কেহ নয় সেই রাধার মনচোরা, বেণী-মোচক, জীবিতবল্লভ, নবকিশোর, মোহন মুরলীধারী ব্রজজন-নয়ন-রঞ্জন মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণ। বুঝলে পণ্ডিত, রূপের কথা কত বলব যত দেখিবে, যত শুনিবে, ততই লালস-বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। এই বলিয়া মহাপুরুষ তাঁহার স্বভাব মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন।

" কেরে যমুনাকুলে আলো ক'রেছে কাল জলে।
অনূপ সে রূপ-ভূপ অপরূপ নীপ তরু মূলে ॥
মুরছে রতিপতি যতি যোগীজন মনোচোরা,
ব্রজ যুবতী কুলবতী মূরতী মতি মাতোয়ারা,
আরতি রসে বিরতি বাসে, বাসে আবাসে বনে যারা,
পীরিতি মাখা মূরতি বাঁকা যায়না রাখা সতীকুলে ॥
মদন দমন মুখ বিমুখ আধ শশধর,
চাঁচর চুলে বকুল ফুলে আকুল করে মধুকর,
শিরেতে বাঁকা শিখিপাখা লেখা রাধিকা নাম অক্ষর
নয়ন দিলে কেনা ভুলে কে না হয় সে বিনা মূলে ॥
যুগল ভুরু কামের গুরু গৌরব গরবহানে,
কে ধৈর্য্য ধরে যুবতী ঘরে নিরখিলে তায় নয়ন কোণে,
অধরে হাসি অমিয়া ভাসি দাসী করে রমণীগণে,
করেতে বাঁশী করে উদাসী কত কলসী ভাসে জলে ॥
তড়িত ঘন জড়িত যেন পীতবসন করে শোভা,
গলেতে দোলে মালতিমাল মুনিজন মনোলোভা,
নুপুর পদে করে শোভা আকুল কুল-বল্লভা,
রূপের ছাঁচে খুড়িয়া কাঁদে চাঁদ কাঁদে তাঁর পদতলে ॥
কাল রূপেতে আলো ক'রেছে যদ্যপি যমুনা তটে,
রূপের সীমা নাই তুলনা স্বরূপে রসরাজ বটে,
রাধিকা রূপসী যদি শ্যামের বামেতে ঘটে,
কিশোর ভনে বাসনা মনে সেবিব পদ যুগলে ॥"

অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গানটী মহাপুরুষ গাহিলেন, হটাৎ গান শেষ করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন পণ্ডিত! আজ বড় সুন্দর রজনী এই জ্যোৎস্না পুলকিত রজনী বিশেষতঃ এমন সুরধুনীর তীরে বসিয়া কি মনে হয় বল দেখি?

পণ্ডিত।—মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, এমন রজনীতেইতো যমুনা পুলীনে শ্যামের বাঁশী বেজেছিল, সেই বাঁশী শুনিয়া গোপিনীগণ সব ভুলিয়া আপনা পাশরি সেই বংশীধারীর দর্শনে ছুটিয়াছিল। দেব, বলুন, বলুন সেই রাস

বিহারী গোবিন্দ চন্দ্রের কিছু কথা বলুন, আর রাত্রিও অধিক নাই এইভাবেই যদি আজ রাত্রি কাটিয়া যায় সে এক মহাসৌভাগ্য বলিতে হইবে।

মহা।—পণ্ডিত যথার্থই বলিয়াছ তোমার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। দেখ, এও এক সাধনা। সর্ব্বদা সর্ব্ব ভাবে সকল বিষয়ের মধ্যেই যে কৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি এ এক মহা সাধনা। দেখ, একেই বলে লীলার উদ্দীপনা। আজ সুরধুনী তীরে পূর্ণিমার আলোকে আলোকিত চতুর্দ্দিক দেখিয়া তোমার সেই রাসলীলার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে এ বড় মধুর, বড় প্রাণারাম, এই বলিয়া মহাপুরুষ তাঁহার সঙ্গে যে একটী শিষ্য ছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বলতো গোবিন্দদাস! তোমার সেই গোবিন্দরূপ বর্ণনাচ্ছলে রাসের গানটী," পার্শ্বে উপবিষ্ট একটী নবীন বয়স সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি আদেশ পাইয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

" কেহে তুমি কালবরণ রাসমঞ্চ আলো ক'রে,
হেরিলে ঐ প্রেম মুখ সকল দুঃখ যায় গো দূরে।
রাধিকা লতিকা বেড়া, বামে হেলা মোহন চূড়া
কটীতটে পীত ধড়া, মোহন বেণু ধ'রে অধরে॥
বনমালা দুলে দুলে, শোভিছে বিনোদ গলে
লুটিছে পড়িছে ঢলে, রাঙ্গাচরণ পাবার তরে॥
কালরূপে দশদিশি হ'য়েছে আজ হাসি হাসি
উদয় যেন শত শশী, সৌদামিনী জলধরে॥
মেটেনাকো আশা মম হেরিয়ে তোমায় বাহিরে
এস এস হৃদয় রতন রাখি তোমায় হৃদে ধ'র॥

আমরি মরি, কিভাব আর কি কণ্ঠ, একেবারে যেন ভাবে গলিয়া প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া গানটী গাহিল। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ নয়নের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, পণ্ডিত, আজ আর কথা ভাল লাগিবেনা আইস সকলে মিলিয়া যে রাত্রিটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা কৃষ্ণ কীর্ত্তনেই অতিবাহিত করি। তোমরা সকলে মিলিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিও এই বলিয়া মহাপুরুষ হাতে তালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন ;—

" দেখে এসগো সহচরী মরি মরি কি মাধুরী
দাঁড়ায়েছেন বংশীধারী তপন তনয়া তটে।

জলধর জিনি অঙ্গ তনু ললিত ত্রিভঙ্গ,
তমাল অঙ্গে মেশা অঙ্গ যেন কালীয় ভুজঙ্গ,
কি দিয়ে গড়েছে অঙ্গ নয়নে দংশীল অঙ্গ
কুলের গৌরব হ'ল সাঙ্গ কি জানি কপালে ঘটে ॥
বংশী নিয়ে বংশীধারী চূড়া বামে বাঁকা করি,
দিয়ে চরণ চরণোপরি ত্রিভুবন আলো করি,
রূপ হেরে শুকশারী প্রেমেদেয় গড়াগড়ি,
এবার, দিবে সব কুলে কালী বুঝি সখি সে লম্পটে ॥
পরাবধি সে নয়নে যেতে নারিগো ভবনে,
ফিরি সদা বনে বনে কে যেন কয় কাণে কাণে,
চললো নিকুঞ্জ বনে প্রেমিক প্রেমিকা সনে,
মুকুন্দ ভাবিছে মনে জল আনিতে যাবে ঘাটে ॥"

এই গান ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আখর, সে যে কি ব্যাপার তাহা লিখিবার শক্তি আমার নাই। শেষে" দেখা দাও দেখা দাও, প্রাণ গোবিন্দ গোপীনাথ" এই ধুয়া ধরিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন চলিল, এদিকে ভোর যে কখন হইয়াছে কাহারও সে সংজ্ঞা নাই, হটাৎ গঙ্গাতীরের কল হইতে ৭টার বাঁশী বাজিয়া উঠিল অমনি তাড়াতাড়ি মহাপুরুষ কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থে "জয় গুরু জয় গুরু" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আমরাও মহাপুরুষের নিকট বিদায় লইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। রাস্তায় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "কিহে তুমি কখন এসে জুটেছিলে? দেখ, যথার্থই যতটুকু সময় ইহাঁর নিকট থাকা যায় পরমানন্দেই কাটে, তোমরা কিবল? তোমাদের কি মনের ভাব জানিনা আমি কিন্তু বড়ই আনন্দ পাই, যাই হউক আমাকে অবসর করিয়া এক একবার আসিয়া ইহাঁর চরণ দর্শন করিয়া যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম "পণ্ডিত মহাশয়! আমাকে দয়া করিয়া সঙ্গে আনিবেন আমারও বড় ভাল লাগে।" এইভাবে নানা কথা বলিতে বলিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিল। আমিও আশ্রমে ফিরিলাম বাড়ি আসিয়া দেখি বেলা তখন পৌণে এগারটা।

আদুরে ছেলে।

—:০:—

মায়ের আদুরে ছেলে গোরা দ্বিজমণি।
সর্ব্ব নদীয়ার পথে খেলেন আপনি ॥
কত রঙ্গ জানে গোরা কহিব কি তার।
খেলা ছলে হরিনাম করেন প্রচার ॥
পূর্ব্বে যেইমত ক্রীড়া করিলা গোকুলে।
সেই সব লীলা প্রভু করে বাল্যকালে ॥
শুধু যে বালকে মাতে প্রভুর খেলায়
আহা নহে, পণ্ডিতেও আপনা হারায়।
হেথায় খুজিয়ে বুলে মাতা শচীরাণী।
ক্ষুধার সময় কোথা স্নেহের বাছনি ॥
মাতা বলে হারে বাপ তোর ক্ষুধা নাই।
আয় কোলে যাদুমণি ঘরে ফিরে যাই ॥
ক্রুদ্ধ বাক্যে না আসিবে জানে ভাল মতে।
তাই তারে ভুলায়েন মাতা নানা মতে ॥
জননীর মধুর বাক্য এড়াতে নারিল।
সোণার গৌরাঙ্গ মোর গৃহে ফিরি গেল ॥

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

কৃতাকৃত।

—:০:—

নাথ !

যবে, মঞ্জীর-মধুর-মৃদুল-সুধ্বনি
পশেছিল এই শ্রবণে।

যবে, চরণের তলে রেণু হ'তে সাধ
জেগেছিল এই পরাণে ॥

যবে, আকুলি ব্যাকুলি ছুটেছিল প্রাণ
বহুদূরে শুনি বাঁশরী।
তখনি হে নাথ! কি জানি কি ভয়ে
সকলি ফেলিল আবরি॥

এসে, ঘোর কুহেলিকা তামসীকুহকী
ল'য়ে গেল দূর বহু দূরে।

সেথা, অজানা অচেনা কণ্টকের পথে
দিশাহারা যেন চির তরে॥

তবে, ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরিল নয়ন
চাহিল উপরে নীলিমায়।

আর, অবশ পরাণ নিরবে ডাকিল
কোথা নাথ তুমি দয়াময়।

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্। ভাগবতাচার্য্য মহাপ্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দেব গোস্বামী প্রণীত। গ্রন্থখানি কৃপা করিয়া গোস্বামী প্রভু দিয়াছেন, পাঠ করিয়া কতদূর আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিবার ভাষা পাইনা। এই গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার ব্যাখ্যা অতি বিস্তৃত ভাবেই করিয়াছেন, পরন্তু গোলক লীলাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে শ্রীরাসলীলা পর্য্যন্তই এই খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। আশা দিয়াছেন অন্যান্য লীলাও প্রকাশ করিবেন। আমরা সমস্ত লীলার প্রকাশ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলাম। প্রথমে প্রভু নিজকৃত সরল সংস্কৃত শ্লোকে লীলা বর্ণনা করিয়া শেষে উহারই সরল ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা যেমন সুন্দর ও সরস তেমনই মধুরতর ভাব পূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয় লেখক প্রকৃতই লীলারসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তারপর সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমন সরল অথচ মধুর ভাবে রচিত যে, পাঠ করিতে বা বুঝিতে কোন কষ্টই হয়না অধিকন্তু পাঠ করিতে করিতে মনে হয় এ যেন প্রাচীন কোনও মহাকবির রচিত শ্লোকই পাঠ করিতেছি। আজীবন ভগবৎ-লীলা আলোচনা করিয়া প্রভু যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন আশা

করি সকলেই সে গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন। এমন মধুর গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এ গ্রন্থ নিত্য অহরহ আস্বাদনের জিনিস। প্রভু ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাতা। আমরা তাঁহার শ্রীমুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি তারপর আবার এই গ্রন্থ পাইয়া প্রকৃত পক্ষেই বিশেষরূপে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ প্রভু এইভাবে ভগবানের সমগ্র লীলার আলোচনা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সমস্তই সুন্দর এই দুর্ম্মূল্যের সময় এমন উৎকৃষ্ট কাগজে এত বড় গ্রন্থ ১৷৷০ দেড় টাকায় দিয়া গ্রাহকগণকে আরও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ১৮নং অদ্বৈত চরণ মল্লিকের লেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট ও গুরুদাস লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। উক্ত গোস্বামী প্রভু প্রণীত, পঞ্চরত্ন, পিতৃস্তোত্র পতিব্রতা এই তিনখানি গ্রন্থ পাঠেও আনন্দিত হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীশ্রীবংশী বিকাশ, কল্কিপুরাণ বঙ্গানুবাদ ও আবার গৌর এ সকল গ্রন্থ এখনও আমরা পাই নাই।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত-সম্মিলনী।

—:০:—

বিগত ৪ঠা ১১ই ১৮ই ও ২৫শে ভাদ্র এবং ১লা ৮ই ২২শে ও ২৯শে আশ্বিন শ্রীসম্মিলনীর অধিবেশন যথারীতি হইয়াছে। ভক্তগণের আগ্রহে ১৫ই আশ্বিন ও ২২শে আশ্বিন দুই দিনই শ্রীনগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। সহকারী সভাপতি মহাশয় পীড়িত থাকায় ২টী সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য সভাবন্ধ করা হয় নাই। সভ্যগণ যথারীতি সভাধিবেশন করিয়াছেন। দিন দিন সভার সভ্যগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই শ্রীসভার বিশেষ উন্নতি হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সভার উন্নতী কামনা করি। প্রতি বৃহস্পতীবারেই মাসিলা ভক্তি-নিকেতনে সভার অধিবেশন হয় আমরা সকলকেই যোগদান করিতে অনুরোধ করি।

বিনীত :—
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী।
(সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত-সম্মিলনী।)

গয়া-প্রত্যাগত।

ন'দেরমাঝে পড়্‌ল সাড়া আস্‌ছে গৌর ফিরে।
ভক্তগণও আস্‌ছেন সাথে চতুর্দ্দিকে ঘিরে॥

ন'দেবাসী ছুট্‌ল সবে ফেলি আপন কাজ।
কুলবালা আপনহারা হানি লাজে বাজ॥

সোণারগৌর ফির্‌ছে শুনে পড়ুয়াগণ কাঁপে।
জারিজুরি খাট্‌বেনা আর নিমাই চাঁদের দাপে॥

বিষ্ণুপ্রিয়া আকুল হ'লেন, পথের পানে চেয়ে।
শচীমাতা নিমাইচাঁদে আন্‌তে গেলেন ধেয়ে॥

হেথায় গৌর আস্‌ছেন ফিরে বড়ই কাতর প্রাণ।
ভাবছেন শুধু দেখ্‌বেন কবে ব্রজে মধুর কান॥

বাহ্য দৃষ্টি নাইক তাঁহার নয়ন জলে ভাসে।
তেমনগৌর এমন হ'লেন আকুল ভক্ত ত্রাসে॥

ধেয়ে গিয়ে শচীরাণী পুত্র নিলেন কোলে।
বলেন বাপ! ব্যাকুল কিরে রাস্তা এত চলে?॥

পুত্র স্নেহে পাগলিনী (মা) বুঝলেন না তাঁর মন।
বিশ্বের কাজে বিশ্বনাথ (যে) হারায়েছেন আপন॥

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

হরিনামের অগ্নি-পরীক্ষা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

(১)

—:০:—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

অহঙ্কারী অবিশ্বাসী জীব কিছুতেই খাটো হইতে চাহেনা, আত্মগরিমা ছাড়িতেও রাজি হয় না, আর নিজের বুদ্ধিতে বেড় না খাইলে তাহা বাতুলের বাতুলতা বা কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়াই দিতে চাহে। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বা আপ্তবাক্য বলিয়া কিছুই মানিতে চাহে না। আধুনিক বৈদেশিক-শিক্ষা এই স্বাতন্ত্র্যভাবকে আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। তবে উচিৎ কথা বলিতে গেলে শাস্ত্রেরও স্থল বিশেষে বাড়াবাড়ি কিছু বেশী। নাম-মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া শাস্ত্র শতমুখ হইয়া বলিতেছেন—"হরিনাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলে সকল লোকের নিখিল পাপ তাপ দূরীভূত হইয়া যায়; মোহতিমিরাচ্ছন্ন ভবজলধি পারে যাইবার একমাত্র তরণী হইল ভুবনমঙ্গল হরিনাম। সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।" এই ঘোর বিচার বিতর্কের যুগে শাস্ত্রের এত বড় একটা কথা ষোল আনা ভাবে কে মানিবে?

ত্রেতাযুগে সতীত্বের একবার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল; সতীশিরোমণি জগন্মাতা সীতাদেবীকে অগ্নি প্রবেশ করিয়া তবে সতীত্বের গৌরব অব্যাহত রাখিতে হইয়াছিল। এবার কলিযুগে শ্রীনামের অগ্নি পরীক্ষা হইল। সেবারের পরীক্ষা হইয়াছিল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট, এবারের পরীক্ষা হইল শয়তানের হাতে, তাই নির্ম্মমতায় এবারের অভিনয় ভীষণ হইতে ভীষণতর—ভীষণতম হইয়া উঠিল।

কামদেবের অমোঘ অস্ত্রে বজ্রপাণি স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেব লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত হইয়াছিলেন, দেবাধিদেব ত্রিশূলধৃক ত্রিপুরবিজয়ী মহাদেবও বিপর্য্যস্ত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং সর্ব্বলোক পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও নিতান্ত কলঙ্কিত

হইয়া সপ্তলোক মাঝে মুখ লুকাইবার স্থান পান নাই। সেই বলদর্পি ও ধৃষ্ট কামদেব এবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, বুঝি শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তের প্রভাব পরীক্ষা করিয়া জগৎবাসীকে দেখাইতে আসিয়াছেন।

পাঠক! দেখুন ঐ বেণাপোলের নির্জ্জন উপবনস্থিত পর্ণকুটির দ্বারে এক নবযৌবন ভরে গর্ব্বিতা পরমারূপসী কামচারিণী মোহিনীমূর্ত্তি, ধ্যাননিমগ্ন এক নবীন ব্রহ্মচারীর সম্মুখে সমুপস্থিতা। যোগভঙ্গ করিতে স্বর্গবিদ্যাধরী অনিন্দ্যরূপসী উর্ব্বসী এই কলিযুগেও কি মর্ত্তধাম পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছেন? শারদশুভ্র জোৎস্নালোকে রূপসীর রূপেরছটা আরও উছলিয়া পড়িতেছে, কামিনীর কামপিপাসা-তরঙ্গ যেন রঙ্গভঙ্গে নৃত্য করিতেছে। মনের মত শিকার দেখিয়া রূপযৌবনস্ফীতা বিলাসিনী ধনুকে একেবারে পঞ্চবাণ জুড়িয়া বসিলেন।

অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখাই বসিল দুয়ারে।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে ॥
ঠাকুর, তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন ॥

বেণাপোল মুলঘর পরগণার অন্তর্গত। মুলঘরের দুষ্ট জমিদার রামচন্দ্র খাঁর বিশেষ প্ররোচনায় বারাঙ্গনা হীরা নিজের রূপের জালে শিকার ধরিতে আসিয়াছিল; কিন্তু উল্টা হইয়া গেল, যুবকের নবীন যৌবন ও অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিয়া হীরার মন ঐ চরণে বিক্রীত হইতে চাহিল। হীরা ভাবিল এই দেবদুর্লভ রমণীয় মুর্ত্তির কাছে জীবন যৌবন সব বিনামূল্যে বিকান যাইতে পারে। হীরা মনের কথা আর গোপন রাখিতে পারিল না। উপযুক্ত স্থান ও সুযোগ বুঝিয়া একেবারে নির্লজ্জ প্রস্তাব করিয়া বসিল। হীরা বলিল,—

"তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥"

নবীন ব্রহ্মচারীর তেজঃপুঞ্জ দিব্যকান্তিতে উপবন যেন আলোকিত হইয়া আছে। যুবক বাহ্যজ্ঞান শূন্য, নামরসে নিমগ্ন। কামিনীর কামভিক্ষার প্রস্তাব বজ্রের ন্যায় তাঁহার বক্ষে বাজিল, যুবক চমকিয়া উঠিলেন, রূপসীর দিকে তাকাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। হা প্রভো! এই মক্ষিকার উপর কামান সজ্জিত হইল কি জন্য? "দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।"

যাহাতে মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ হয়, এই দুর্ব্বলের উপর সেই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা কি জন্য? মায়াদেবীর ব্রহ্মাস্ত্র উল্কাজাল বিকীরণ করিতে করিতে গ্রাস করিতে আসিতেছে দেখিয়া প্রথমে মুহুর্ত্তের জন্য হরিদাসের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, পরমুহূর্ত্তে নামের অচিন্ত্য-প্রভাবে নিরাশ্রয় যুবক শক্তিসম্পন্ন হইলেন। হরিদাস বুঝিলেন—সমস্তই প্রভুর খেলা? নাম স্বয়ং কৃষ্ণ, নামরূপী কোটি-কন্দর্পলাঞ্ছন শ্রীনন্দনন্দনের আশ্রয়ে তিনি রহিয়াছেন। সেই নিরাপদ নামতুর্গে থাকিতে সহস্র কামদেব আসিলেও আমার কেশাগ্রস্পর্শ করিতে পারিবেনা। হরিদাস বুঝিলেন—

"কৃষ্ণ সূর্য্য সম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥"

তাই রমণীর কথা শুনিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কামভিখারিণীকে বলিলেন—

* * তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥

আঃ সর্ব্বনাশ! আকুমার ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য বুঝি রূপসী যুবতীর রূপের জোয়ারে শুষ্ক তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল! হরিদাস যে কামচারিণীর প্রার্থনা একরকম অঙ্গীকার করিয়াই বসিলেন! কেবল ব্যবধান রহিল শ্রীনাম সংখ্যা পূর্ণতা। তাহা আর কামদেবের কাছে কতক্ষণ টিকিবে! নাম কি এই পরীক্ষায় ব্রহ্মচারীকে রক্ষা করিতে পারিবেন? পাঠক, অধীর হইবেন না, দেখুন শেষ পর্য্যন্ত কি ফল দাঁড়ায়।

কামকিঙ্করী হীরা আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িল, ভাবিল আমার রূপ-জ্যোতিতে কত হাতি ঘোড়া তল হইয়া গেল, পতঙ্গ আর কতক্ষণ টিকিবে? আলম্বন উদ্দীপন হীরার সম্পূর্ণ অনুকূল। গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত বাসন্তীকুসুমাকীর্ণ পরম রমণীয় উপবন, পূর্ণচন্দ্রমা-কিরণোদ্দীপ্ত রাত্রি কাল। জনসমাগমের সম্ভাবনা বিরহিত নির্জ্জন কুটিরে যুবক যুবতী অবস্থিত, এহেন অবস্থায় হীরার কামনা আর কতক্ষণ অপূর্ণ থাকিতে পারে? আশার বাণী শুনিয়া হীরা কাল

প্রতীক্ষা করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া আছে। ওদিকে প্রেমগদগদ কান্তি অধিকতর নিষ্ঠার সহিত উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে হীরা আবিষ্ট চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া যুবকের অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিতেছে। কখন যে রাত্রি পোহাইল তাহা জানিতেও পারে নাই। উষাগমে পক্ষীর কলরব শুনিয়া হীরা চমকিয়া উঠিল। যুবকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইল। দেখিল, নামস্রোত জলপ্রপাতের ন্যায় অবিরাম চলিতেছে। "কালি আসিব" বলিয়া অনিচ্ছার সহিত হীরা প্রণাম করিয়া গৃহে চলিল। যাইতে যাইতে ভাবিল আমার ভাগ্যে কি এ হেন নিধি মিলিবে?

অনেক সময়ে ঘরের দ্বার রুদ্ধ না করিয়াও সাধু গৃহস্থ ঘুমাইয়া পড়েন, কিন্তু কতক্ষণে পরের সর্ব্বনাশ করিব সেই চিন্তায় চোরের ঘুম আইসে না। পাপ-মতি রামচন্দ্র খাঁর নিদ্রা নাই, কতক্ষণে হরিদাসের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সেই সুসংবাদ পাইবে, আর একটা সোরগোল করিয়া ধর্ম্মধ্বজীর মুখে চুণ কালী দিয়া বিদায় করিবে সেই চিন্তায় ব্যাকুল। তাহার ধারণা হরিদাস ভয়ঙ্কর অপরাধী, জীয়ন্তে পুতিয়া ফেলিলেও তাহার সমুচিত শাস্তি হয় না। সে কি না ম্লেচ্ছ যবনকুলে জন্মিয়া এখন পরম হিন্দু সাজিয়া "হরিদাস" হইয়াছে। তারকব্রহ্ম নাম, যাহা হিন্দুর একচেটিয়া সম্পত্তি তাহাই কি না ম্লেচ্ছ যবন হইয়া, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছে? ইহার উপর আবার রাজা রামচন্দ্র খাঁর মোসাহেব ব্রাহ্মণ কুলতিলক দুর্গাদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক হরিদাসের কুহকে পড়িয়া সাধু সাজিয়া হরিদাসের চেলা হইয়াছে; এই অতি অমার্জ্জনীয় অপরাধে হিন্দু সমাজপতি ব্রাহ্মণ কেশরী রামচন্দ্রখাঁর বিজাতীয় ক্রোধ হইয়াছে। তাহার ধারণা হরিদাস ভণ্ডতপস্বী, কাজেই উহাকে গ্রাম হইতে দূর করিবার জন্য অনেক যুক্তি পরামর্শ চলিতে লাগিল। পাপবুদ্ধি রামচন্দ্রখাঁ বলিলেন "শুধু তাড়াইলে কি হইবে, উহার ইহকাল পরকাল একেবারে খাইয়া দিতে হইবে;" তখন বারবিলাসিনীদের তলব পড়িল, সাধু সন্ন্যাসীর যোগভঙ্গ করিতে যাইবার প্রস্তাবে কেহ বড় একটা রাজি হইল না; শেষে রামচন্দ্র খাঁর নিজের রক্ষিতা হীরা নটীর তলব পড়িল। হীরা নিজের পশারের খাতিরে স্বীকার করিয়া বসিল। মদগর্ব্বিতা হীরা ভাবিল রাজা যাহার শ্রীচরণের গোলাম, তাহার নিকট পর্ণকুটিরবাসী ভিখারী কতক্ষণ টিকিবে। সেই আশায় হীরা পর্ণকুটিরে

যাইয়া এখন নিজেই ফাঁদে পড়িয়াছে। পরদিন প্রাতেই রাজা হীরার নিকট পাইক পাঠাইয়া তত্ত্ব লইলেন। হীরা বলিল—

আজি আমা অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥

হীরা গৃহকর্ম্ম করিতেছে কিন্তু মন আনমোনা হইয়া গিয়াছে, সেই ব্রহ্মচারীর কণ্ঠ নিঃসৃত "হরেকৃষ্ণ" নাম যেন মরমে যাইয়া ঝঙ্কৃত হইতেছে। কৌতুহলাবিষ্ট সহচরিরা সংবাদ জানিতে আসিল; হীরা নবীন তাপসের অপূর্ব্বভাবের কথা দুই একটা বলিল বেশী কথা কহিল না। চারি দণ্ড বেলা থাকিতেই অভিসারের সাজসজ্জা করিল, গা ঢাকা অন্ধকার হইতে না হইতেই হীরা চলিল।

নামনিষ্ঠ হরিদাসের নাম নিষ্ঠা আজ শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, অবিরাম—অবিশ্রাম প্রপন্নভাবে নাম করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—"প্রভো! আমার দ্বারা কি শ্রীনামের মহিমা সংরক্ষিত হইবে? পরক্ষণে শ্রীনামের স্বরূপ উদ্দীপ্ত হইল—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মানামনামিনোঃ॥

নাম নামি অভিন্ন, যেই নাম সেই কৃষ্ণ। নাম-চিন্তামণি স্পর্শ মাত্রেই মহাপাপীর পাপকলঙ্ক বিধৌত হইয়া পবিত্রাত্মা হইয়া যায়। নাম সাক্ষাৎ সর্ব্বাকর্ষক চিদানন্দ স্বরূপ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম স্বরূপতঃ সর্ব্বাংশে একরূপ। শাস্ত্রবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশ্বাসী হরিদাস হিমাচলের ন্যায় অচল অটল রহিলেন। সমাগতা কামভিখারিণী সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া, মায়াবিকৃত জীবের দুর্গতি দেখিয়া হরিদাসের হৃদয় গলিয়া গেল, মহাপরাধীর ন্যায় সদৈন্যে বলিলেন—

কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নামপূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥" চৈঃ চঃ

হীরার কর্ণে অমৃতবর্ষিত হইল ; সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত প্রবাহ ছুটিল, পুলকিতাঙ্গী ভক্তিভরে শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করিল ও ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় দ্বারদেশে চাপিয়া বসিল। মনে করিল আজ নিশ্চয়ই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। পাঠক মানসনেত্রে একবার এই সুন্দর দৃশ্যটী অবলোকন করুন। মহাতেজঃপুঞ্জ নাম বিগ্রহের দিব্য মূর্ত্তির সম্মুখে ঘনীভূত পাপের কালিমাময়ী মূর্ত্তি! শ্রীনামসূর্য্য যেন অনন্ত নরকের ঘোর তমসামেঘে সমাচ্ছন্ন। প্রাকৃত কামদেব অষ্টপ্রহর নামনিষ্ঠ নিরীহ গৌরভক্তকে অষ্টে পৃষ্ঠে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছেন! নামের সহিত কামের লড়াই চলিয়াছে, গৌরভক্ত কিরূপ খেলোয়ার তাহাই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে জগৎ দেখিতেছে। বায়স্কোপে যেমন দেখিতে দেখিতে জলন্ত চিত্র শূন্যে মিশিয়া যায় মায়াপিশাচীর কত লক্ষজনমের পাপকলুষিত কালিমামূর্ত্তি কিরূপে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া দিব্যবর্ণে রঞ্জিত হইতেছে, পিশাচের প্রিয়রঙ্গ নরক কিরূপে শ্রীনাম কৃষ্ণের দিব্য নিকেতন শ্রীগোলকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে পাঠক অবলোকন করুন।

নামনিরত হরিদাসের দর্শন মাত্রেই হীরার বহু জন্মের সঞ্চিত ভিজা "পল গাদায়" (তৃণরাশিতে) আগুন লাগিয়াছে, ধূমায়িত অবস্থা, আগুনকে চাপিয়া নিভাইতে চাহিতেছে কিন্তু শ্রীনামের অচিন্তশক্তি ক্রমেই জাগিয়া উঠিতেছে। অই দেখুন দ্বারে বসিয়া নাম শুনিতে শুনিতে অননুসন্ধান মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় হীরা "হরি হরি" বলিতেছে!

"দ্বারে বসি নাম শুনে বোলে "হরি হরি।"

বলিহারি নাম মহিমা! মায়াদেবীর অনাদিকালের হাতেগড়া নিজ-কিঙ্করী, যাহার দ্বারা কত অকর্ম্ম করাইয়াছেন, কত নিরীহের সর্ব্বনাশ করাইয়াছেন, মায়ায় সেই চিরকিঙ্করী দুইদিনেই হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। ওদিকে নাম প্রবাহ অবিরাম চলিয়াছে, হীরার মনেও ঝড় উঠিয়াছে, তাহার প্রাকৃত সুখভোগ লালসা ক্রমে সরিয়া যাইয়া কি যেন কি এক নূতন প্রকারের লালসা জাগিতেছে। হীরা নামনিষ্ঠ নবীন যোগীর দিকে বিস্মিত নয়নে তাকাইয়া আছে আর ভাবিতেছে ইহাঁরতো রক্ত মাংসের দেহ কখনই নয়, দুনিয়ায়তো এপরম্ন লোক কখন দেখি নাই বা শুনিও নাই। হীরার মনে একবার হইতেছে

যে, এরূপ অপূর্ব্ব দেবতার সর্ব্বনাশ করিলে নরকেও স্থান হইবেনা, উঠিয়া ঘরে যাই। পরমুহূর্ত্তে ভাবিল তাহা হইলেতো এতদিনের পশার প্রতিপত্তি সব ভাসিয়া যায়। তখন সুমতি কুমতি আপোষ করিল "যাক্ যখন নির্লজ্জ প্রস্তাব মুখ ফুটিয়া করাই হইয়াছে, তিনিও অঙ্গীকার করিয়াছেন তখন দেখা যাউক শেষ কি হয়!" হঠাৎ পক্ষীকুলের কাকলীতে হীরার চমক্ ভাঙ্গিল, কাতর দৃষ্টিতে হরিদাসের মুখের দিকে তাকাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—

"রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উষিপিষি করে।"

জীবের দুর্গতি দেখিয়া হরিদাসের হৃদয় গলিয়া গেল। মহা অপরাধীর ন্যায় পুনর্ব্বার হীরাকে বলিলেন—

কোটি নাম যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াই হৈল আসি শেষে॥
"আজি সমাপ্তি হৈবে" হেন জ্ঞান কৈল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্তি করিতে নারিল॥
কালি সমাপ্তি হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥

হরিদাস ঠাকুর মিথ্যাকথা ও প্রবঞ্চনা দোষে দোষী না হইবেন কেন? বস্তুতঃ হরিদাস ঠাকুরের কোনও দোষ নাই, তিনি নিরঙ্কু; তিনি প্রথম দিন ও দ্বিতীয় দিন বলিয়াছেন "নাম পূর্ণ হৈলে করিব যে তোমার মন।" নাম মহিমায় পরম শ্রদ্ধাবান হরিদাস উত্তমরূপে জানিতেন যে, তাঁহার নাম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বেশ্যা আর বেশ্যা থাকিবে না, সে নাম প্রভাবে দেবী হইয়া যাইবে তাহার মনে আর পাপ বাসনা নিশ্চয়ই থাকিবেনা। তৃতীয় দিবসে হরিদাস আরো খোলাখুলি বলিলেন "কালি নিশ্চয়ই ব্রতভঙ্গ হইবে "স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ।" সুদৃঢ় ব্রত নামনিষ্ঠ হরিদাসের নামে অটল বিশ্বাস। দুই দিনেও বেশ্যার মন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তিনিও কিছু বিস্মিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—তৃতীয় দিবসেও যদি নামের কৃপা না হয় তিন দিন নাম শ্রবণেও মহাপাতকীর পাপ তাপ যদি বিদূরিত না হয় তবে আমি বৃথা। আর ঝোলামালা বহিয়া কি করিব; আমিও এই মহাপাতকীর সহিত মিশিয়া অতল রসাতলে ডুবিব। প্রভো, আজ তোমার শ্রীনামের অগ্নি পরীক্ষা।

আমি যদি ডুবিয়া মরি আর তোমার নাম কে লইবে!" ভক্তের পরীক্ষা এই স্থানেই অবসান; ভক্ত প্রপন্ন হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন একণে প্রপন্নশরণ ভগবানের নিজের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ওদিকে ধূমায়িত অগ্নি ক্রমে জ্বলিত, দীপ্ত—সুদীপ্ত আকার ধারণ করিতেছে। হীরার হৃদয়-কাননে দাউ দাউ করিয়া অনুতাপানল জ্বলিতেছে, তাহার পাপ বাসনা ও ভোগলিপ্‌সা সব পুড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। হীরা বিমনা হইয়া গৃহে ফিরিল। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না, গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল; তাহার হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। রামচন্দ্র খাঁর পাইক আসিল, হীরা দেখা করিল না। প্রতিবেশীনীরা কাণাকাণি আরম্ভ করিল "হীরার গতিক্ ভাল নহে, দেখনা উহার চেহারাও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে।" কি জানি কেন হরিদাসের সঙ্গ হীরার মনে মিষ্ট লাগিয়া গিয়াছে। হীরা চক্ষু বুজিয়াও দেখিতেছে "সেই পরম সুন্দর দিব্যমূর্ত্তি হরিদাস শ্রীভগবানে মন বুদ্ধি সংযত করিয়া যেন অবিরাম নাম করিতেছেন।" সন্ধ্যা না হইতেই হীরা আশ্রমের দিকে চলিল; আজ আর বেশ বিন্যাস বিশেষ কিছু রচনা করিল না। কিছু না বলিয়া ভক্তি ভরে পূর্ব্ববৎ শ্রীতুলসীকে ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দ্বার দেশে বসিল, আজ হীরার ভাবান্তর হইয়াছে। তাহার নারকীয় জীবনের নারকীয় চিত্রগুলি একে একে তাহার চক্ষুর সাম্নে আসিতে লাগিল। কত সাধু সজ্জনের সর্ব্বনাশ তাহা দ্বারা যে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, এ হেন পরম পবিত্র অপূর্ব্ব বস্তুটীকেও (দেব চরিত্র বলিলেও তুচ্ছ উপমা হয়) কলঙ্কিত করিতে সে আসিয়াছে। এই সব ভাবিতেই হীরার হৃৎকম্প আরম্ভ হইল; শত বৃশ্চিক দংশনে হীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। হীরার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে; সে ঐ যুবকের চরণ দু'খানি বক্ষে ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে চায় কিন্তু সে যে মহাকলঙ্কিনী, সে কিরূপে ঐ পবিত্র চরণ কমল স্পর্শ করিবে? অন্তর্দাহে হীরার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, হীরা আর মর্ম্মবেদনা চাপিয়া রাখিতে পারিল না; চোখে কাপড় দিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিদাসেরও প্রেমধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে; তাঁহার স্বভাব-করুণ হৃদয় গলিয়া গেল; লজ্জিত হইয়া বলিলেন "নাম পূর্ণ হইয়া আসিল এখনই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।" সেই পাপ বাসনার উল্লেখ শুনিতেই হীরার মর্ম্মে বিষম বাজিল। হীরার অনুতপ্ত

মন যে সে সব ঘৃণিত বাসনা ছাড়িয়াছে। তখন লাজভয় ছাড়িয়া হীরা ব্রহ্মচারীর চরণে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইল, দুষ্ট রামচন্দ্র খাঁর চক্রান্ত সব বলিয়া ফেলিল, মহা আর্ত্তস্বরে কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

"বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার।
কৃপা করি করো মো অধমের নিস্তার॥"

শ্রীনামের পূর্ণ কৃপা হইয়াছে দেখিয়া হরিদাস পরমানন্দিত হইলেন, সোল্লাসে বলিলেন "দুষ্ট রামচন্দ্র খাঁর চক্রান্ত আমি বহু পূর্ব্বেই জানি, সে মূর্খ তাহাকে আর কি বলিব কেবল তোমাকে কৃপা করিবার জন্যই আমি এই তিনদিন এখানে আছি নচেৎ সেই দিনই এস্থান হইতে চলিয়া যাইতাম। জগৎ এক্ষণে হরিনামের মহিমা দেখুক।"

কোন্ শুভ মুহুর্ত্তে কি সূত্রে কাহার ভাগ্য যে প্রসন্ন হইবে তাহা কে বলিতে পারে? পাপিয়সী পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য আসিয়া অজভবাদির দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি মহারত্ন প্রাপ্ত হইল। হীরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল "ঠাকুর পূর্ব্বেই আপনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, এই দাসীকে অঙ্গীকার করিবেন এখন সেই বাক্য রক্ষা করুন—আমাকে উদ্ধার করুন।"

"বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥"

হরিদাস হাসিয়া বলিলেন "তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, শ্রীনাম তোমাকে কৃপা করিয়াছেন। তুমি আর সে পূর্ব্বের নরককুণ্ড নহে, শ্রীনামের অপ্রাকৃত রত্ন বেদী। তোমার পাপলব্ধ ধনাদি সমস্ত ব্রাহ্মণাদিকে দিয়া এই সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া থাক এবং নিষ্ঠা সহকারে—

নিরন্তর নাম লও কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।"

সিদ্ধ পুরুষের সিদ্ধ বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। হরিদাস বলিয়াছেন "নাম সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন।" পাঠক, দেখুন এখন হীরার মন কি চাহে, সে চাহে কৃপা করিয়া তাহাকে শিষ্যা করিয়া যাহাতে ভব ব্যাধি হৈতে মুক্ত হয় তাহাই করুন। হরিদাস তাহাই করিলেন হীরাকে নাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। হীরা, ঠাকুরের চরণ দুখানি জোর করিয়া মাথায় ধরিল ও

অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিল। হীরার একবার মনে হইল বহু ভাগ্যে যে দেবা-রাধ্য বস্তু পাইয়াছে তাহা আর ছাড়িবে না, হরিদাসের সঙ্গেই যাইবে। পরক্ষণেই ভাবিল আমি যে বিষ্ঠাস্তূপ আমার অঙ্গের বাতাসে ঠাকুরের অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আসিবে। আমায় ঠাকুর যাহা দিলেন তাহাই লইয়া থাকিব। সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রীনামের কৃপায় ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখে নিমগ্না হীরা দেখিতে দেখিতে কঠোর ব্রতধারিণী সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী হরিদাসী হইলেন। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

তুলায়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥*

অনেক বেলা হইল, তবু হীরা ফিরিল না দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইল। হীরা যখন গৃহে ফিরিল তখন তাহার আর সে বিলাস মূর্ত্তি নাই ধূলি ধূসরিতাঙ্গ, কেশভার আলুলায়িত, চোখ মুখ ফুলিয়া গিয়াছে, অনুতাপাগ্নিতে জর্জ্জরিত, সুতীব্র বৈরাগ্যের তাড়ণায় তাহার দেহ মন বাউরাপারা হইয়াছে। সহচরি প্রতি-বেশিনীগণ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল ঠিক্ তাহাই হইয়াছে, সাধু মহান্তের সর্ব্ব-নাশ করিতে যাইয়া হীরাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেও হীরা কথা কহে না কেবল কাঁদে। রামচন্দ্র খাঁর লোককে দেখিতেই হীরা ঝাটা লইয়া তাড়াইল, নাপিত ডাকাইয়া সুকুঞ্চিত কেশ দামকে চিরবিদায় করিল। দীন, দুঃখী, ব্রাহ্মণ সজ্জনকে ধনদৌলৎসব লুঠাইয়া দিল। একদণ্ডের মধ্যে বাড়ী ঘর তৈজসপত্র সব বিলাইয়া হীরা গুরুদত্ত "হরিদাসী" নাম ধরিয়া একবস্ত্রা হইয়া পাপ গৃহের বাহির হইয়া পড়িল। সকলে বুঝিল সাধুর শাপে হীরার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মদৈত্যে ভর করিয়াছে, তাহার রূপ যৌবন সব ব্যর্থ হইল।

গ্রাম্যদেবতাকে প্রণাম করিয়া হরিদাসী সটান বনমধ্যস্থ সেই নির্জ্জন আশ্রমে চলিল। উচ্চ কণ্ঠে "হরেকৃষ্ণ" নাম লইতে লইতে সেই সিদ্ধ পীঠস্থিত

* "লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়" কিন্তু নামে সাধু হইলে হইবে না শুদ্ধ সত্ত্ব ভক্ত হওয়া চাই, শ্রীবৃন্দাবনবাসি জনৈক নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বলিয়াছিলেন "ফাঁকা আওয়াজে বাঘ মরেনা বড় জোর একটু সরিয়া বসে কিন্তু মারিতে হইলে গুলিভরা আওয়াজ চাই।"

তুলসীদেবীকে পরিক্রমা করিয়া উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিল। নাম-রসে সিক্ত সিদ্ধ বেদিকার উপরে প্রভুদত্ত নামের মালা লইয়া হরিদাসী জপ করিতে বসিল অন্তর্দাহে তাহার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। প্রপন্ন হইয়া কান্নার সহিত অনবরত নাম করিতেছে "প্রভো আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ? আমাকে কৃপা করো" অব্যক্ত কান্নাধ্বনি শুনিতেই ব্রহ্মদৈত্যের ভয় আরো দৃঢ়ীভূত হইল কেহই উহার ত্রিসীমানায়ও আসিতে সাহস করিল না। যাঁহারা সাধু সজ্জন তাঁহারা ঠাকুর হরিদাসের প্রতি রাজা রামচন্দ্র খাঁর এই অমানুষিক অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া ভগবানকে ডাকিতে ছিলেন তাঁহারা এই অলৌকিক ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। দুই একজন আশ্রমে যাইয়া হরিদাস ঠাকুরের কৃপাস্তত্ত হরিদাসীর অদ্ভুত ভজন ক্রিয়া দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন ও ভক্তিভরে হরিদাসীকে প্রণাম করিয়া কিছু কিছু উপায়ন প্রদান করিলেন। হরিদাসী আত্মগ্লানিতে দগ্ধীভূত হইতেছেন কঠোরতার সহিত ভজন করিতেছেন—

মাথামুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রিদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥

পদ্মের সৌরভ ঢাকা থাকে না দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। নাম মহিমার জ্বলন্ত কীর্ত্তি ও হরিদাস ঠাকুরের কৃপা বৈভব এই হরিদাসীকে দেখিতে দেশ দেশান্তরের বৈষ্ণবগণ আসিতে লাগিলেন।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥

সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় অবিলম্বে হরিদাসীর অনর্থ নিবৃত্তি হইল এবং প্রেমের অভ্যুদয় হইল। কিছুকাল ঐ আশ্রমে বাস করিয়া হরিদাসী শ্রীগুরু-দেবের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে ৺পুরীধামে গমন করেন সেই স্থানেই তাঁহার প্রাপ্তি হয় বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

আগমনিগম পুরাণ ইতিহাসে এরূপ ঐন্দ্রজালিক ঘটনা আর কখনও হয় নাই। কলিযুগে যে হরিনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন এবং তাহার ক্রিয়া যে অত্যদ্ভুত চমৎকারকারিণী তাহাই এখানে অভিনয় হইল।

হরিদাসঠাকুর সেইদিন যদি স্থান ছাড়িয়া যাইতেন তবে দুষ্টগণ তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপ করিতে ছাড়িতনা, হীরাও দুটা মিছা কথা বলিয়া নিজের পশার প্রতিপত্তি বাড়াইতে ছাড়িতনা। হীরাকে কৃপা করিয়া যদি হরিদাসীতে পরিণত না করিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে হরিদাসের নিস্তার ছিলনা নানারূপ মিথ্যা ঘটনা প্রচারিত হইত। তিন দিন ধরিয়া এই অভিনয় হওয়ায় প্রাকৃত কামদেব যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। শাস্ত্রবাক্য আজ বর্ণে বর্ণে সত্যপ্রমাণিত হওয়ায় বিস্মিত জগবাসী প্রেমকণ্ঠে গাহিল "জয়তি জগম্মঙ্গলং হরের্নাম।" জয় নামের জয়, জয় হরিদাস ঠাকুরের জয়।

সুখ ও সৌন্দর্য্য।

লেখক—প্রভুপাদ শ্রীল নিত্যানন্দ গোস্বামী।

আজ জীবনের মধ্যস্থলে আসিয়া চাহিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়া—তা' সে অবকাশ বোধ হয়, দুঃখ কষ্ট ব'লে যাহাকে সাধারণতঃ সংসারের লোকে বলে তাহাই—দেখিতেছি, এতদিন পর্য্যন্ত যে একটি অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড়ে দৌড়ে আসিয়াছি, সেটি কিসের জন্য? আজ বুঝিবার বেশ সুযোগ পাইয়া বুঝিতেছি সেটি, অর্থাৎ সেই জীবন-ক্ষেত্রের উপর দৌড়ের সূত্রপাতটি, প্রথম আরম্ভ হয়, সুখ তৃষ্ণা এবং সুন্দর কিছু একটিকে আপনার মধ্যে টানিয়া আনিয়া আপনার করার বলবতী বাসনা থেকে।

ভাবিয়া লইতে হইবে, জন্মাইবার পর হইতেই ইহার বিকাশ; কিম্বা হয়'ত পূর্ব্বের একটি জানা জ্ঞান বা সংস্কার বা অতৃপ্ত আকাঙ্খার জের চলিতেছিল; তাহারই গ্রন্থি বাঁধিয়া নূতন করিয়া ইহা নূতন ভাবের আরম্ভ।

দেখি ক্ষুদ্র শিশু মা'র মুখখানির দিকে চায়, আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে। তার সেই কারণে অকারণে হাসি কেন? মা'র মুখে সে কি সৌন্দর্য্য দ্যাখে? সে কোন্ জিনিষটি পাইবার জন্য, কোন্ তৃপ্তির অন্বেষণে বিফল প্রয়াস-লক্ষে কাঁদে? তা'র ভিতরের কি একটি অভাব—(যেটিকে, আমরা আত্মতৃপ্তির তৃষ্ণা বলিতেছি, সেইটি) যখন মাতৃস্তন পানে তৃপ্ত হয় সে ক্ষণকালের জন্য শান্তভাবে ঘুমায়। তারপর আবার জাগে, আবার কাঁদে। এইভাবের প্রসঙ্গেই মনে পড়ে একদিন একটি লাল রংয়ের খেলনা পাইতে কত ব্যগ্র হ'য়ে হাত বাড়াইয়াছি; মনে পড়ে আত্ম-সুখ-তৃষ্ণা-শান্তির বৃথা চেষ্টায় কত আগ্রহে কোনও মিষ্ট পদার্থের স্বাদ লইতে ছুটিয়াছি। কিন্তু যে সৌন্দর্য্য ও যে সুখের জন্য ভিতরের জিনিষটি আমাদিগকে ক্রমাগত তাড়া দিয়াছে ও দিতেছে, এবং যা'র তাড়নায়, ভ্রমে ব্যাকুল হ'য়ে কত বস্তু হইতে বস্তুর উপর লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি; কই সে জিনিষটির সন্ধান ত' পাওয়া যাইতেছে না?

সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, বলিলে, বোধ হয় আংশিক ভুল হয়, কেন না সন্ধান,—সে জিনিষটির পাইলেও তার একটি মূল বা স্থূল নামাভিষেক করিলেও, সেইটির, সাধনার পূর্ণে যাইতে হইলে যাহা করিবার বা যাহা হইবার দরকার আছে; এই জীবনের প্রৌঢ়-বৃদ্ধের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাই পাইতেছি না। তবে এই দীর্ঘ দৌড় দৌড়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের চাই সুখ—চাই সুন্দর।

সুতরাং জিনিষটির সন্ধান কিছু পাইয়াছি বা পাইবার বিষয়টির সন্ধান কিছু পাইয়াছি এ কথা বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না।

"A thing of beauty and joy for ever" কথাটি আর এক দেশের আর এক তৃষ্ণাতুর বলিয়া গিয়াছেন—সে ব্যক্তিও এই joy for ever প্রাপ্তির আশায় হয়ত কত রাস্তা, কত কাঁটা বেড়া, কত কাদা ধুলা মাখিয়া মূলে বুঝি কাঁটার যন্ত্রণায় বা কাদা ধূলায় মলিন হইয়াই শেষকালে জানিয়াছে joy for ever কোথায় এবং কিসে পাওয়া যায়। আমাদের যে দৌড়, যে আকাঙ্খা, যে তৃষ্ণা সামনে ত' তার হয় নাই, এই জন্য বলিতেছি যে ইহাতে বুঝিতে বা শিখিতে প্রস্তুত করিয়াছে, আমার চাই সুখ, চাই সুন্দর কিছু।

সে এমন একটি সুখ ও এমন একটি সুন্দর যাঁহার নাগাল পাইলে যাঁহাকে আপনার ব'লে মনে গ্রহণ করিতে পারিলে তারপর আর দৌড়ের বাকি থাকে না।

বুঝিবার এই অবকাশ টুকু পাইয়াও ধন্য হইতেছি। কেন না প্রথমে দেখিবা মাত্রই, শুনিবা মাত্রই, বুঝিয়া বা না বুঝিয়া মাত্রই যে সকল সাফল্যের, যে সকল বৃথা সুখ-সৌন্দর্য্য প্রাপ্তির জন্য এলো মেলো হাওয়ায়, ছিন্ন তৃণের ন্যায় ক্রমশঃ এদিক ওদিক ছুটিতে আকাঙ্খার স্বজন করিত বা ছুটিত; আজ সেই অনেকগুলি ছুটের হাত থেকে পরিত্রাণ হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিবার সুযোগ হ'য়েছে এ-নহে—ও-নহে।

সেইজন্যই বলিতেছি, এ সুযোগ ধন্য! এ সুযোগে আমি ধন্য। জীবন-ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উভয় দিক দেখিতেছি। যদিও ক্লান্ত, যদিও অবসন্ন, তথাপি দুইচারি মুহুর্ত্তের জন্য শ্রম-ক্লিষ্ট-অবসন্ন পদে ভর দিয়া দেখিতেছি,—ঐ যে সকল পিছনের ঝোপ জঙ্গল ওগুলির প্রতি কষ্ট, প্রতি কণ্টক, প্রতি মলিনতা, আমাকে সুখ ও সৌন্দর্য্য প্রদান করিবে বলিয়া কত ভ্রান্ত করিয়াছিল। আর ঐ সম্মুখের ধু-ধু মাঠ, যত দূর দৃষ্টি ততদূর পর্য্যন্তব্যাপী প্রশর ক্ষেত্র, আর তা'র শেষের ঐ জ্যোতি যাহা সৌন্দর্য্য মহিমার মহামহিমাবতি, যাহা কি এক বিমল-শান্তিময়, জ্যোৎস্না রজনীর বিশ্রাম সুখ সূচনা করিতেছে তাহাই দেখিতেছি।

দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, পিছনের দিকের যে দৌড়গুলি, তাহা যদি সরলভাবে যথা বিধানে নিযুক্ত হইত তাহা হইলে হয়ত সামনের ঐদিকে বহু পূর্ব্বেই পৌঁছাইতে পারা যাইত।

হয় নাই। কিন্তু যে'টি বুঝিবার সুযোগ আনিয়াছে সেই জিনিষটি বেশ জোর করিয়া আমাকে বুঝাইতেছে—আমার যাহা চাই, যাহা জন্মজন্মান্তর হইতে ঈপ্সিত, তাহাই পূর্ণ সুখ—পূর্ণ সৌন্দর্য্য।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী।

(লেখক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।)

—:০:—

তখন প্রভাত হইয়াছে। নদীয়ার গঙ্গার ঘাটে অগণ্য নরনারী স্নান করিতে আসিতেছে। ঘাট প্রায় পরিপূর্ণ। গঙ্গাতীরে বসিয়া একটি বালিকা বিল্বপত্র ও ফুলদল দিয়া শিবপূজা করিতেছিল। পাঠক! আপনি অনেক রূপবতী বালিকা দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু সে সমস্ত রূপের সহিত এ বালিকার তুলনা করিবেন না। আপনি চিত্রকর-তুলিকা-প্রসূত অনেক দেবী প্রতিমা দেখিয়াছেন কিন্তু এ প্রতিমা সজীব। নবোদিত সূর্য্যের নবীন আলোক বালিকার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই নবীনালোক উদ্ভাসিতা বালিকা তড়িৎ প্রতিমার ন্যায়ই প্রতীয়মান হইতেছিল।

বালিকা স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে শিবপূজা করিতেছে। ভক্তির জ্যোতিতে তাহার বদন মণ্ডল এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। এমন সময় একটি দুরন্ত বালক আসিয়া বালিকার পূজার বড়ই বাধা দিল। বালক বলিল—"বালিকা তুমি কি মাটীর শিবপূজা করিতেছ? আমিই সেই শিবঠাকুর, তোমার জন্য আসিয়াছি, পূজা কর। আমাকে পূজা করিলে সুন্দর বরের সহিত তোমার বিবাহ হইবে।" বালিকা চপল বালকের বাক্যে বড়ই লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া আরক্ত মুখে বসিয়া রহিল।

এই দুরন্তপণা বালকটী সকলের নিকট পরিচিত ছিল। এই কৌতুক-দৃশ্যে কেহবা আনন্দিত হইল আবার কেহবা বালিকাকে বিব্রত দেখিয়া বালককে চোখ্ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইল। বালক কিন্তু ইহাতে আদৌ ভয় পাইল না।

এদিকে বালিকাটী বালকের এই চঞ্চলতায় কিছুমাত্র বিরক্ত হয় নাই। বরঞ্চ কি এক অভিনব আনন্দাবেশে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এতক্ষণ আপনারা বোধ হয় এই বালক বালিকা দু'টীকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন। বালিকাটী আমাদের লক্ষ্মীদেবী—তাঁহার পিতা বল্লভাচার্য্য বড়ই ভক্তি-মান ও সরল ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বালকটীর নাম নিমাইচাঁদ—তাহার মাতা শচীদেবীর অনেকগুলি ছেলে মেয়ে হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার একটী ছেলে ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই নিমাইচাঁদ তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। বড় আদরের ছেলে—প্রাণ ধরিয়া তিনি তাহাকে কিছুই বলিতে পারিতেন না। বালকটী সকলের নিকটেই চঞ্চলতা প্রকাশ করিত, কিন্তু কেহ তাহার চাঞ্চল্যে কিছুমাত্র বিরক্ত হইতনা বালকটী কাছে আসিলে কি জানি কেন সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। বালকের রংটী কাঁচা সোনার মত আর আকৃতি তাহার সমবয়স্ক অন্যান্য বালকদিগের অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। সকলেই দেখিত ঠিক যেন একটী দেববালক বিচরণ করিতেছে।

তাহার পর কিছুদিন অতীত হইয়াছে। নিমাইচাঁদ এক্ষণে ষোড়শ বর্ষীয় যুবক। বালিকা লক্ষ্মী দশম বর্ষীয়া বালিকা। নিমাই যুবক বটে কিন্তু আচরণ তাহার বালকের মত। নিমাই এখনও মাঝে মাঝে গঙ্গার ঘাটে বালিকাকে ত্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। বালিকার সেই একই ভাব। নিমাইকে দেখিলে সে পুলকিত হয় আর অনিত বদনখানি উন্নত করিয়া এক একবার সে সেই গৌরবর্ণ যুবকটীর চঞ্চল মুখখানির প্রতি তাকাইয়া লয়। চারি চক্ষু মিলিত হইলে চঞ্চল নিমাই হাসিয়া উঠেন আর আরক্ত মুখী বালিকা মাথাটী হেঁট করেন। সে দৃশ্য বড়ই মধুর!

বনমালী আচার্য্য নিমাইর প্রতিবাসী। তিনি একদিন এ দৃশ্য দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার মনে একটী সাধ হইল। ভাবিলেন এই দুইটীর যদি মিলন করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে বড়ই মধুর হয়। তিনি নিমাইকে বড়ই ভাল বাসিতেন। নিমাইর মাতার নিকট তিনি মধ্যে মধ্যে যাইতেন। তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন।

একদিন তিনি শচীদেবীকে বলিলেন,—"মা! আমি একটী সুলক্ষণা রূপবতী বালিকার সন্ধান পাইয়াছি। তাহার নাম লক্ষ্মী, সে রূপে গুণেও লক্ষ্মী। আপনি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন।" বলা বাহুল্য লক্ষ্মীর পিতার গৃহ হইতে শচীদেবীর গৃহ বেশী দূরে ছিলনা।

মা বলিলেন—নিমাইর আমার এই অল্প বয়স। ইহার মধ্যেই সে পিতৃহীন হইয়াছে, সে মন দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করুক তাহার পর বিবাহ দিলেই চলিবে।

আচার্য্যের বড়ই সাধ হইয়াছিল যে বালিকাটীর সহিত নিমাইর বিবাহ দেন। শচীমাতার যে অমত হইবে তাহা তিনি একবারও ভাবেন নাই। কি করিবেন বড়ই মন কষ্টে ফিরিয়া গেলেন।

পুঁথি হস্তে নিমাই গুরুর নিকট হইতে গৃহে ফিরিতে ছিলেন। পথে আচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বনমালী এতক্ষণ বড় কষ্টে আসিতে ছিলেন। নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার মুখখানি প্রফুল্ল হইল। তিনি তাঁহার নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

নিমাই বাড়ীতে আসিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা! তুমি পণ্ডিতকে ফিরাইয়া দিয়াছ তাহাতে তিনি বড়ই দুঃখ পাইয়াছেন।" বাড়ীতে আর কেহ ছিলনা, মা আর ছেলে, সুতরাং নিমাইর যাহা কিছু বলিবার তাহা তাঁহার মাকে ছাড়া আর কাহাকে বলিবেন? নিমাইর কথা শুনিয়া তাঁহার মা বুঝিলেন, তাহার ছেলেটীর বিবাহের সাধ হইয়াছে। তিনি একটু ভীত হইলেন ও ভাবিলেন আচার্য্যকে ফিরাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। ঠিক এই বয়সে যে তাহার আর একটী ছেলে বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাও তাঁহার মনে হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বনমালী আচার্য্যকে ডাকাইয়া বলিলেন। "বাপ! তোমরা যাহা স্থির করিয়াছ তাহাতে আমার অমত নাই। আমার নিমাইচাঁদের বিবাহ দিয়া দাও। আমি বউ লইয়া সুখে ঘর করি।" আচার্য্যের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। তিনি বড়ই আনন্দে লক্ষ্মদেবীর পিতা বল্লভাচার্য্যের নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।

বল্লভাচার্য্য এই সংবাদ শুনিয়া যে কত দূর আনন্দিত হইলেন তাহা আর কি বলিব। এক কথায় তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে হাতে পাইলেন। কেন এত সন্তুষ্ট হইলেন তাহাও খুলিয়া বলিতেছি।

এই দুরন্ত বালক নিমাইচাঁদ শুধু যে দুরন্তপনায় বিখ্যাত ছিলেন তাহা নহে; পাণ্ডিত্যও তাঁহার অসাধারণ ছিল। এই বয়সেই তিনি নবদ্বীপের মত স্থানে পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। নূতন করিয়া একখানি ব্যাকরণও লিখিতেছেন। (পরে তাহা সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল।) সুতরাং এ হেন রূপ গুণ যুক্ত নিমাইচাঁদকে কন্যাদান করিতে পারিবেন ভাবিয়া বল্লভাচার্য্য যে নিজকে ভাগ্যবান ভাবিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

তখন উভয় পক্ষ হইতেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। শচীমাতার বড় আনন্দ যে তাহার বড় সাধের ধন নিমাইচাঁদ সংসারি হইবে। নিমাইর বউ আসিয়া তাঁহার আঁধার ঘরখানি আলো করিয়া বেড়াইবে। শচীদেবী মনে মনে ভাবিলেন ভগবান কি আমার মত হতভাগিনীর কপালে এত সুখ সৌভাগ্য লিখিয়াছেন ?

এই নিমাইচাঁদটী নদীয়াবাসীগণের নয়নমণির মত ভালবাসার জিনিস ছিল। তাহাদের সেই নিমাইয়ের বিবাহে তাহারা সকলেই আপন আপন সাধ্য মত দ্রব্যাদি শচীমার গৃহে প্রেরণ করিয়া এ বিবাহে সাহায্য করিল। নিমাই যদিও ষোড়শবর্ষীয় যুবক ব্যবহারে কিন্তু সে বালকমাত্র। সুতরাং তাহার বিবাহটী যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সকলেই সে বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হইলেন।

ক্রমশঃ বিবাহের দিন স্থির হইল। শচীমার প্রতিবাসী শ্রীবাসপণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রী মালিনী, সস্ত্রীক মুরারি গুপ্ত, নিমাইয়ের মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি শচীর আঙ্গিনায় সমবেত হইলেন। ওদিকে শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত আচার্য্য ও তাঁহার স্ত্রী সীতাদেবী এই শুভ বিবাহের শুভ সংবাদ পাইয়া বহু দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন; তখন চারিদিকে কেবল আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। তখনকার নদীয়ায় এখনকার কলিকাতার ন্যায় অগণিত নরনারী বাস করিত। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের নিমাইকে বড় ভালবাসিতেন না বলিয়া কেহই বড় একটা রিক্ত হস্তে আসিলেন না। সুতরাং কত লোক আসিলেন—কত দ্রব্য আসিল—কত আনন্দ হইল আমরা তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আজ শুভদিনে শুভক্ষণে নদীয়াবাসীর প্রিয়পাত্র নিমাইচাঁদ সুন্দর বরবেশে সজ্জিত হইয়া বল্লভাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন।

ওদিকে কন্যাপক্ষীয়দিগের মধ্যেও সেইরূপ আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নিমাই রূপে গুণে অতুলনীয়, কেমন সোণারচাঁদ জামাই হইল—বল্লভাচার্য্য ও তাহার গৃহিণীর ইহা ভাবিয়া আনন্দের আর সীমা রহিল না। আর সেই দশম বর্ষীয়া লাজুক বালিকাটী—তাহারও আজ বড় আনন্দ। চঞ্চল নিমাই গঙ্গার ঘাটে নদীয়ার পথে যখনই তাহাকে শিব পূজা করিতে বা খেলা

করিতে দেখিয়াছে তখনই তাহাকে খেপাইতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু বালিকা বিরক্তির পরিবর্ত্তে তাহাকে ভালবাসিয়াছে। সেই অভিনব কণককান্তি নিমাই আজ তাহারই বর হইয়া আসিতেছেন, তাহার উপর অতি নিকটেই তাহার বিবাহ হইতেছে। বাপ মাকে ছাড়িয়া বেশী দূরে তাহাকে যাইতে হইবে না—এ সমস্ত ভাবিয়া বালিকা লক্ষ্মী দেবীও আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন।

শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। যেমনি বর তেমনি ক'নে। কে ভাল কে মন্দ বলিবার যো নাই। সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। এমন মিলন ত দেখা যায় না—সকলের মুখেই ঐ এক কথা 'দুটীতে দীর্ঘজীবী হউক।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।(২)

—:•:—

স্বরূপ নির্ণয় গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট অবস্থান করেন তখন বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থ রচনার জন্য অনুমতি দেন। তিনিও সেই অনুমত্যানুসারে উক্ত গোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রভুর বিশেষ নিষেধাজ্ঞায় উহার রচনা বন্ধ করিতে হয়। ইহার কিছুদিন পরেই শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট সংবাদ শুনিতে পান; যথা—

"একদিন আজ্ঞা কৈল যত মহাশয়।
বর্ণহ গোবিন্দ-লীলামৃত রসময়॥

এমন দয়াল নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
রাধাকৃষ্ণ নামজানি যাঁহার স্মরণে॥

অবশেষে সেই গ্রন্থ করিতে লিখন।
প্রভুর নিষেধ হৈল না কৈনু লিখন॥

আমার অভাগ্য কথা শুন সর্ব্বজন।
পুনর্য্যোগ নাহি কহিতে কারণ॥

সভে মিলি একদিন বসিয়ে নির্জ্জনে।
গৌরলীলা অপ্রকট শুনিলাম কাণে॥ (স্বরূপ নির্ণয়।)

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত রচনা আরম্ভ করেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল (শ্রীচৈতন্যভাগবত) সর্ব্বদা পাঠ করিতেন, উহাতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ লীলা বিস্তারিত বর্ণন না থাকায় উহা শুনিবার জন্য আগ্রহ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার ঐ অংশ বিশদরূপে বর্ণন করিতে আদেশ করেন, কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ও শ্রীশ্রীমদন গোপাল জীউর আদেশ মাল্য পাইয়া শ্রীবৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে মূল করিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে ;—

আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাইয়া চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপাল গেনু আজ্ঞা মাগিবারে॥
দরশন করি কৈনু চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারি করেন চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরগণ হরিধ্বনি কৈল।
গোসাঞিদাস আনি মোর গলে মালা দিল॥
আজ্ঞামালা পায়্যা আমার হইল আনন্দ।
তাঁহাঞি করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়॥

কুলাধি দৈবত মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনে অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুই বিষয় লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞা ব'লে করি এতেক সাহস॥

যখন কবিরাজ গোস্বামী এই চরিতামৃতগ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন এখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা কেমন ছিল, সে বিষয়ও শ্রীচরিতামৃতে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন যথা:—

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ ও বধির।
হস্ত হাল মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানারোগ গ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্র দিনে মরি॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যচরিত যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন উহা যে স্বরূপ ও রূপ এবং রঘুনাথ গোস্বামীর অভিপ্রায় মত তাহা বলিতেছেন;—

"স্বরূপ গোঁসাইর মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।"

স্বরূপনির্ণয়গ্রন্থে মঞ্জরীগণের স্বরূপ বর্ণনস্থলে দেখা যায় ইনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীকোস্তরীমঞ্জরী ছিলেন, অপরাপর মঞ্জরীগণের বর্ণনা করিয়া আত্মপরিচয় স্থলে বলিতেছেন;—

"ইহা সভার সঙ্গে আর হয় এক দাসী।
তাহার কহিব নাম পশ্চাতে প্রকাশি॥

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনবাসকালে এই মহাগ্রন্থের সূচনা করেন এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামেই ইহা সমাপ্ত করেন।

শ্রীচরিতামৃতের শেষ ভাগে লিখিত আছে :—

শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অর্থাৎ ১৫৩৭ শকের শত সাঁইত্রিশ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।*

১৫০০ শকে কৃষ্ণদাসের জন্ম বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন তাঁহারা উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝিতে পারেন যে, যদি ১৫০০ শকে জন্ম হয় আর ১৫৩৪ অথবা ৩৭ শকে গ্রন্থ শেষ হয়, তবে গ্রন্থকার ৩৪ বা ৩৭ বৎসর বয়সে নিজেকে বৃদ্ধ, জরাতুর, অন্ধ, বধির প্রভৃতি বলিয়া আখ্যাত করিবেন কেন? সুতরাং আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত ১৪৪০ শকে জন্মই সমীচিন বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক আমরা প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম যাহা হয় স্থির সিদ্ধান্ত পাঠকগণই করিয়া লইবেন।

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ যখন রচনা হয় সে সময় এই নিয়ম ছিল যে, শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক সাক্ষরিত না হইলে কোন গ্রন্থেরই প্রচার হইত না, প্রচার হইলে ও উহা সকলে সুসিদ্ধান্ত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। কাজেই কবিরাজ গোস্বামীও গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া জীব গোস্বামীর নিকট সংশোধন ও সাক্ষর করিতে পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে যে, জীব গোস্বামী উক্ত গ্রন্থ পাইয়া সময়ান্তরে দেখিবেন বলিয়া অন্যান্য গ্রন্থের নীচে উহা রাখিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে বিদায় দেন। কিন্তু পরদিন গ্রন্থাগারে যাইয়া জীব গোস্বামী দেখেন যে, শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ যাহা তিনি সমস্ত গ্রন্থের নীচে রাখিয়াছিলেন তাহা সকল গ্রন্থের উপরিস্থলে রহিয়াছে। তদ্দর্শনে জীব গোস্বামী সমধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গ্রন্থ খানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন উহার প্রতি পরিচ্ছেদেই অতি সুন্দররূপে প্রভুর লীলা কাহিনী নানাপ্রকার সুসিদ্ধান্তে দ্বারা বর্ণিত রহিয়াছে। পরন্তু কোন রূপ অশাস্ত্রীয় ভাব বা অন্য কোন প্রকার দোষই নাই।

---

*প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন:—"জ্যোতিষ শাস্ত্রে 'সিন্ধু' শব্দের অর্থ প্রায়শঃ ৪ চারি সংখ্যাই হইতে দেখা যায়," তাহা হইলে ১৫৩৭ না হইয়া ১৫৩৪ হইয়া পড়ে।

জীব গোস্বামী কৃষ্ণদাসের এরূপ কবিত্ব ও ভাবুকতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পরদিন যখন শ্রীবৃন্দাবনের মহাত্মগণ সমভিব্যাহারে ভক্তিপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছেন এমন সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

অন্যান্য নানাপ্রকার কথোপকথন হইতে হইতে কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা উত্থাপিত হইলে জীব গোস্বামী কৃষ্ণদাসের প্রতি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন;—"কৃষ্ণদাস! তুমি নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার জন্য নানা গ্রন্থ হইতে কতকগুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া নিজ গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিয়াছ, ইহাতে ভাবুক ভক্তগণ তোমার প্রশংসা করিতে পারেন এবং তোমার গ্রন্থকে আদর করিতে পারেন কিন্তু প্রভু কি ইহাতে পরিতুষ্ট হইবেন? তুমি বৃদ্ধ হইয়া এই ভাষাগ্রন্থের জন্য যেরূপ শ্রম ও যে সময়ক্ষেপ করিয়াছ তাহাতে তোমার শ্রম ও সময়ের সার্থকতা হয় নাই এই জন্য এ গ্রন্থ যমুনার জলে ত্যাগ করা উচিত।" এই বলিয়া বৈষ্ণবগণ সমক্ষে জীব গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থখানি যমুনার অগাধ জলে নিক্ষেপ করিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া কি জানি কি অপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া বিশেষ আপেক্ষ করিতে লাগিলেন। এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, যদি তোমার এরূপ ইচ্ছাই ছিল তাহা হইলে আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে কেন এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বোধিত করিলে, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক কিন্তু আর কি তোমার লীলা বর্ণনার সামর্থ আমি পাইব?"

ক্রমশঃ।

বাণী-আবাহন।

—:০:—

অয়ি ভকত-মানস-রঞ্জিনি!
অয়ি শ্বেত-সরোজ-বাসিনি
(মাগো) বাণী-বাগ্বাদিনি!

(মা!) তোমারি কৃপায় মোহ-তিমির নাশে,
তোমারি কৃপায় জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশে,
তোমারি কৃপায় ত্রিতাপ দূরে পলায়,
(মাগো) বিষ্ণু-বক্ষ-বিলাসিনি!

(মা!) তোমারি পদ সেবি বাল্মীকি অমর,
বেদব্যাস, কালিদাস, তোমারি কিঙ্কর,
তব কৃপায় বহাইল সুধার নির্ঝর;
(মাগো) বীণা-পুস্তক-ধারিণি!

অজ্ঞ মোরা নাহি জানি সেবন পূজন;
নিজগুণে করে' মাগো কৃপা বিতরণ—
হৃদাকাশে জ্বাল জ্ঞান-প্রদীপ রতন;
(মাগো) অজ্ঞানে জ্ঞান-দায়িনি!

শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী, বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।(৩)

কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! জীব গোস্বামী গ্রন্থখানি যমুনার জলে নিক্ষেপ করিলে ভক্তগণ যমুনার দিকে চাহিয়া আছেন--দেখিলেন, যে গ্রন্থখানি জীব গোস্বামী ফেলিয়াছেন উহা যমুনার জলে নিমজ্জিত না হইয়া বা স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া না যাইয়া যমুনার উজান দিকেই ভাসিয়া চলিল এবং ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর ঘাটে আসিয়া সংলগ্ন হইল। কবিরাজের আর আনন্দ ধরে না। ভাবিলেন, জনসমাজে প্রচার না-ই হউক তাহাতে ক্ষতি কি, আমার জীবনের শেষ কীর্ত্তি বুকে করিয়া মরিব। এই ভাবিয়া যেমন ব্যস্তসহকারে গ্রন্থ তুলিতে গেলেন অমনি জীবগোস্বামী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"কবিরাজ! তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, এ গ্রন্থ কখনও নষ্ট হইবার নয়, উহা নিত্য, কোন ভাবেই উহার বিনাশ নাই। অচিরেই তোমার গ্রন্থ জগতে সকলের নিকট পূজিত হইবে এ গ্রন্থ প্রভুর ভূষণ, উহাতে আর আমার স্বাক্ষর করিবার প্রয়োজন নাই প্রভু নিজেই উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।" এই বলিয়া কবিরজাকে প্রশংসা করিতে করিতে নিজেই গ্রন্থ তুলিয়া মস্তকে করিয়া নিজের গ্রন্থালয়ে আনয়নপূর্ব্বক সকল গ্রন্থের উপরে স্থাপন করিলেন।

পাঠকগণ! আমরা আর এ গ্রন্থের কথা ভাষায় কি জানাইব। উপরে যে ঘটনা—যে সুখ্যাতি পরিলেন উহার পরে আর যে প্রশংসার কোন ভাষা আছে তাহাতো আমরা জানি না।

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থকে অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালা পয়ারে গ্রন্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার স্থানে স্থানে সহজ কথায় এমন জটীল তত্ত্ব মিমাংসা হইয়াছে যে, অনেকেই আদৌ তাহার তত্ত্ব বোধগম্য করিতে পারেন না।

সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের সঙ্গে মহাপ্রভুর কথোপকথন এবং অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে ও রায় রামানন্দের সঙ্গে যে সকল তত্ত্ব কথার আলোচনা হইয়াছে, কবিরাজ

গোস্বামী যে ভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণযুক্তি দ্বারা বাঙ্গালা পয়ারে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা যথার্থই ভাবিবার, বুঝিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করেন এ পয়ারের ভাব বুঝিতে তাঁহাদের অনেকের মাথাই ঘুরিয়া যায়। কিরূপ দার্শনিক ও কিরূপ ভাবুকতার সহিত গ্রন্থখানি রচিত তাহা পণ্ডিতগণ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

তারপর কবিরাজ গোস্বামী অতি অল্প কথায় বিস্তৃত বিষয়ের যেরূপ সমীচীন মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্য মাত্র একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। নিম্নলিখিত দ্বাদশ পংক্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমগ্র লীলা কি মধুরভাবে বর্ণন করিয়াছেন দেখুন ঃ—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈল অন্তর্ধান॥

চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস॥

চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন॥

অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাল সকলে॥"

কবিরাজ গোস্বামী যেমন দার্শনিক ও ভাবুক কবি ছিলেন তেমন ঐতিহাসিক বিষয়েও বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন অনেক ঘটনা তিনি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যাহা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আমরা সামান্য একটুমাত্র দেখাইব। বেশ অনুধাবন করিয়া শ্রীচরিতামৃত আলোচনা করিলে বহু প্রমাণ পরিলক্ষিত হইতে পারে।

ষ্টুয়ার্ড সাহেব বাঙ্গলার পুরাতন ইতিহাস লেখক বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় পাওয়া যায় যাহা তিনিও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কবিরাজ গোস্বামী একজন সূক্ষ্মদর্শী অতিশয় সাবধান লেখক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়ে অধিকারী।
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাহার চাকুরী॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসিব কৈল।
ছিদ্র পাইয়া রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন সাহা গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়ের তিঁহো বহু বাড়াইল॥

এই যে সুবুদ্ধি রায়ের কথা উল্লেখ আছে অন্য কোন ইতিহাসে ইহার নাম পাওয়া যায় না।

গৌড়দেশে ভক্তি-গ্রন্থের প্রচার জন্য জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের নিকট সমস্ত গ্রন্থ প্রদান করিলে আচার্য্য প্রভুর নিকট হইতে বিষ্ণুপুর রাজধানীর নিকটে গোপালপুরে দস্যুকর্ত্তৃক সমুদায় গ্রন্থ অপহৃত হইয়া রাজা বীরহাম্বিরের ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়, তথা হইতেই ক্রমে ঐ সমস্ত গ্রন্থের সহিত শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ ভক্তগণ প্রাপ্ত হয়েন।

কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন অবস্থানকালে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু সমস্ত গ্রন্থ এখনও জনসমাজে প্রকাশ হয় নাই। অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ এখনও অনেকের নিকট পাওয়া যাইতে পারে। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আর কিছু দিন পরে বোধ হয় তাহার চিহ্নও পাওয়া যাইবে না।

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ রচনার পর কবিরাজ গোস্বামী আর কতদিন প্রকট ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড তীরে আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে তিনি অপ্রকট হয়েন। ঐ স্থানে তাঁহার সমাজ এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

ঝামটপুর গ্রামে আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে প্রতি বৎসরই কবিরাজ গোস্বামীর একটী বিরহ স্মরণ মেলা হয়। তথায় তাঁহার শ্রীপাঠের আদিদেব

শ্রীশ্রী৺গিরিধারীজীউ বর্ত্তমান। তাঁহার তিরোভাবের পর ভক্তগণ তাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা (খড়ম) সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপিও উহা ভক্তি সহকারে পূজিত হইয়া আসিতেছে। বহু ভক্তযাত্রী উহার দর্শনার্থে শ্রীপাট ঝামটপুরে গমন করিয়া থাকেন।

আমরা যতদূর জানি ও যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি প্রকাশ করিলাম, এতদতিরিক্ত কোনও কিছু কেহ অবগত থাকিলে জানাইবেন, আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী।

(লেখক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।)

(২)

এদিকে মিশ্র-ভবনও আনন্দে পূর্ণিত হইয়াছে। শচীর আনন্দের কথাও বুঝিতেই পারিতেছেন। সুসজ্জিত বরবধূ যখন দোলায় চাপিয়া তাঁহার গৃহ-দ্বারে আসিয়া থামিল তখন শচীদেবী আর থাকিতে পারিলেন না। আপনি ছুটিয়া গিয়া দোলা হইতে বউটীকে নামাইলেন। বালিকাকে কোলে করিয়া এবং তাহার ঢল ঢল কচি মুখখানি দেখিয়া মাতৃস্নেহে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পুনঃ পুনঃ তিনি তাঁহার নিমাইর বউএর কচি মুখখানি চুম্বন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে বাদ্য বাজিতেছে—আনন্দধ্বনি হইতেছে আর তাহার মধ্যে শচীদেবী তাঁহার নিমাইচাঁদের বউটীকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। বাড়ীর মধ্যে এবং বাহিরে এত লোক সমবেত হইয়াছিল যে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শচীদেবীর আশীর্ব্বাদ করা হইলে অন্যান্য আত্মীয়েরা সকলেই ধান্য দূর্ব্বা দিয়া 'চিরজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, নারায়ণ, যিনি গোলকে থাকেন, তিনিই পৃথিবীর লোককে ভক্তি-ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য নিমাই হইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। প্রকৃতই নিমাইচাঁদের অন্তঃকরণটী একেবারে দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি

জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তাহাদিগকে হরিনাম শিখাইবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এই সময়ে যে তাঁহাকে দেখিয়াছিল সেই তাঁহার ভক্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে হরিনাম করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। সে সব অনেক পরের কথা, সুতরাং আমরা যাহা বলিতেছিলাম তাহাই এখন বলি।

নিমাইর ভক্তদের মধ্যে একজন তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে কেমন একটা সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন দেখুন—

শোভাময় শচীর অঙ্গনে।
চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে॥
আজু কি আনন্দ পরকাশ।
শুভক্ষণে নিমাইচাঁদের অধিবাস॥ ধ্রু॥
গন্ধ মাল্য দেই আপ্তগণে।
দিশা আলোকরে গোরা অঙ্গের কিরণে॥
সভামধ্যে গোরা দ্বিজমণি।
বিলাসয়ে কত না অর্ব্বুদ কাম জিনি॥
বারেক যে চায় গোরাপানে।
না ধরে ধৈরজ সে আপনা নাহি জানে॥
যেজন আইল অধিবাসে।
গন্ধ চন্দনাদি দিয়া সবে পরিতোষে॥
বিধিমতে করি অধিবাস।
বল্লভ আচার্য্য গেলা আপন আবাস॥
কহিতে সুখের অন্ত নাই
আইহো শুইহোলঞা শুভ কর্ম্ম করে আই॥
নারীগণে দেই জয়কার।
ভাটগণে করয়ে মঙ্গল বার বার॥
নৃত্য গীত বাদ্য নানা ভাতি।
উপমা দিবার নাই কাহার শকতি॥
কেবা না বলয়ে ভাল ভাল।
জগভরি জয় জয় শবদ রসাল॥

মানুষে মিশায়ে দেবগণে।
দেখি অধিবাস রঙ্গ নরহরি ভণে॥

এদিকে শচীদেবী বউটীকে আর কোল হইতে নামাইতে পারিতেছেন না। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও এক একবার তাঁহার কোল হইতে লইতেছেন। এইভাবে নূতন বধুকে লইয়া স্ত্রীমহলে এক মহা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। চঞ্চল নিমাই এই মধুর দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে না পারিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া ফেলিলেন।

মেয়েটী প্রকৃতই সুলক্ষণা ছিল। শচী দেখিলেন নূতন বউটী গৃহে আসিয়া অবধি তাহার আর কোন দ্রব্যেরই অপ্রতুল হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া শচীর সুখের আর সীমা নাই। তিনি মনোসাধে পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া গৃহস্থালী পাতাইয়া বসিলেন।

এই ভাবে কিছুদিন কাটিল। বালিকা লক্ষ্মী এখন তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীর অনেক কার্য্যে সহায়তা করেন। ক্রমশঃ তিনি রন্ধন কার্য্যের ভার লইলেন। শচীর এ বিষয়ে কোন আপত্তি খাটিল না। হিন্দুর ঘরের বধূ, রন্ধন করিয়া পাঁচজনকে খাওয়ান যে সৌভাগ্যের কথা বলিয়াই মনে করেন।

নিমাইর সংসারটী যদিও ক্ষুদ্র ছিল কিন্তু সে গৃহে অতিথি অভ্যাগতের অভাব ছিল না। প্রতিদিনই দুই পাঁচ জনা আগন্তুক কেহনা কেহ আছেনই। হিন্দুর সংসারে অতিথি যে নারায়ণ—অভ্যাগত যে গুরুরূপে সম্পূজিত। তাহার উপর নিমাইচাঁদ মধ্যে মধ্যে বন্ধু বান্ধব ও নিকটস্থ আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। নিমাইর বাটীর নিকটেই গঙ্গার ঘাট। সেজন্য প্রাতে উঠিয়া লক্ষ্মীদেবী স্নান করিয়া আসিয়া রন্ধন চাপাইতেন এবং শচীমাতা তাহার সহায়তা করিতেন। তখনকার বাঙ্গালী গৃহস্থগণ সামান্য সামান্য ভোজের অনুষ্ঠানেও কত প্রকার ব্যঞ্জন রাঁধিতেন তাহার একটী তালিকা আমি ঠাকুর জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

ঘৃতান্ন সভারে দিলা শাক মুগ সূপ।
ফেনাবড়ী লাফরা পটোল বাস্তুক॥
হিঙ্গ ঝাল ঝোল ভাজা তলা কাঞ্জি বড়া।
বড়াম্ল শর্করা লাজ মিঠামুখ বীড়া॥

ক্ষীর অমৃতগুটিকা খরড়া নবাত।
মনোহর পুলি দুগ্ধ পুলি দুগ্ধভাত॥
আর্দ্রা নারিকেল পুলি সাকরা কাকরা।
চন্দ্রকান্তি পায়েস পরমান্ন শর্করা॥
গুটিকা ডালিমা মধু প্রবাসাত পুলি।
মন সন্তোষ নয়ন সুখ গঙ্গাজল সিলালি॥
মচ্যা ছেনা দুগ্ধ পুলি কোরা মিষ্ট সর।
অনুপাম জগন্নাথ ভোগ সুখ-সার॥

বালিকা লক্ষ্মীটী তাহার পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। আদরিণী বালিকাকে ছাড়িয়া বল্লভাচার্য্য এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী থাকিতে পারিতেন না। প্রায়ই আসিয়া কন্যা জামাতাকে দেখিয়া যাইতেন। ইহার মধ্যে নিমাইও কয়েকবার শ্বশুর গৃহে গমন করিয়াছেন। প্রথম বার যোড়ে গিয়াছিলেন—সেবারে তাঁহাদের উভয়ের মিলিত সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল।

নিমাইর দিনগুলি সুখে কাটিতেছে, তাহার সুখে সকলেই সুখী। এখন কার দিনে আমরা নানাবিধ অভাব, দারিদ্র, অকাল মৃত্যু, রোগ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত; নিরমল সুখের মুখ দেখা বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। তখন কার দিনে কিন্তু এগুলির এতটা আধিক্য ছিল না। তাহার উপর আবার নবদ্বীপ নগর, বাংলার মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়াই পরিগণিত ছিল। এত বিদ্যার চর্চ্চা, এত ধনী লোকের বসবাস, এত লোক-সংঘট্ট আর কোথাও ছিল না। এই আনন্দেরদেশে আনন্দের পূর্ণ মূর্ত্তি নিমাইচাঁদ বড়ই আনন্দে তাঁহার দিনগুলি কাটাইতেছেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স অনুমান সপ্তদশ বর্ষ হইবে। নদীয়ার মত স্থানে তিনি ইহার মধ্যেই পণ্ডিত বলিয়া পূজিত। তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁহার ভক্ত তাঁহার নিপুন লেখনী মুখে নিমাইর এই কালীন চিত্রটী কেমন সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন দেখুন—

জিনিঞা কন্দর্প কোটিরূপ মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরূপম লাবণ্য সুন্দর॥

আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ান।
অধরে তাম্বূল দিব্য-বাস-পরিধান॥
সর্ব্বদায়ে পরিহাসমূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে' ত্রিভুবনপতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী॥
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান।
যার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার আদান॥
সকল সংসারি লোক বোলে "ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার, তাহার কোন দৈন্য?"
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন সমান।
পাষণ্ডিয়ে দেখে যেন যম বিদ্যমান॥
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এই মত দেখে সবে যার যেন মতি॥ (চৈঃ, ভাঃ)

প্রকৃতই স্বভাবে সুন্দর নিমাইচাঁদের সমস্ত কাজই সুন্দর ছিল। তখনকার দিনে বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকা লোকের সব কাজের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ কাজ ছিল। এই বিদ্যার চর্চ্চায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তখনকার লক্ষ লক্ষ ছাত্রের মধ্যে কেহই আমাদের নিমাইয়ের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। অমন যে রঘুনাথের প্রোজ্জ্বল প্রতিভা, তাহাও তাঁহার নিকট পূর্ণিমার শশধরের স্থানে ক্ষুদ্র দীপ-শিখার ম্লান জ্যোতির ন্যায়ই প্রতীয়মান হইত। এই পাণ্ডিত্য কিন্তু তাহাতে চঞ্চলতা আনিয়াছিল। সেই তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী চঞ্চল যুবকটীর সম্মুখীন হইতে অতি বড় পণ্ডিতও ইতস্ততঃ করিত। এই চঞ্চলতা কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ভক্তির সুরধুনী তাঁহার শক্তিশালী চিত্তক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইয়া চঞ্চলতা ধুইয়া জগতকে স্নাত করিয়াছিল। জগতের সৌভাগ্যের দিনের সে সুখের কথাগুলি স্মরণ করিতে গেলেও চিত্ত এলাইয়া পড়ে। ভাগ্যে থাকে, ভবিষ্যতে তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়া আত্মশুদ্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মাধর্ম্ম।

লেখক—প্রভুপাদ শ্রীল নিত্যানন্দ গোস্বামী।

—:০:—

তাড়াতাড়ি স্নান আহার শেষ করিয়া কর্ম্মস্থানে যাইবার অন্য বেশ ভূষা প্রভৃতি করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময়ে,—মুক্তকেশা, আরক্তলোচনা পত্নী দর্শন দিয়া বলিলেন—"তোমার ধম্মো গ্যান কিচ্ছুঃ নেই।"

ব্যাপারটা পরিস্কার ক'রে বুঝ্‌তে আমার কিছুক্ষণ সময় গেল;—অর্থাৎ আমার ভাগ্য-বিধাতা বড়সাহেবের কিছু কৃপা হওয়ায় আমি নিজ বেতনের কিছু বৃদ্ধি করাইতে সমর্থ হইয়াছি; সুতরাং তাঁহাকে অর্থাৎ আমার পৃষ্ঠারূঢ়া শ্রীমতীকে কিছু মূল্যবান অলঙ্কারাদি প্রদানরূপ পূজা করিতে এ যাবৎ বিশেষ কোনও কিছু ফলপ্রদ কার্য্যসূত্র আরম্ভ করি নাই দেখে তিনি আমাকে পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বারা সম্ভাষিত করিলেন।

আমি উত্তরে কোনও বাক্য ব্যয় না করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে গমন করিলাম। কিন্তু কথাটায় আর একটী চিন্তার সূত্র আরম্ভ করিল।

সমস্তদিন মস্তিষ্কের মধ্যে ঐ একই কথা আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে গৃহে ফিরিয়া প্রতিবেশী প্রিয় বন্ধুর পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে চিন্তার বিষয় বলিলাম—তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন:—

"ভায়া! এই বিষয়ে দু'এক কথায় তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়—"মানব বৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম"—"the substance of Religion is culture" আর Reverseই অধর্ম্ম। তবে এই জিনিষটার কিছু আলোচনায় আবশ্যক। এক্ষণে বিষয় হইল, কোন্‌টা ধর্ম্ম এবং কোন্‌টা অধর্ম্ম তাহাই জানা। শাস্ত্র বলেন:—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধী-বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং॥ (মনু ৬.৯২.)

সন্তোষ, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, শুদ্ধতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য এবং অক্রোধ ;—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

ঋষি বলিতেছেন :—

"ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতোধর্ম্মাণি ধারয়ণ" (ঋক্‌১ম ২২সূ)

এই কথায় ব্যক্ত হইতেছে—"the eternal laws of the universal"—

"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"

আবার—"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স্‌সিদ্ধি সঃ ধর্ম্ম"।

বুদ্ধ বলিতেছেন :—

মনোপুব্বঙ্গমাধর্ম্মামনো সেট্‌ঠা মনোময়া"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই কথাই বলিতেছেন—

"What a man of sense will naturally hold"

একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানব "সৎ" বলিয়া যাহা ধারণা করেন তাহাই "ধর্ম্ম"। ইহার বিপরীত যাহা তাহাই "অধর্ম্ম"।

যে কার্য্যে, যে মনে, যে ভাবে, অসন্তোষ সৃষ্ট হইবে, তাহাই অধর্ম্ম। সুতরাং তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

"ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমস্তই এই ভাবে ধারণা করিতে হইবে। তাহা হইলেই পূর্ব্ব কথা—"বৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম" এই বাক্যের সার্থকতা আসিতেছে।

তারপর যদি আরও সাধারণ এবং স্বাভাবিক ভাবে বিচার করা হয় ; দেখিতে পাওয়া যাইবে, সমস্ত মানবের পক্ষে সাধারণ "ধর্ম্ম" এক, এবং যাহাতে বা যে কার্য্যেতে মনের ভিতরকার প্রধান পর্দ্দায় বেসুরো আঘাত বা ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে, তাহাই "অধর্ম্ম"। "Common moral perception বা conscience যাহা অনুমোদন না করে তাহাই "অধর্ম্ম"।

তা' সে'টা আমরা শুনি বা না শুনি ; ভিতরের আঘাত হইবেই হইবে। এই 'হ'ল বিবেক-বাণী'। যদি আমরা ইহার সতর্কতা অবহেলা করিয়া যাই ; ক্রমশঃ ইনি নিঃস্তেজ হইয়া যাইবেন। ফলে আমরা অধার্ম্মিক বা "বিবেক-হীন" পদবাচ্য হইব।

কিন্তু যদি ইহার বাক্য বা সতর্কের আঘাত সাধারণ জ্ঞানে শুষ্ক তর্কের চোক্ রাঙ্গানি না দিয়া আমরা শ্রবণ করি এবং পরপর পালন করিয়া যাই তাহা হইলে ক্রমশঃ সেই culture র ফলে আমরা "ধার্ম্মিক" বা "বিবেকী" পদ বাচ্য হই।

আমাদের শাস্ত্রও তাহাই শিক্ষা দিতেছেন ঃ—

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয় সাধনম্।"

* * *

সঃ পুরুষং নিঃশ্রেয়সেন সংযুনক্তি স ধর্ম্ম।"

আমাদের শাস্ত্র, এবং অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থ অর্থাৎ বাইবেল, কোরাণ, ধর্ম্মপদ, গ্রন্থসাহেব, কল্পসূত্র, আবেস্তা প্রভৃতি যে শাস্ত্রই দেখ, আর যে সম্প্রদায়েই যাও, মূলে মানবের একই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছে। সকলেই সমস্বরে বলিতেছেন—যাহা "সৎ" এবং "শ্রেয়" তাহাই "ধর্ম্ম"। তার Reverse "অধর্ম্ম"।

"য এব শ্রেয়স্কর সএব ধর্ম্ম।"

যদি তাহাই হয়, যদি শুভ, বিহিত, সঙ্গতই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ইহাও ঠিক যে ঃ—"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"

এ কথায় একটী সার্ব্বভৌমিক ঐক্য বন্ধন আছে যাহা আমরা জগতের সমস্ত মানবের বিবেক-বাণীর মধ্যে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে শুনিতে পাই।

সুতরাং তুমি তোমার শ্রীমতী পত্নীকে যদি অলঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা পূজার কিছু হানি করিয়া "বিবেক" জ্ঞানে বুঝিয়া থাক কার্য্য "সৎ" এবং "শ্রেয়" করিয়াছ তাহা হইলে তোমার "ধর্ম্মো গ্যান্ কিচ্ছুই নেই" এ কথা আমি বলিতে পারি না। "তা যা হোক ভায়া! এক্ষণে তোমার যে ঈশ্বর কৃপায় আয় বৃদ্ধি হইল তাহার জন্য কোন্ কোন্ "সৎ" ও "শ্রেয়" কার্য্যের সহায়তা করিবে মনে করিয়াছ?"

আমি বলিলাম—"বর্ত্তমানে কিছু উত্তম মিষ্টান্ন মহামহিম ৺ভীমচন্দ্র নাগের দোকান হইতে সংগ্রহ ক'রে; তোমার এবং আমার ন্যায় সৎ আত্মায় প্রদান করিব মনে করিয়াছি, ইহা কি ধর্ম্ম নয়?"

বন্ধুবর হাস্য করিয়া বলিলেন—হাঁ৷ ইহাও ধর্ম্ম। পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় বহু আছে, যদি অবসর পাও এবং অভিলাষ হয়, আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। উপস্থিত রাত্রি অধিক হইয়াছে।—নমস্কার"

অল্পধর্ম্মে অধিক ফললাভ।

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ অংশ, ২য় অধ্যায়।)

—:০:—

"কোন্ কালে ধর্ম্ম অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে?"—এই বিষয় লইয়া কোন এক সময়ে মুনিগণের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা সংশয় নিরসনের জন্য মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের নিকট গমন করেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহামতি ব্যাসদেব পবিত্র জাহ্নবী সলিলে অবগাহন করিতেছেন। তাঁহার স্নান সমাপ্তির জন্য মুনিগণ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী ব্যাসদেব মুনিগণের মনোভিলাষ অবগত হইয়া উহাদিগকে শুনাইয়া অগত ভাবেই বলিতে লাগিলেন—"কলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু। হে শূদ্র! তুমিই সাধু এবং তুমিই ধন্য! হে স্ত্রীগণ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর জগতে আর কে আছে?" তদনন্তর যথাবিধি স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ব্যাসদেব আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মুনিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। যথাবিধি শিষ্টাচার প্রদর্শন এবং সাদর সম্ভাষণের পর তাঁহারা যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলে সত্যবতীসুত ব্যাস তাঁহাদিগকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ বলিলেন,—কোন বিষয়ে সংশয়িত হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আপনি স্নান করিতে করিতে বারম্বার বলিলেন যে "কলিই সাধু, শূদ্রও সাধু এবং স্ত্রীগণও সাধু ও অতি ধন্য।" যদি এই বিষয়ের তত্ত্ব প্রকাশে কোন বাধা না থাকে, তবে অগ্রে তাহাই কীর্ত্তন করুন। কারণ এই বিষয় শ্রবণে আমাদের সকলেরই একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। মহর্ষি

বেদব্যাস ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"হে মুনিপ্রবরগণ! আমার মুখ হইতে যে "কলিই সাধু, শূদ্রও সাধু, স্ত্রীগণও সাধু ও অতি ধন্য" বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আপনাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

প্রথম বলি কলিই সাধু কেন—

সত্যযুগে ১০ বৎসর, ত্রেতাতে এক বৎসর এবং দ্বাপরে একমাস কাল পরিশ্রম করিয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির যে ফল হইয়া থাকে, কলিকালে মনুষ্য এক দিবারাত্রির পরিশ্রমেই অর্থাৎ অহঃরাত্র শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে সেই ফললাভ করিয়া থাকে।

সত্যযুগে বহু ক্লেশ সাধ্য ধ্যান-যোগ করিয়া ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপর যুগে বহুতর অর্চ্চনাদি দ্বারা যে ফললাভ হয়, কলিযুগে কেবল "হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন" করিয়াই মনুষ্য সেই ফললাভ করিতে পারে। কলিযুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে, হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আমি এই নিমিত্তই অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কলিকে সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি।

তারপর শূদ্রও সাধু কেন বলিতেছি—

দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইয়া থাকেন। বেদাধ্যয়নান্তে তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিপালনের জন্ম যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়; অধিকন্তু তাঁহারা অসংযত হইয়া যদি বৃথা কথা কিম্বা বৃথা ভোজ্য অথবা বৃথা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন অংশে ত্রুটী হইলে, তাঁহারা পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না; সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। ইহাতেও বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিলে তবে তাঁহারা পরকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবা দ্বারাই শূদ্র পঞ্চযজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই শূদ্রজাতিকে

ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ। যেহেতু ইহাদের ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহারা তজ্জন্য কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না। এই জন্যই ইহাদিগকে সাধু বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছি।

অতঃপর স্ত্রীগণ সাধু কেন তাহা শ্রবণ করুন—

পুরুষগণ স্বধর্ম্মের অবিরোধে সর্ব্বদা ধন উপার্জ্জন করিবে এবং তাহা সৎ-পাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহা দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই অর্থের উপার্জ্জন, তাহার রক্ষা ও তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষগণকে মহাক্লেশ পাইতে হয়। এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রজাপত্যাদি লোক সমূহে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

কিন্তু স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই বিনা ক্লেশে সেই সকল লোকে গমন করিতে পারে। এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে স্ত্রীগণ সাধু এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন। অধুনা আপনারা কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন তাহা বিবৃত করুন, আমি বিশদরূপে সে সমুদয়ের উত্তর যথা জ্ঞান প্রদান করিতেছি। মহর্ষিগণ কহিলেন—হে মহামুনে! কথা প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সম্যক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস কিঞ্চিৎহাস্য করিয়া বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি দিব্য-জ্ঞানবলে আপনাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত হইয়াই আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কলি সাধু" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলাম।

কলিকালে মানবগণ সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অতি অল্প প্রয়াসেই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শূদ্রগণও অক্লেশেই কেবল দ্বিজগণের সেবা দ্বারাই এবং স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে পতি শুশ্রূষা দ্বারাই বহুতর ধর্ম্মার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই এই তিনজনকে আমি ধন্যতম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি, কেননা সত্য প্রভৃতি যুগ সমূহে ধর্ম্মার্জ্জন করিতে হইলে কেবল দ্বিজাতিগণকেই বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যন্ত দুষ্ট কলির এই একটু মহৎ

শুণ যে এই কালে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে মনুষ্যগণ কেবল "হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন" করিলেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তদনন্তর মহর্ষিগণ মহামতি ব্যাসদেবকে বারংবার যথাবিধি পূজা ও বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহার বাক্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় স্বীয় সংশয় অপনোদন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীসতীশ চন্দ্র চৌধুরী, বিদ্যাবিনোদ।

মরা হ'ল দায়।

নীরব নিশীথ-মাঝে
বিপিন বিজনে বাজে
সখি গো! ঐ বুঝি শ্যামরায়।
বাঁশরী মধুর স্বনে
শুধু রাধা নামগানে
সখি মোর প্রাণ কাড়ি লয়॥
ধৈরজ বাঁধিতে চাই
বসে চিত নাহি পাই
সখি মোর একি হ'ল দায়।
হৃদয়ে বাসনা জাগে
কহি গিয়া শ্যাম আগে
নিঠুর সে কেন বা মজায়॥
হু হু করি দিবানিশি
হৃদয়ে যাতনা রাশি
সখি সদা আমারে পোড়ায়।
বিরহে বিকল দেহ
ভাবিতে নাহিক কেহ
কহ মোরে কি করি উপায়॥

যমুনার তীরে যাই
মনে করি শ্যাম নাই
জল-মাঝে দেখি শ্যামরায়।
অনলে পশিতে চাই
সেথা শ্যাম দেখা পাই
সখি মোর মরা হ'ল দায়॥

দীন—শ্রীঅনাথ বন্ধু ভট্টাচার্য্য।

(আমি কে ?*)

—:০:—

মধুমাসে একদিন তমালের তলে।
রবি যবে শ্রান্ত হ'য়ে গেল অস্তাচলে।
ঊর্দ্ধনেত্রে শু'য়ে আছি মুলে রাখি শীর।
একে শীত-নিশা তাহে বায়ু বহে ধীর॥
তারকা চাঁদেরে বেড়ি শোভে নীলাকাশে।
সাদা মেঘগুলি তায় ছড়াইয়া পাশে॥
যেন দেব হলধর হলের প্রহারে।
নভো-ভূমি খনিয়াছে বীজবপিবারে॥
এইরূপ শোভা হেরি বিশাল গগনে।
অকস্মাৎ পড়ে দৃষ্টি আপনার পানে॥
বিশাল আকাশ তলে নিজেরে হেরিয়া।
কি জানি কি ভাব মনে উঠিল জাগিয়া॥

---

* সংসারের কর্ম্মাবসানে ক্লান্তদেহে বিশ্রাম সময় স্বপ্ন-যোগে যে তত্ত্বোপদেশ পাইয়া ছিলাম তাহা স্মরণ করিয়াই এই কবিতাটী লিখিত হইল, যদি কোনরূপ অসঙ্গত ভাব থাকে আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—(লেখক)।

"ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব মোরা জানিবারে চাই।
জানিনাকো কিন্তু হায় 'আমি কে'বা ভাই॥
ভাবিতে ভাবিতে হ'নু তন্দ্রায় মগন।
ক্রমেতে দেখিনু এক আশ্চর্য্য স্বপন॥
দেখিনু আকাশে সেই সাদা মেঘ হ'তে।
দেখি নাই হেন দৃশ্য পূর্ব্বে কোন রাতে॥
অপূর্ব্ব যোগীর মূর্ত্তি পূর্ণ তেজোময়।
দশদিক্ আলো করি বহির্গত হয়॥
ক্রমেতে নিকটে এলে ছুটে গিয়া তাঁরে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি কহিনু কাতরে॥
"অবণি মাঝারে সদা কহি আমি আমি।
কৃপা করি কহ দেব? কেবা হই আমি॥"
মম প্রশ্ন শুনি ধীরে সেই যোগীবর।
হাস্য করি মমপ্রতি করেন উত্তর॥
"আনন্দিত হ'নু বৎস! তব প্রশ্ন শুনি।
দিবহে উত্তর আমি যতটুকু জানি॥
এই যে দেখিছ বীণা যন্ত্র মোর করে।
মম আজ্ঞা বিনা কার্য্য করিতে না পারে॥
আমি আজ্ঞা দিলে বাজে তা না হ'লে নয়।
আদেশ লঙ্ঘিলে ইহা চূর্ণিব নিশ্চয়॥
ইচ্ছামত যন্ত্র যদি অন্যরূপ বাজয়।
তা'হ'লে বিপদ তার হবে নাকি তা'য়?
ভগবান সৃজেছেন বিশ্ব-চরাচরে।
তাঁহার সৃজিত নর 'আমি আমি' করে॥
কিন্তু সেই নর শুধু যন্ত্রবৈ'ত নয়?
আমি করিতেছি বলা উচিৎ না হয়॥
যেই কার্য্য দিয়াছেন তিনি সবাকারে।
উচিৎ সেই কার্য্য করা তুষিতে তাঁহারে॥

সদা এই কথা মনে রাখিও নিশ্চয়।
'তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র' আর কিছু নয়॥"
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিনু পরিচয় তাঁর।
হ'লেন 'নারদ আমি' ব'লে নিরাকার॥*
দাঁড়াও দাঁড়াও বলি চীৎকার করিয়া।
জাগরিত হ'য়ে আমি বসিনু উঠিয়া॥
কে যেন কহিছে মোর কাণে কাণে ডাকি।
"তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র" আর সব ফাঁকি॥

দীন শ্রী—

নন্দ-ছেলে।

—:০:—

ভব— শ্যাম-বরণ নয়ন-নন্দন,
পায়েতে নূপুর রুণু রুণু স্বর,
উঠিত সে ধ্বনি চিত্ত-রঞ্জন;
কদম্বের মূলে যমুনার তীরে;
হে ভব-বন্দন! দেখা দাও মোরে॥

ভব— বঙ্ক-কটি-তটে পীত-ধড়া আঁটা,
ভুবন শোভন জানু বিমোহন
গোপিনি-রঞ্জন অপরূপ ছটা;
হে বিশ্ব-নিয়ন্তে! হৃদয় অন্তরে;
হে বঙ্ক-বিহারি! দেখা দাও মোরে॥

ভব— হৃদ্-কণ্ঠে আহা! শোভে বনমালা,
নিখিল সুষমা ছুটে অনুপমা,
আমরি মহিমা নন্দ-গৃহ-আলা!

* নিরাকার শব্দে এখানে অদৃশ্য বুঝাইতেছে। (ভঃ সঃ)।

হৃদয় মাঝারে হেরি চরাচরে,
ওহে বনমালি! দেখা দাও মোরে॥

ধ্রুব— হাতে শুধু বেণু বলে রাধা রাধা,
সে বেণুর স্বরে কাতারে কাতারে
ছুটে গোপকুল মত্ত হ'য়ে আধা;
ভূলোক দ্যুলোক মাতে সে স্বরে,
হে বংশীবাদন! দেখা দাও মোরে॥

ধ্রুব— মুখ চন্দ্র-কান্তি কিবা দিয়ে গড়া,
শত-চন্দ্র-প্রভা শত-রবি-আভা
হয় ম্লানভূত, রাধা-মনোহরা!
দেবগণ বন্দে থাকিয়া অম্বরে,
সজল-জলদাঙ্গ! দেখা দাও মোরে॥

ধ্রুব— ললাটে শোভিত তিলক-রেখা,
নিম্নেতে নয়ন মনো বিমোহন
অতি সুশোভন যেন ছবি আঁকা।
পাপি-জনে দেখ থাকিলে আঁধারে,
ওহে সর্ব্বদর্শে! দেখা দাও মোরে॥

ধ্রুব— রক্ত ওষ্ঠাধর কিবা অপরূপ!
দীপ্ত দশন ধবল বরণ
আধা-হাসি মুখে শোভে অনুরূপ,
হেরি প্রেম-রাশি অন্তরে বাহিরে,
তুমি প্রেমময়! দেখা দাও মোরে॥

ধ্রুব— শিরে শোভে চূড়া শিখি-পুচ্ছে গড়া,
কি জ্যোতি-নির্ম্মল করে ঝলমল
অব্যক্ত তোমার ওই রূপ-ছড়া।
দেবের দেবতা হে পরাৎপরে!
শিখি-পুচ্ছধারি! দেখা দাও মোরে॥

স্তব—　　কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে ঝলমল,
ঈষৎ হেলিয়া　　বামেতে দুলিয়া
বেণুটী বাজাও হে নন্দ-দুলাল!
দিতেছ করুণা ও বাঁশীর স্বরে,
দয়াময় তুমি, দেখা দাও মোরে॥

চতুর্ব্বর্গ দাতা তুমি হে মুরারি!
অনাদি-কারণ,　　পাপীর তারণ,
ভক্তে দাও দেখা বাঞ্ছা-পূর্ণকরি।
তারহ এবার অধম পাপীরে,
অধম তারণ! দেখা দাও মোরে॥

শ্রীশশি ভূষণ পাত্র।

মুক্তি-যান।*

—:০:—

মুক্তি-পথে অগ্রসর হইবার নিমিত্তই ভূতভাবন ভগবান শ্রী শ্রীমুকুন্দদেব পরমানন্দের সহিত অতি সুকৌশলে মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অচিন্ত্য মহিমার ইয়ত্তা করা সাধ্যাতীত হইলেও তিনি যে করুণাময়, তাহা তাঁহার এই মানবজাতির সৃজন-নৈপুণ্যেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি মনুষ্যকে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য কত উপাদেয় উপাদানেই যে মানব দেহকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি, ভগবৎকৃপাশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমস্তই তিনি এই ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড মানব-দেহ-মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রানি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥

* লেখকের মতের সহিত বোধ হয় সকল পাঠক একমত হইবেন না, যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা ভক্তিতে যথাসময় প্রকাশ করিব। (ভঃ সঃ)

সৃষ্টি সংসার কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশি ভাস্করৌ।
নভোবায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরু সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহার প্রবর্ত্ততে॥ (শিব সংহিতা)

এতদ্ব্যতীত সুখ স্বচ্ছন্দে মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তিনি মানব-দেহকে রথের ন্যায় অশ্বাদি সংযোগে সতত সুসজ্জিত রাখিয়া তাঁহার দয়াময় নামের আরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি নর-শরীরকে করিয়াছেন রথ, আত্মাকে করিয়াছেন রথী, ইন্দ্রিয়গণকে করিয়াছেন অশ্ব এবং মনকে করিয়াছেন প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম।

আত্মানং রথীনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহু মনঃ প্রগ্রহ এব চ॥

অশ্বরূপী ইন্দ্রিয়গণকে উহাদের ইচ্ছামত পরিচালিত হইতে না দিয়া, মনরূপ প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম আকর্ষণপূর্ব্বক স্ববশে রাখিয়া, অহঃরহ ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে পারিলেই, দেহ-রথকে অবলীলাক্রমে মুক্তি-পথে লইয়া যাইতে পারা যায়। অথবা কুটিল স্বভাব দুর্য্যোধনের ন্যায় অভিমানের সিংহাসনে উপবেশন না করিয়া সরল স্বভাব ও অতিশয় নিরভিমানী পার্থের ন্যায় ভগবচ্চরণারবিন্দে মন প্রাণ ও দেহাদি সমর্পণপূর্ব্বক একেবারে ভগবানের হইয়া যাইতে পারিলেও ইন্দ্রিয়গণ বিপথগামী না হইয়া আপন ইচ্ছায় মুক্তি পথে ধাবিত হইতে থাকে। তখন বিপথের ভয় স্বরূপ কামক্রোধাদি রিপুনিচয় তাহাদের স্ব স্ব দুষ্প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভের উপায় ভক্তিভাবের উদ্দীপক হইয়া উঠে। মোহ-শৃঙ্খল আপনাআপনি-ই খুলিয়া যায় এবং সংসারও আর কারাগার বলিয়া বোধ হয় না।

তাবদ্রাগাদয়ঃস্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোহঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎকৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৬

ফলকথা অনন্য শরণ, অনন্য চিন্ত্য ও অনন্য পরায়ণ হইয়া ঐকান্তিক ভক্তিভরে সকল ভার ভগবৎ পাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক কামনাশূন্য হৃদয়ে ভগবানে নির্ভর করিতে পারিলেই শক্রভয় ঘুচিয়া যায়, ও শান্তিভাব আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। আর কোন বিষয়ের জন্য চিন্তাও করিতে হয় না। বাস্তবিক কথাও

তাই।—তিনি বিশ্বম্ভর—সকল ভারই তিনি বহন করিতেছেন। আমরা বুঝিতে না পারিয়া কেবল কর্ত্তা সাজিয়া থাকি ও মিথ্যা অভিমানাদির গুরুতর ভার মস্তকে লইয়া সদা সর্ব্বদা ভারাক্রান্ত চিত্তে অস্থির হইয়া বেড়াই। অধিক কি, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তাও আমরা বৃথা করিয়া থাকি। জগচ্চিন্তামণি বিশ্বপাতা ভগবানের চিন্তায় চিন্তিত হইলে, আর কোন চিন্তাই করিতে হয় না। কেননা—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরোদেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥ (পাণ্ডবগীতা)

অতএব সকল চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যচিন্ত্য হইয়া কেবল মাত্র ভগবানের উপাসনায় নিরন্তর মনোনিবেশ করিয়া থাকাই মনুষ্য দেহধারী জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়োন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীতা ৯।২২)

বাস্তবিক বহু বহু জন্মের পুণ্য-লব্ধ সাধক এই সুদুর্ল্লভ মানব-জন্মলাভ করিয়া কায়মনোবাক্যে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর ভগবান হৃষীকেশের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভক্ত উপাসনার কণ্টক স্বরূপ বিষয়-বাসনা চান না। চান কেবল মন, প্রাণ, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সর্ব্বেশ্বর ভগবানের সেবা করিতে।

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্র বনবাস সময়ে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া সপ্ততাল ভেদ করিয়া প্রিয় সখা সুগ্রীবকে যখন স্বরূপ তত্ত্ব জানাইয়াছিলেন, তখন রাজ্য ভোগাদি বিষয় স্পৃহাকে অতি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সুগ্রীব প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না তবে এইমাত্র চাই যে, আমার চিত্তবৃত্তি যেন আপনার পাদপদ্মে অর্পিত থাকে, রসনা যেন আপনারই নামামৃত পান করে, হস্ত যেন আপনার ভক্তেরই সেবায় নিযুক্ত থাকে, অঙ্গ যেন আপনারই অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করে, চক্ষু যেন আপনারই মূর্ত্তি স্বরূপ আপনার ভক্ত এবং আপনার শ্রীমূর্ত্তি ও আপনার প্রকাশ স্বরূপ আমার শ্রীগুরুদেবকে সতত দর্শন করে, শ্রবণ যেন আপনার লীলা গুণাদি শ্রবণ করে, আমার পদদ্বয় যেন সর্ব্বদাই আপনার মন্দিরে গমন করে, আমার অঙ্গ সকল যেন আপনার

পদধূলিরূপ তীর্থনিচয় ধারণ করে এবং আমার মস্তক যেন আপনার শিব-বিরিঞ্চি সেবিত-শ্রীচরণ প্রণামে সতত তৎপর থাকে।

তৎপাদপদ্মার্পিত চিত্ত-বৃত্তিস্তন্নাম সঙ্গীত কথামুবাণী।
তদ্ভক্ত সেবা নিরতৌ করৌ মে তদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্॥
তন্মূর্ত্তি ভক্তান্ স্বগুরুঞ্চ চক্ষু পশ্যত্বজস্রং সশৃণোতু কর্ণঃ।
তজ্জন্ম কর্ম্মানিচ পাদযুগ্মং ব্রজত্বজস্রং তব মন্দিরানি॥
অঙ্গানিতে পাদরজ বিমিশ্র তীর্থানি বিভ্রত্বহি শক্রকেতো।
শিরস্তুদীয়ং তব পদ্মজাদ্যৈর্জুষ্টং পদং রাম নমত্বজস্রম্॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

দেবর্ষি নারদ কর্তৃক অভিশপ্ত কুবের তনয়দ্বয় শ্রীবৃন্দাবন ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে বৃক্ষ-যোনি হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন :—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং।
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ—
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে।
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেস্তু ভবত্তনূনাম॥ (ভাঃ ১০।১০।৩৮।)

অতএব ইহা স্থির নিশ্চয় যে, মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে হইলে, অগ্রেই বলবান ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখিতে শিক্ষা করিতে হয়। কারণ ইন্দ্রিয়গণ এতই বলবান যে, বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে।

বলবান ইন্দ্রিয় গ্রাম বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

ইন্দ্রিয়গণের নেতা হইতেছে মন। এই মন যতদিন একেবারে স্থির না হয়, ততদিন কাহারও প্রতি এমন আসক্তি করা উচিত নহে, যে আসক্তির দোষে যোগ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও বহুকাল সঞ্চিত তপস্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ বলেন যে, অসতী স্ত্রী যেমন উপপতিকে অবসর দিয়া নিজ পতির প্রাণ হরণ করে, তদ্রূপ ঐ চঞ্চল মন উপপতি স্বরূপ কাম ক্রোধাদিকে প্রশ্রয় দিয়া ঐ মনকে বিশ্বাসকারী পুরুষের বহুকাল সঞ্চিত জীবন সর্বস্বরূপ ধর্ম্মধনকে নষ্ট করিয়া দেয়।

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসিহ্ন্যনবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্॥
নিত্যং দদাতি কামস্যচ্ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী॥ ভাঃ ৫।৬।৩।৪।

মনকে বিশ্বাস করতঃ অবসর প্রদান না করিয়া অর্থাৎ চঞ্চল হইতে না দিয়া, নির্ব্বাত দীপ-শিখার ন্যায় স্থির রাখিতে পারিলেই, স্থির জানিবে যে, ভগবানও স্থির হইয়া হৃদয়-পদ্মে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজমুখে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে :—

"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।"

অতএব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গণের নেতা মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে কদাচই মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারা যায় না। পশুত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই শাস্ত্র, অব্যবস্থিত চিত্ত ভগবৎবিমুখী ব্যক্তিগণকে, বান্তাশী কুক্কুর, বিষ্ঠা ভোজী শূকর, কণ্টক প্রিয় উষ্ট্র ও ভারবাহী গর্দ্দভ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্র খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতোজাতুনাম গদাগ্রজঃ॥ ভাঃ ২।৩।১৯।

উরুক্রম (ভগবানের) তত্ত্ব কথা ও তাঁহার গুণানুবাদাদি যে মনুষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, শাস্ত্র, সে কর্ণ-রন্ধ্রকে বিল অর্থাৎ খল স্বভাব সর্পের বাস-বিবর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এবং উরুগায় (ভগবানের) গাথা অর্থাৎ গুণানু কীর্ত্তন বা নামানুকীর্ত্তন যে মনুষ্য-রসনায় উচ্চারিত না হয়, সে জিহ্বা নহে; তাহাকে ভেক জিহ্বার ন্যায় অসতী * জিহ্বা কহে।

বিলেবতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত নচোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ভাঃ ২।৩।২০

সুচারু কারুকার্য্যবিশিষ্ট পট্টাম্বর বিনির্ম্মিত অতি সুন্দর উষ্ণীষ এবং সমুজ্জ্বল মণি মাণিক্য খচিত মনোহর মুকুট দ্বারা সুশোভিত হইলেও, যে মস্তক ভগবান

* ভেক যেমন নিজ কলরবে আপন শত্রু সর্পকে আহ্বান করে, সেইরূপ ভগবৎ গুণ-গাথা উচ্চারণ না করিয়া অসৎ লোকও বৃথা কথায় কালক্ষেপ করতঃ কালকেই আহ্বান করিয়া কালের কবলে পতিত হয়। (ভঃ সঃ)

মুকুন্দের চরণারবিন্দে নমস্কার উদ্দেশে নমিত না হয়, সে মস্তক উত্তমাঙ্গ হইলেও শরীরের একটা ভারস্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর সুবর্ণ বলয়াদি দ্বারা স্বালঙ্কৃত হইলেও যে কর শ্রীহরির অর্চ্চনাদিতে ব্যবহৃত না হয়; সে কর মৃত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদাই অকর্ম্মণ্য।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ননমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ কাঞ্চন কঙ্কণৌ বা॥

ভাঃ ২।৩।২১

মনুষ্যের যে নয়নদ্বয় ভগবানের লীলাস্থলে মূর্ত্তি দর্শন না করে, সে নয়ন শিখীপুচ্ছ সম্ভূত নেত্রের ন্যায় সর্ব্বদা নিস্ফল অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিহীন। মনুষ্যের যে চরণদ্বয় ভগবানের তীর্থস্থান সকল ভ্রমণ বা ভগবানের মন্দিরাভিমুখে গমন না করে, সে চরণ বৃক্ষের ন্যায় অচৈতন্য এবং বৃথা দেহভার বহন করিয়া থাকে মাত্র।

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌদ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রানি নানুব্রজতো হরের্যৌ। ভাঃ ২।৩।২২

যে মনুষ্য কখনও ভগবানের চরণ ধূলি লাভ করিতে পারে না বা লাভের জন্য প্রার্থনাও করে না সে জীবিত থাকিয়াও মৃত।

আর যে জন শ্রীহরির চরণে সমর্পিত তুলসীর আঘ্রাণ গ্রহণ না করিয়াছে, শ্বাস প্রশ্বাস থাকিলেও সে জন মৃত শবের তুল্য।

জীবঞ্ছবোভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্ নজাতু মর্ত্ত্যোঽভি লভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজঃ তুলস্যাঃশ্বসঞ্ছবোযস্ত ন বেদ গন্ধম্। ভাঃ ২।৩।২৩

অতএব এই দেহ-রথকে মুক্তি-পথে গমনের যোগ্য করিতে হইলে বিষয়-পথ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মার্গ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করতঃ নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বনে ভগবানের চরণারবিন্দ বন্দনাদিতে* নিয়ত নিযুক্ত রাখিতে হয়, অর্থাৎ নিষ্কাম

*অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচরব্যাপী মুকুন্দ চরণারবিন্দের সেবাদি সাংসারিক কার্য্য হইতে পৃথক নহে। কারণ তিনিই সর্ব্বময়, তিনিই সব অথবা তাঁরই সব; এইরূপ ঐকান্তিক বিশ্বাস বা জ্ঞানের সহিত বিষয় সেবা দোষের নহে। পরন্তু তাঁহাকে ভুলিয়া "আমার" বলিয়া বিষয়ে আসক্ত হওয়াই হইতেছে দোষণীয় ও তাঁহার অপ্রীতিকর কার্য্য। "তাঁহারই প্রীত্যর্থে সকল কার্য্য করিতে

ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহার বিপরীত আচরণ অর্থাৎ অভিমান ভরে কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া বিষয়ে মজিয়া থাকিলেই মনুষ্যকে বঞ্চিত ও আত্মঘাতী হইতে হয়।

স বঞ্চিত তো বতাত্মধ্রুক কৃচ্ছ্রেন মহতাভুবী।
লব্ধাপবর্গং মানুষ্যং বিষয়েষু বিসজ্জতে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

আর যে নর মুকুন্দ-চরণারবিন্দ আরাধনাদি ব্যতীত ইতরেতর বিষয়কে বিষজ্ঞানে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনাদি অসদ্বস্তু ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, আয়ু, মন ও বাক্যাদি সকলই ধন্য।

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তম্মনোবচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

তিনিই কেবল এই দেহ-রথকে আশ্রয় করিয়া জীবের একমাত্র অবলম্বন স্থান শ্রীমুকুন্দ-চরণারবিন্দ সমীপে উপনীত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র মানব দেহকে তরণী রূপেও বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, মহৎ পুণ্যরূপ পণ্য দ্বারা ক্রীত এই যে মানব কায়রূপ নৌকা, ইহা ভগ্ন না হইতে হইতেই দুঃখাদি সঙ্কুল ভীষণ ভব-সমুদ্র পার হইয়া ভগবৎ পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

মহতা পুণ্য পণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্ত্বয়া।
পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তর যাবন্নভিদ্যতে॥ (শান্তি-শতক)

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব উপদেশে বলিয়াছেন:—

"নৌকা জলেই থাকে, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে, তা হ'লে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের মনের ভিতর যেন সংসার ভাব না থাকে"।

হইবেক," এইটী সতত স্মরণ রাখিয়া, কার্য্য করিতে পারিলেই তাঁহার সেবা করা হইল।

লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার-যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

অতএব এই দেহকে রথরূপে কল্পনা করিয়া স্থলপথে যাওয়া হউক বা তরণীরূপ কল্পনা করিয়া জলপথেই যাওয়া হউক, নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত ও ব্রহ্মোপাসকগণের গম্য স্থান এক, কিন্তু সকামকর্ম্মীদিগের পুনরাবৃত্তি নিবন্ধন স্থান স্বতন্ত্র। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা "শারিরীক মীমাংসা" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

একোহি কৃষ্ণস্য সকৃৎ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণ প্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ (পাণ্ডবগীতা)

শ্রীভূপতি চরণ বসু।

সুখ ও দুঃখ।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং, দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
দ্বয়মেতদ্ধিজন্তুনামলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রি বৎ ॥"

দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় আবার দিন আসে—জগতের এই একটী অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়ম যেমন চিরকাল চলিয়া আসিতেছে—দেহীদিগের ভোগের নিমিত্ত সুখও দুঃখও সেইরূপ একটী অপরিহার্য্য ও অনতিক্রমণীয় নিয়ম, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। দেহধারণ করিলেই ঐ নিয়মের বশীভূত হইতে হয়। অতিক্রম করিবার কোন উপায় নাই। তাই শাস্ত্র পুনঃপুন বলিতেছেন "দ্বন্দ সহিষ্ণু হও," অর্থাৎ সুখে মুগ্ধ হইও না বা দুঃখে কাতর হইও না। উভয় অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া, তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতে থাক ও ভগবচ্চরণারবিন্দ লক্ষ্য করিয়া গম্য পথে অগ্রসর হও। মুগ্ধ বা কাতর হইয়া জীবনের নির্দ্দিষ্ট সময় বৃথা নষ্ট করিও না। বাস্তবিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্য হয় সুখ না হয় দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই সুখদুঃখময় শরীরের উৎপত্তির কারণ হইতেছে পুণ্য ও পাপজনিত কর্ম্মফল। সুতরাং নিজ নিজ কর্ম্মফলের অধীন মানব সুখেই থাকুক বা দুঃখেই থাকুক যখন যাহা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা ভোগ করিয়াই সুস্থচিত্তে থাকিবে; কদাচই ইষ্টলাভে হৃষ্ট বা অনিষ্টলাভে

ক্লিষ্ট হইবে না। কারণ সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নহে; সুখের পর দুঃখ নিশ্চয়ই আসিবে ভাবিয়া সুখে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে, আবার দুঃখের পর সুখ নিশ্চয়ই আসিবে ভাবিয়া দুঃখেও কাতর হওয়া উচিত নহে। সুখ ও দুঃখ জল-পঙ্কের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত। সুখের মধ্যে দুঃখ আছে আবার দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে। উভয়ের একটীর অভাবে অন্যটীর উপলব্ধি হয় না; অর্থাৎ সুখ না থাকিলে দুঃখের অনুভব হয় না ও দুঃখ না থাকিলে সুখের অনুভব হয় না। অতএব, পাঞ্চ ভৌতিক দেহে ইহা একটী মায়ার খেলা ইহাই স্থির করিয়া শুভাশুভ লাভে প্রসন্ন ও বিষন্ন হওয়া গর্ব্বিত ও হতাশ হওয়া কদাচই আমাদের কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ধৈর্য্যালম্বনপূর্ব্বক সংযত চিত্তে উভয় অবস্থারই ফলাফল ভোগ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

জগতে জীবের অসহনীয় কিছুই নাই। সুখের সময়—রসনার তৃপ্তিকর অমৃতোপম সুস্বাদু ভোজন, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন; অতিশয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সুকোমল পরিচ্ছদ ও স্রক্ চন্দনাদি ধারণ; শরদিন্দু-নিভাননা সুগঠনা ও কোকিল কণ্ঠস্বর-বিশিষ্টা অপ্সরী সদৃশ সর্ব্বগুণান্বিতা রূপবতী বনিতার আলিঙ্গন প্রভৃতি সুসেব্য পদার্থের ভোগও সহ্য হয়—আবার দুঃখের সময়, অন্নাভাবে কটু তিক্ত কষায় অতি বিস্বাদু ফল মুল ও পত্রাদি ভোজন; কখন বা অনশন; শয্যাভাবে ধরাশয়ন; উপযুক্ত পরিধেয়াভাবে অতি জীর্ণ ও মলিন বসন বা বৃক্ষ বল্কল ধারণ; ভস্মাদি অনুলেপন; সুখময় সংসারের বিসর্জ্জন প্রভৃতি অতি দারুণ ও কঠোর দুঃখের ভোগও সহ্য হয়। তবে সহিষ্ণুতা থাকিলে সহ্য হয় অকাতরে, আর সহিষ্ণুতা না থাকিলে সহ্য হয় অতি কাতরে। এই সহিষ্ণুতা জন্মায় অভ্যাস হইতে। অতি সুখী ব্যক্তির এককালে অতি দুঃখ সহ্য হয় না, আবার অতি দুঃখী ব্যক্তির এককালে অতি সুখও সহ্য হয় না। অতএব সংসারে আসিয়া সহিষ্ণুতা অভ্যাস করা আমাদের আবশ্যক। সহিষ্ণুতা অভ্যাস না করিলে মোহ কাটে না ও সুখ দুঃখের কাল সমভাবে যায় না।

চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল এই সুখ দুঃখ, জন্ম পরিগ্রহ করিলে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। কেহই বলিতে পারেন না যে, আমি জন্মলাভ করিয়া কেবল সুখই ভোগ করিতেছি বা কেবল দুঃখই ভোগ করিতেছি। সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেরই সুখ দুঃখ আছে।

তবে পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ও পাপের পরিমাণ অনুসারে সুখ দুঃখের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে মাত্র। অর্থাৎ কেহ অধিক সুখ অল্প দুঃখ, কেহ বা অধিক দুঃখ অল্প সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের মত। এই সুখ দুঃখের ভোগ যখন উপস্থিত হয়, তখন সুখে বিমোহিত ও দুঃখে অবসন্ন হওয়া আমাদের কোন ক্রমেই উচিত নহে। পরন্তু বিধি-নিষেধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তোষের সহিত সুখ ও দুঃখের সময় অতিবাহিত করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

সুখের সময় অনেক বন্ধু বিনা আহ্বানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং স্বার্থ সাধন জন্য বন্ধুকে কুমন্ত্রণা জালে জড়িত করিতে থাকেন। তখন সুহৃদ-সমাগম ও সুহৃদের সদুপদেশ অতি তীব্র ও অপকারী বলিয়া বোধ হয়। ক্রমশঃ যেমন সুখের অন্ত হইতে থাকে অমনি বন্ধুগণও সেই সুখের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্দ্ধান হইতে থাকেন। দুঃখ-পীড়িত বন্ধুকে ভুলেও একবার জিজ্ঞাসা করেন না যে 'ভাই কেমন আছ'। সুহৃদ তখন উপস্থিত হইয়া বলেন—"ভাই দুঃখ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মনের সুখে দুঃখের সময় অতিবাহিত কর। আবার সুখ আসিবে, সেই সময় সাবধান হইয়া সুহৃদ্-সমাগম গ্রহণ ও বন্ধু-সমাগম ত্যাগ করিও"। বন্ধু-সমাগম সুখের সময় পাওয়া যায়, দুঃখের সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু সুহৃদ-সমাগম সুখ দুঃখ উভয় সময়েই লাভ হইয়া থাকে। সুখ বিমোহিত ব্যক্তি অন্ধতা নিবন্ধন সুহৃদ চিনিতে পারে না। সুহৃদ সুহৃদের সুখ দুঃখ বুঝিতে পারেন। নিজের ইষ্টানিষ্ট বা সুখ দুঃখ লক্ষ্য করেন না। কিন্তু বন্ধু বন্ধুর সুখ দুঃখ লক্ষ্য করেন না। নিজের ইষ্ট সাধন জন্যই বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়া থাকেন ও চাটু বাক্যে বন্ধুকে ভুলাইয়া অহঃরহ কেবল নিজের ইষ্ট ও বন্ধুর অনিষ্ট সাধন করিতে থাকেন। অতএব কি সুখে কি দুঃখে, সকল সময়েই সুহৃদ-বাক্য অপ্রিয় জ্ঞান হইলেও প্রিয় জ্ঞানে গ্রহণ ও পালন করা এবং কপটাচারী বন্ধুগণের সংসর্গ হইতে প্রতি নিয়তই দূরে অবস্থান করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই বিধেয়।

এই সুখ দুঃখময় সংসার বা জগৎ হইতেছে বৃহৎ সংসারী বা জগৎপতি ভগবানের নাট্যশালা। নাট্যশালার আসর হইতেছে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড। প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসার হইতেছে এক একটী মণ্ডপ। এক

একটী মণ্ডপের এক একটী কর্ত্তা, আর এক একটী কর্ত্তার অধীনে কতকগুলি পরিবার। এই কর্ত্তাও পরিবারগণ সকলেই মায়া যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর নানা প্রকারের ও নানাভাবের অভিনয় করিতেছেন। সংসার-মণ্ডপ মধ্যে কেহ সাজিয়াছেন কর্ত্তা, কেহ সাজিয়াছেন গৃহিণী, কেহ জনক, কেহ জননী কেহ শ্বশুর, কেহ শাশুরী, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, কেহ ভ্রাতা, কেহ ভগিনী, কেহ পৌত্র, কেহ পৌত্রী, কেহ দৌহিত্র, কেহ দৌহিত্রী কেহ জামাতা, কেহ বধূ-ইত্যাদি। অভিনয় করিতেছেন সুখের সময় সুখের, দুঃখের সময় দুঃখের, শোকের সময় শোকের, হর্ষের সময় হর্ষের, বিষাদের সময় বিষাদের, রোগের সময় রোগের ইত্যাদি নানাবিধ রস পূর্ণ অভিনয় যখন যাহার ভাগ্যে উপস্থিত হইতেছে, তিনি তাহারই অভিনয় করিতেছেন। আবার যাহার ভাগ্যে অভিনয়ের পালা শেষ হইতেছে তিনি তখনই মণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ঐ সমস্ত অভিনয়ের শ্রোতা ও দ্রষ্টা হইতেছেন, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপিতা ও বিশ্ব সংহর্ত্তা ভগবান। ইনিই বিশ্বব্যাপীরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত এই অনন্ত সংসারের এই নানাবিধ অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন এবং অভিনয়ের ভাল মন্দ ও গুণাগুণ বিচার করিয়া পুরস্কার ও তিরস্কার বা উন্নতি ও অবনতি বিধান করিতেছেন। ভাবুক কবি গাহিয়াছেন ;—

"এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবরঙ্গ মঞ্চমাঝে।
এ রঙ্গের নট নটবর হরি যায় যা সাজান সে তাই সাজে॥
কর্ম্ম সূত্রে জীব মাত্রে মায়া সূত্রে সবে গাথা,
কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ ভার্য্যা কেহ ভ্রাতা,
কেহবা সেজেছেন পিতা কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা আসেন কত সাজে সেজে॥
যার যখন হ'তেছে সাঙ্গ রঙ্গ ভূমির অভিনয়,
কাকস্য পরিবেদনা সে তখনতো কার নয়
কোথা রয় প্রেয়সি প্রণয় পুত্র কন্যার কাতর বিনয়
কেউ শুনেনা কার অনুনয় চ'লে যায় সাজ সাজসজ্জাতে যে॥

অতএব, আমাদের ভাগ্যে সুখই বল, দুঃখই বল, রোগই বল, শোকই বল, হর্ষই বল, বিষাদই বল, অভিনয়ের জন্য যখন যে পালা আসিয়া

উপস্থিত হইবেক, তখন সেই পালার অভিনয়ই সেই বিশ্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, অতি সাবধান ও যত্নের সহিত সমাধা করিতে হইবে। উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অভিনয় ভাল হইলেই তিনি পুরস্কার অর্থাৎ উন্নতি এবং মন্দ হইলেই তিরস্কার অর্থাৎ অবনতি বিধান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুখ সকলেই চায়, দুঃখ কেহ চায় না। ইহা সংসারের একটী স্বাভাবিক নিয়ম। "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মে মাভূৎ" সুখ আমার হউক, দুঃখ যেন হয়না এইটীই সকলের প্রার্থনীয়। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যতটুকু সুখ ইচ্ছা করে, সে ততটুকু সুখ পাইলেই তাহার সে সুখের ইচ্ছা পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহা অপেক্ষা অধিক সুখের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। যিনি কেবল একটী মাত্র কপর্দ্দকের অধীশ্বর, তাঁহার ইচ্ছা একটী রৌপ্য মুদ্রা পাইলে বড় ভাল হয়। ক্রমশঃ যখন তিনি একটী রৌপ্য মুদ্রার অধীশ্বর হইলেন, তখন ইচ্ছা হইল দশটী মুদ্রার অধীশ্বর হইলে আরও ভাল হয়। এইরূপে দশটী মুদ্রা হইলে শত, শত হইলে সহস্র, সহস্র হইলে লক্ষ, লক্ষ হইলে কোটী, কোটী হইলে ইচ্ছা হয় ধরাধীশ্বর হইতে। ধরাধীশ্বর হইলেও সুখের ইচ্ছা বা কামনার শেষ হয় না। তখন ইচ্ছা হয় ত্রিদশেশ্বর হইতে। আবার ত্রিদশাধিপতিত্ব লাভ হইলে, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে। এইরূপে যাঁহার যত সুখ (কামনা) বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাঁহার তদপেক্ষা অধিক সুখের (কামনার) ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন;—

নিস্বোঽপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো।
লক্ষেশঃ ক্ষিতি পালিতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঙ্খতি।
চক্রেশঃ সুররাজতাং সুরপতি ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা শিব পদং শিব বিষ্ণু পদং তৃষ্ণা বধিকো গতঃ॥

এইরূপে কিছুতেই আর সুখের পিপাসা মেটে না বা দুঃখ ঘোচেনা। দুঃখ ঘুচাইবার জন্য কেবল সুখের দিকেই মন ধাবিত হয়। তখন ভগবানের দিকেও লক্ষ্য থাকেনা বা ভয়ানক দুঃখের সময় যে পরে আসিবে, তাহা একবারও মনে উদয় হয় না। উত্তরোত্তর এইরূপ সুখ ভোগ করিতে করিতে আশারূপ বৈতরণী নদীর একটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া, যখন পার প্রাপ্ত

হওয়া কঠিন হয়; তখন সুখের দ্বাররুদ্ধ হইয়া যায় ও পতন ঘটে অর্থাৎ দুঃখের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। দুঃখের সময় যেমন আসে, অমনি তাহার সঙ্গে হা হতোস্মি ও কাতরতা দেখা দেয়। সুতরাং দুঃখের সময়ও আমাদের হা হতোস্মি ও কাতরতায় কাটিয়া যায়। "সুখ হইল না" কেবল এই আক্ষেপেই ক্ষিপ্ত হইয়া কাল কাটাই। ভুলিয়া যাই ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বা তাঁহাকে স্মরণ করিতে। আবার সুখ পাইলেও তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া কেবল চেষ্টা করি তদপেক্ষা অধিক সুখ লাভ করিতে। তখনও ভুলিয়াও একবার ভাবি না তাঁহাকে, যাঁহার কৃপা কটাক্ষ ও ভ্রূভঙ্গিতে এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। অতএব কি সুখ কি দুঃখ সকল সময়েই সেই সর্ব্ব সুখাকর, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি ও প্রফুল্লান্তকরণে চিত্তার্পণ করিয়া জীবন যাপন করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারি না বলিয়াই আমরা চাহিয়াও সুখ পাইনা কিন্তু না চাহিয়াও দুঃখ পাইয়া থাকি।

এই যে সুখ দুঃখ আমরা ভোগ করি, ইহার দাতা কেহই নাই। স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম-ফলই সুখ দুঃখের হেতু। "অমুক ব্যক্তি হইতে আমি সুখী হইয়াছি বা অমুক ব্যক্তি হইতে আমি দুঃখ পাইতেছি" এরূপ মনে করাই কুবুদ্ধির কার্য্য।

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমিতি বৃথাভিমানং স্বকর্ম্ম সূত্রে গ্রথিতোহি লোকা॥

আবার "আমি অমুক ব্যক্তিকে সুখী করিয়াছি বা অমুক ব্যক্তিকে ক্লেশ প্রদান করিতেছি" ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রম। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে মোহ জন্মায়। মোহ বা মায়ায় জড়িত হইয়া যে সকল কর্ম্ম করা যায় সেই সকল কর্ম্মই হয় সুখ দুঃখের মূল কারণ। এই সুখ দুঃখের ভোগ দেহেরও নাই, জীবাত্মারও নাই। জীবাত্মা ছাড়িয়া দিলে পঞ্চভূতময় দেহ ত জড় পদার্থ মাত্র জ্ঞান চৈতন্য কিছুই থাকে না। তখন দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করাই হউক, অগ্নিতে দগ্ধ করাই হউক বা শৃগাল কুক্কুরাদিতে ভক্ষণই করুক, দেহ কিছুই জানিতে পারেনা। সুতরাং দেহের সুখ দুঃখ, উপকার অপকার কিছুই নাই। আত্মা শুদ্ধ, পূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দময়; আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আত্মা নির্লেপ, সুখ দুঃখ-হীন; দেহ বিচ্ছিন্ন হইলেও আত্মার কোন ক্ষতি বা অপকার

নাই। গৃহ দগ্ধ হইতে থাকিলেও গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশের যেমন কিছুই ক্ষতি হয় না, দেহ বিচ্ছেদেও দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মারও সেইরূপ কোন ক্ষতি হয় না। জীবাত্মা নির্লেপ তথাপি বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমীপে অবস্থিতি হেতু তত্তৎ পদার্থের সমগুণ সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন। যেমন নির্ম্মল স্ফটিক বর্ণ বিশিষ্ট কুসুমের সমীপে থাকিলে তত্তৎ পুষ্প সবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন বুদ্ধি অহঙ্কার জীবের সহকারী, আপনাদিগের কৃত কর্ম্মফল তাহারাই ভোগ করে। নির্লেপও অব্যয় আত্মা বা নশ্বর জড় পদার্থ এই দেহ কোন ফলই ভোগ করেন না। বৈষয়িক সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগই-মায়ার সংশ্রবে কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ জীবের সহকারী (মন বুদ্ধি অহঙ্কার) ভোগ করিয়া থাকে।

অতএব বৈষয়িক সুখ দুঃখের মোহও কাতরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু সঙ্গ ও বিদ্যাভ্যাস ফলে সঙ্গ-হীন (কর্তৃত্বাভিমান শূন্য) হইয়া পরমানন্দময় ভগবানের তত্ত্বকথা ও তাঁহার লীলা গুণাদি শ্রবণও কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরমানন্দ লাভ করিতে অভিলাষী হওয়া সর্ব্বতোভাবেই আমাদের কর্ত্তব্য। অমুক ব্যক্তি আমার উপকার করিয়াছে, অতএব তিনি আমার অনুরাগের পাত্র, আর অমুক ব্যক্তি আমার অপকার করিয়াছে. অতএব সে আমার বিদ্বেষের পাত্র, এইরূপ পৃথক না ভেদজ্ঞান নিতান্তই অজ্ঞান মূলক। সংসারে অনুরাগের পাত্রও কেহ নাই, বিদ্বেষের পাত্রও কেহ নাই; সকলকেই সমভাবে দেখা উচিত এবং ভাল মন্দ যখন যাহা ঘটে, সে সকলই কর্ম্মফলের গুণে ও দোষে অন্য কেহ তাহার কারণ নহে, ইহাই স্থির জানিয়া আপনাকে আপনি সাবধান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই অনুরাগও বিদ্বেষ জন্মায় না। এই অনুরাগ বিদ্বেষ-বিহীন অবস্থায় সুখ দুঃখ, স্তুতি নিন্দা, ইষ্ট অনিষ্ট, লাভ অলাভ, মান অপমান সকলই এক হইয়া যায় ও পরমানন্দের উদয় হয়।

অনুরাগ অনায়াস লব্ধ নহে কিন্তু দ্বেষ অনায়াস লব্ধ। গুরুউপদেশ অনুসারে দ্বেষকে পরিহার করিবার জন্য সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। দ্বেষই মনস্তাপের মূল, দ্বেষই সংসারের বন্ধন, দ্বেষই মুক্তির প্রতি বন্ধক। দ্বেষকে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে বৈষয়িক সুখের লালসাও মিটিবে না আর দুঃখও ঘুচিবে না। বৈষয়িক সুখ দুঃখের উপশম হইলেই অক্ষয় সুখ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ লাভ হইয়া থাকে। এই সচ্চিদানন্দকে লাভ

করিতে পারিলে অপর কিছুই দেহের ইচ্ছা বা কোন রকম সুখের লালসা থাকে না। অবিশ্রান্ত পূর্ণানন্দের উচ্ছ্বাসে তখন মন প্রাণ এত পুলকিত হয় যে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। অনুভব মাত্র হইয়া থাকে। এই অক্ষয় বা পূর্ণানন্দ অনুভবের নামই প্রেম। কারণ তখন দেহের প্রীতি ইচ্ছার প্রতি মোটেই প্রীতি থাকে না, কেবল আত্মার প্রীতি ইচ্ছাতেই মন প্রতিনিয়ত লগ্ন হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত ইচ্ছায় যে সুখ তাহার নাম কাম। এই কাম বা কামনা যত পরিমাণেই পূর্ণ হউক না কেন চিরকালই অপূর্ণ। পরিপূর্ণ কোন কালেই হয় না।

অতএব বৈষয়িক সুখ দুঃখে অভিভূত না হইয়া সর্ব্বসুখাকর ভগবানের ত্রিতাপ নিবারণকারী অতি সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে তৎপর হওয়াই সুখ, আর বিমুখ হওয়াই দুঃখ। দুঃখ করিতে হইলে ভগবদ্ভজনের প্রতিবন্ধকও কণ্টক স্বরূপ যে সমস্ত বিক্ষেপ সেই সমস্ত বিক্ষেপের জন্যই দুঃখ করা আমাদের উচিত। অন্যথা যে সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত পক্ষে, কোনই সম্বন্ধ বা সংস্রব নাই, সেই সমস্ত সুখ দুঃখের জন্য দিন রাত বৃথা চিন্তায় যাপন করা কেবল নিজ নিজ অনিষ্ট সাধন করা মাত্র। ইষ্ট সাধন ইহাতে কখনও কিছুমাত্রই হয় না। শুদ্ধ অশান্তি ও দৈহিক কষ্ট। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ ভজনকেই সুখ ও ভজনের বিঘ্ন সমূহকেই দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদেরই মানব জন্ম গ্রহণ করা সার্থক। তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত। অর্থাৎ বায়ু যেমন বহু দোষ ও গুণ মণ্ডিত গন্ধ প্রভৃতিতে মিশ্রিত হইয়াও আপনাকে বিশুদ্ধ রাখে; তাহারাও সেইরূপ সর্ব্বত্র নানা ধর্ম্মাক্রান্ত বিষয় মধ্যে থাকিয়াও কখন বিষয়ে আসক্ত হন না। অর্থাৎ বৈষয়িক সুখ দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও আত্মাকে দোষ গুণ হইতে তাঁহারা পৃথক রাখেন ও প্রকৃত সুখ যাহা, তাহা তাঁহারাই ভোগ করেন।

বৈষয়িক সুখ ভোগ অপেক্ষা দুঃখ ভোগ ভাল। বৈষয়িক সুখ অর্থ ব্যয় না করিলে ভোগ করিতে পারা যায় না এবং বৈষয়িক সুখ ভোগের স্পৃহাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না। সুতরাং ভোগ স্পৃহা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থের আবশ্যকতাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থের আবশ্যকতা পূর্ণ করিতে

হইলেই বিষয়ের ধ্যানে মনোনিবেশ করিতে হয়। বিষয়ের ধ্যান হইতে সঙ্গ, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সংমোহ প্রভৃতি পতনের পূর্ব্ব কারণ গুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিষয়াসক্ত জীব ক্রমশঃ শ্রীমদে অন্ধ হয়। অন্ধ হইলে ভাল মন্দ কিছুই দেখিতে পায় না, সুতরাং পতন শীঘ্র শীঘ্র নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। সৌভাগ্য ক্রমে শ্রীমদান্ধ জীব যদি কখন সুচিকিৎসক প্রাপ্ত হয় ও অন্ধতার প্রকৃত কারণ সরল অন্তঃকরণে চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করে, তাহা হইলে চিকিৎসক দয়া করিয়া দরিদ্রতার অঞ্জন চক্ষে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। শ্রীমদ-মত্তার ঐ অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিতে করিতে অর্থাৎ দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতে করিতে শ্রীমদান্ধতা রোগ সারিয়া যায়। রোগ সারিয়া গেলে রোগী সাবধান হয় ও সাবধান হইয়া, যে সকল পদার্থের ব্যবহারে রোগ জন্মায়, সে সকল পদার্থ আর কখনও ব্যবহার এমন কি স্পর্শও পর্য্যন্ত করে না। বলা বাহুল্য, ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহারা-ভাবে দুঃখ ভোগও তখন তাহার পক্ষে সুখকর বলিয়া বোধ হয়।

ভারত যুদ্ধাবসানের পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাগমনের অভিলাষে পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া যখন বলিয়াছিলেন। "পিসী মা! অজাত-শত্রু ধর্ম্মাবতার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অসাধারণ গুণে ও আপনাদের সৌভাগ্য বলেই আপনারা নানাবিধ ব্যসন, এই কুলক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ এবং সংপ্রতি দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভনাশরূপ মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন আপনারা সুখ স্বচ্ছন্দে এই হস্তিনানগরে বাস করিয়া, পরম আনন্দের সহিত কাল যাপন করুন। আমি দ্বারকায় গমন করিবার অভিলাষে আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আপনি প্রসন্ন বদনে আমায় দ্বারকা গমনের অনুমতি প্রদান করুন। পাণ্ডব জননী দেবী কুন্তী, কৃষ্ণকে বিদায় দিতে হইবে কৃষ্ণের নিকট হইতে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। চক্ষুদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাণরূপী কৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনার নিকট তাঁহার সেই অতুল সম্পদ, সুখ-স্বচ্ছন্দতাও সমৃদ্ধিশালী হস্তিনানগর অতি তুচ্ছ জনক বোধ হইতে লাগিল। নিজের দেহ মধ্যে তিনি যেন, ক্ষণে ক্ষণে প্রাণের অভাব হইতেছে বলিয়া, এক

একবার সংজ্ঞা হীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আবার কৃষ্ণের বাক্যের উত্তর প্রদান না করা গর্হিত বিবেচনা করিয়া তিনি অতি কষ্টে অশ্রুজল অম্বরে সম্বরণ পূর্ব্বক কাতর কণ্ঠে কহিলেন "বাপ কৃষ্ণ! তুমি আমাদের প্রাণ স্বরূপ। তোমার একটি নাম পাণ্ডবনাথ; কি বিপদে, কি সম্পদে তুমিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমরা জানিনা। বিবিধ প্রকার ব্যসন হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বা নিরুপদ্রবে অতুল সম্পত্তি ভোগ করা, সকলই তোমার কৃপায়। যুধিষ্ঠিরের গুণে বা আমাদের সৌভাগ্য বলে নহে। তুমি বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন ও অকিঞ্চন-গোচর। তোমাকে যাঁহারা আশ্রয় করিতে পারেন বা তুমি যাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান কর, তাঁহারা বিপদেও ব্যথিত হন না, সম্পদেও মুগ্ধ হন না। তাঁহারা কেবল তোমাতে পূর্ণ নির্ভর রাখিয়া, সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তোমার সুখে সুখী ও তোমার দুঃখে দুঃখী হইয়া, সততই পরমানন্দে কাল যাপন করেন। তাঁহাদের বিপদ সম্পদ ও সুখ দুঃখ তখন তোমার চিন্তার বিষয় হয়। কৃষ্ণ! তোমাকে যাঁহারা চিনিয়াছেন, প্রাণ সত্বেও তাঁহারা তোমার অদর্শন ক্ষণকালের জন্য সহ্য করিতে পারে না। তাঁহাদের পক্ষে তোমায় বিদায় দেওয়া আর দেহ হইতে প্রাণকে পরিত্যাগ করা একই কথা। অতএব বাপ! সামান্য ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া আমাদিগকে ভুলাইও না। আমরা ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ প্রার্থনা করি না। ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ লাভ হইলে জীবের তোমাকে স্মরণ হয় না, কিন্তু বিপদ ও দুঃখের সময় তোমায় স্মরণ হয় এবং কাতর কণ্ঠে তোমায় ডাকিতে থাকে। তুমিও তোমার ভক্তকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমত নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ প্রদান করিয়া থাক। কিন্তু তোমার ভক্তগণ তাহাতে বিমুগ্ধ না হইয়া পরমানন্দের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোমার স্মরণ করেন ও ডাকিতে থাকেন। তোমার ভক্ত-বৎসল নামের পরিচয় দিবার নিমিত্ত তুমি তোমার ভক্তগণের প্রাণের কাতরতা ও গগন ভেদী ডাকে থাকিতে পার না। ডাকিবা মাত্রই গমন করিয়া তাঁহাদের বিপদ মোচন ও দুঃখ নিবারণ করিয়া থাক। তাই তোমার নিকট আমার প্রার্থনা আমি সম্পদ ও সুখ চাই না। চাই নিরন্তর বিপদ ও দুঃখ। কৃষ্ণ! যাহারা তোমার মায়ায় মোহিত, তাহারাই বৈষয়িক সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া তোমার অসীম মহিমার বিষয় বিস্মৃত হয় ও

নিরন্তর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশত্রয় ভোগ করিতে থাকে এবং শিব বিরিঞ্চি সেবিত তোমার অভয় চরণ লাভে বঞ্চিত হইয়া জন্ম মরণরূপ সংসার নিবারণে কোন কালেই সমর্থ হয় না। অতএব কৃষ্ণ। তোমার অঘটন-ঘটন পটিয়সী মায়ায় বিমোহিত রাখিয়া তুমি গমন করিও না। যদি একান্তই তুমি গমন করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে, আত্মীয়, পাণ্ডবগণের প্রতি যাদবদিগের প্রতি যে আমার স্নেহাতিশয়, অগ্রে তাহা খণ্ডণ কর, কারণ মায়াই আমার এই ব্যাকুলতার কারণ। তুমি আমার মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া দাও, তাহা হইলে আর আমার কোন দুঃখই থাকিবে না। বাপ কৃষ্ণ! আমি স্ত্রীজাতি হইয়া অধিক আর কি বলিব। তবে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমার দর্শন লাভ করিতে পারিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। কৃষ্ণ! তোমা ছাড়া হইয়া কোন প্রকার সুখ লাভ করা অপেক্ষা তোমার ভব-ভয় নিবারণ কারী শ্রীমূর্ত্তী দর্শন করিতে করিতে ও তোমায় "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ"। বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ঘোরতর দুঃখে নিমগ্ন হওয়াও সহস্র গুণে ভাল, অতএব, এতদিন ধরিয়া যে সুখ সম্পদ দেখাইয়া তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, সে সুখ সম্পদ আমরা চাহ না। চাই কেবল সেইসকল দুঃখ ও বিপদ; যে সকল দুঃখ ও বিপদ হইতে তুমি নিরন্তর আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ।"

সুখ অপেক্ষা দুঃখ ভাল, এই জ্ঞান হইল অতীব উচ্চ স্থানীয়। এই উচ্চ জ্ঞান লাভের অধিকার, জ্ঞানদাতা গুরুর কৃপা ব্যতীত, কাহারও জন্মায় না। যাঁহারা এই উচ্চ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাস বলে অগ্রে দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হইতে হয় এবং দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে সুখ দুঃখের বিচার করিয়া বুঝিতে হয় যে, দুঃখ না করিলে কখনও সুখ হয় না। দুঃখই হইল সুখের মূল। যেমন বৃক্ষ বা লতার মূলই হইতেছে পত্র, ফুল ও ফলোৎপাদনের একমাত্র মূল। পত্র, পুষ্প বা ফলে বারি সেচন করিয়া, বৃক্ষ বা লতার মূল নষ্ট করিয়া ফেলিলে যেমন বৃক্ষ বা লতা মরিয়া যায় ও পত্র পুষ্প, ফলের আশায় এক কালে নিরাশ হইতে হয়, শুদ্ধ সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু সুখই চাই, দুঃখ চাই না, বলিয়া দুঃখকে উপেক্ষা করিলেও সেই রূপ সুখের আশায় বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব, সুখের মূল স্বরূপ দুঃখকে ঘৃণা বা

উপেক্ষা না করিয়া, সমাদরে গ্রহণ করা ও অব্যথিত চিত্তে ভালবাসাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। কারণ পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গলের জন্ত কিছুই বিধান করেন নাই। আমরা কেবল আমাদের আপন আপন কর্ম্ম-বিপাক বশতঃ তাহা বুঝিতে না পারিয়াই সুখ দুঃখ অনুভব ও তজ্জন্য হর্ষ বিষাদ প্রকাশ করিয়া থাকি। পরন্তু এ সুখ দুঃখ, দিন রাত্রির ন্যায়, প্রাণীগণের পক্ষে যে অপরিহার্য্য ও অনতিক্রমণীয় তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীভূপতি চরণ বসু।

সমালোচনা।

——:*:——

তপোবন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দাসগুপ্ত প্রণীত, এবং ১৬৭নং রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া হইতে শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ রায়, এম, এস, সি, বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানি আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদিও ইহা একখানি পদ্য গ্রন্থ তথাপি এ সম্বন্ধে আমরা দু'একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। গ্রন্থকার নিজে বেশ ভাবুক কবি। তিনি নিজের মনগড়া কথা ইহাতে দেন নাই। নানা ভাবের প্রবন্ধাদি ও নানা প্রকার উপদেশপূর্ণ গল্প হইতে ইনি নিজের ভাবমত ভাষায় সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে মোট ৯ নয়টী বিষয়, পদ্যেতেই প্রকাশ হইয়াছে। আমরা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। গ্রন্থকার যেরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন এক্ষণে এই উপন্যাস-মগ্ন, আষাঢ়ে গল্পাস্বাদী পাঠক মহলে তাহা ধারণা করিতে পারিলেই গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইবে মনে করি।

সত্যের খাতিরে আমরা আর একটু অনুযোগ গ্রন্থকারকে করিতে বাধ্য হইলাম। এ সংস্করণে বর্ণাশুদ্ধি এবং ছাপার গোলযোগ বিশেষরূপ পরিদৃষ্ট হইল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইবে। লেখকের ভাব স্থানে স্থানে ভাষার সঙ্গে বড়ই মধুর ভাবে ফুটিয়াছে; যেখানে লেখক

"ব্রজের সতী" প্রবন্ধে শ্রীমতী রাধিকার সহস্র ছিদ্র কলসিতে যমুনার জল আনিতে যাওয়া বর্ণন করিতেছেন তাহার একটী স্থানে লিখিয়াছেন :—

"ভাবেতে বিভোরা আপনা পাশরা
শ্রীমতী চলিছে ভঙ্গে।
মরাল গামিনী চলে রাই ধনী
চলিয়া ভাব তরঙ্গে॥
পাতায় পাতায় হেরে শ্যাম রায়
হেরিছে সূর্য্যে চন্দ্রে।
হেরে গ্রহ মাঝে উপগ্রহে রাজে
হেরিছে সুদূর মন্ত্রে॥
হেরে জল স্থল শ্রীকৃষ্ণ কেবল
র'য়েছে সকল ব্যাপি।
অনু পরমাণু সব মাঝে কানু
র'য়েছে বিশ্ব ঢাকি॥
হেরে,—গিরি কন্দর হিমাদ্রী শিখর
হিমানী-বিটপী থরে।
ভূধর খেচর যত জল চর
সকলই কৃষ্ণ হেরে॥
আপন কক্ষে মধুর চক্ষে
শ্রীমতী চাহিয়া দেখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কেবল
কৃষ্ণ মদিরা চোখে॥"

এইরূপ অনেকই গ্রন্থ খানিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সাধারণকে একবার গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হাওড়া উপনিষদ্ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ-রহস্য।

(লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র, উকীল।)

"কেলে-সোণা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী।"

কে বলে কেশবে কালো কালোর ভিতরে আলো
ভালো ক'রে দেখিলেই হয় পরিচয়।
শ্রীরাধার কালোসোণা কালো কভু নয়॥

জগতের নানা বর্ণ যাঁহা হ'তে সমুৎপন্ন
সে কিরে কখন হয় অসিত-বরণ।
ভালো ক'রে দেখ শ্যাম কষিত-কাঞ্চন॥

প্রভাকর সুধাকর যাঁহা হ'তে পায় কর
ময়ূর মোহিনী মূর্ত্তি পায় যাঁহা হ'তে।
সে কিরে মসীর বর্ণ? পারে কি হইতে?

দ্বাপরে লীলার তরে ভিন্ন করি হ্লাদিনীরে
হারাইয়া আপনার হেমাঙ্গ-কিরণ।
নির্ব্বাণ অঙ্গার প্রায় ধরিলা বরণ॥

কিন্তু সেই সাজা সাজে সে কি ভুলে? যেই বুঝে,
তাই রাখে' রাধারাণী "কেলেসোণা" নাম।
সোণাই মনের কথা, কালো শুধু ভাণ॥

চরিত অমৃত যাঁর তিতা কেন নামে তার?
সেইরূপ কৃষ্ণ নাম, নাম মাত্র সার।
কালো কভু নন্ প্রাণধন শ্রীরাধার॥

কোন্ অন্ধ শিল্পকরে হেন হেমকান্তিধরে
প্রস্তরে গঠন করে তিমির-বরণ ?
সোণা কি ছিলনা দেশে, সেকালে তখন ?
সোণায় গড়িয়া আগে তাহার উপরি ভাগে
মরকত আচ্ছাদন কেন না সে করে ?
তাইত বলিতে হয় আঁখি-হীন তারে !
সে কিরে গৌরাঙ্গ রূপ শ্রীকৃষ্ণের যা' স্বরূপ
হেরে নাই, শুনে নাই কখন জীবনে ?
রসরাজে কেন গড়ে অরসিক জনে ?
পাষাণে কি প্রেম ঝরে, সোণায় করুণা !
পাষাণে অথবা স্বর্ণে শ্রীমূর্ত্তি হবেনা !
না, না, যদি না হইবে পাষাণ-নন্দিনী তবে
কেন খ্যাত হবে বিশ্বে জননী আখ্যায় ?
পাষাণের বারিধারা ভুবন বাঁচায় ?
স্বর্ণেও দয়ার কার্য্য সাধে অবনীতে !
শিল্পিবর ! গড় মূর্ত্তি, দোষ নাই তা'তে ॥
কিন্তু শিল্পি ! আর তুমি তামস-বরণে ।
দেখা'ওনা কৃষ্ণে এই স্বর্ণ বঙ্গভূমে ॥
এদেশে সকলে জানে কৃষ্ণ কালো নয় ।
দ্বাপরের আবিলতা মাত্র সেই হয় ॥
অথবা মায়ের স্নেহে ধূলা-কাদা মাখি ।
থাকিতেন লীলাময় স্ব-স্বরূপ ঢাকি ॥
মাতৃ-স্নেহ-পাশ যবে টুটিলা গোসাঁই ।
লুকানো প্রকৃত বর্ণ ব্যক্ত হ'ল ভাই !
বাঁশী নাই বেত্র নাই কমণ্ডলু হাতে ।
পীত পট্ট-ধটি নাই কৌপীন কটিতে ॥
চপলতা নাই শান্ত গম্ভীর পণ্ডিত ।
সাধুরূপে সাধিছেন জগতের হিত ॥

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণরূপে কাঙ্গালী হইয়া।
যশোদার দুলালিয়া ফিরেন ভ্রমিয়া॥
ধেনু গোপ গোপী সঙ্গ ত্যজিয়া এবার।
শাস্ত্র ছাত্র ভক্ত সঙ্গে সতত বিহার॥
স্বর্ণ নাই স্মরণ শ্রীরাধাদামোদর।
রথ নাই পথে এবে ধূলায় ধূসর॥
শ্রীরাস-মণ্ডল নাই শ্রীবাস-অঙ্গন।
গোপীসহ নৃত্য নাই কীর্ত্তনে নর্ত্তন॥
জীব-দুঃখে দুঃখী বিশ্বপ্রেমে মাতোয়াল।
রাজার দুলাল আজ পথের কাঙ্গাল॥

আমার সাধু-দর্শন। (৪)

এতদিন আমরা মহাপুরুষের নিকট যে সমস্ত উপদেশ শুনিতে পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই, কারণ সে সকল কথা একটু গোপনীয় অর্থাৎ সে সমস্ত ভজনের কথা সাধারণে প্রকাশ। করিতে মহাপুরুষেরই নিষেধ ছিল। আজ যে বিষয়টী লইয়া পাঠকগণের নিকট, উপস্থিত, উহা জনৈক ইংরাজি শিক্ষিত অথচ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিও নিতান্ত অনাস্থাবান নয় এরূপ কোন ব্যক্তির সঙ্গে মহাপুরুষের কথোপকথন হইতে গৃহিত। আমরা যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত বক্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম, পাঠকগণ আস্বাদন করুন।

অন্যান্য দিনও আমরা যেমন যাই আজও তেমনি ভাবে সন্ধ্যার পর মহাপুরুষের নিকট যাইয়া দেখি, আমাদের অপরিচিত জনৈক বাবু (পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি, ইঁহার নাম নটবর ঘোষ ইনি বি, এ পাশ করিয়া স্কুলে মাষ্টারি করেন) মহাপুরুষের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। একটু বসিয়া ইঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। নানা কথার পর ইনি প্রশ্ন করিলেন। "মহাশয়!

আপনারা তো শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মকে খুব উদার ও সার্ব্বজনীন বলিয়া প্রচার করেন ; কিন্তু শিক্ষিত সমাজ উহার প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাবান নয় কেন ? জাতিভেদ প্রথাই কি ইহার কারণ ?

মহা।—আমার বক্তব্যের পূর্ব্বে আপনি বলুন শিক্ষিত সমাজ বলিতে আপনি কাহাদের বুঝেন ? যেন তেন প্রকারে বস্তা দুই পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া দু'চারটা উপাধি লইয়া বিদ্যালয়ের গণ্ডি হইতে বাহির হইতে পারিলে তাহাকেই কি আপনি যথার্থ শিক্ষিত বলিয়া মনে করেন ? রাগ করিবেন না, আমি বলিতে চাইনা যে ওসব চাইনা, তবে আমার বক্তব্য এই যে, শুধু পুস্তক পড়িয়া বা খেতাব লাভ করিয়াই মানুষ যথার্থ জ্ঞানবান হয় না। সৎ শিক্ষাদ্বারা সৎভাবে নিজের জীবন পরিচালনা করিতে হইবে এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে, যে আদর্শ যথার্থই মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আনিয়া দিতে পারে। তারপর বলি শুনুন, এইভাবে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন বা হইতেছেন তাঁহারা কখনও বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্থল প্রাণেরপ্রাণ প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রদর্শিত মতকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারেন না। আর আপনি যে জাতিভেদ প্রথার কথা বলিলেন তদুত্তরে বলি, বৈষ্ণবধর্ম্ম জন্মমূলক জাতির গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। তাঁহাদের জাতিভেদের মাপ কাঠি শাস্ত্রকারগণ এইভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ।
হরিভক্তি বিহিনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধম॥"

যিনি ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ, বৈষ্ণবধর্ম্ম তাঁহাকেই সাদরে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন।

প্রশ্ন—আচ্ছা, এই ভগবদ্ভক্তি বলিতে কি আপনারা কেবলমাত্র কৃষ্ণে ভক্তি করাই বলেন, না কালী, দুর্গা, শিব, রাম প্রভৃতি যে কোন দেবতার ভক্তি করিলেই হয় ?

মহা।—এটী বড় শক্ত কথা। বৈষ্ণবগণ কোন দেবতাকেই অশ্রদ্ধা করেন না। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের কথা জানেন তো ? সে যেমন নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন কিছুই জানিতনা, অথচ সে যেমন বলিয়াছিল—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদ পরমাত্মনি
তথাপি মমসর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচন ॥"

সেইরূপ বৈষ্ণবগণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই শাস্ত্র-বাক্য ধরিয়া, প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস যাহা কিছু বলেন সমস্ত কৃষ্ণের উপর রাখিয়া অন্যান্য দেব দেবীকে তাঁহারই বিলাস বা অংশ বা কলা প্রভৃতি রূপে জানেন। তবে আপনি যেভাবে বলিতেছেন সে ভাবের লোকও যে নাই তাহা নহে। সে ভাবের লোক বৈষ্ণবসমাজ মধ্যেও যেমন পাইবেন, অন্যান্য সমাজেও তদপেক্ষা বেশী ছাড়া কম পাইবেন না। অনেক এমন শাক্ত আছেন যাঁহারা গৌরাঙ্গ না বলিয়া "শচী পিসির ছেলে" বা কৃষ্ণ না বলিয়া "নন্দ ঘোষের বেটা" ইত্যাদি নানা প্রকার কথা বলেন, অবশ্য সেরূপ করা কোন সম্প্রদায়েরই উচিত বলিয়া মনে হয় না।

প্রশ্ন।—একথা আমি অন্য সময় শুনিব, কারণ ইহার মধ্যে আমার অনেক বলিবার আছে। আমি এক্ষণে এ বিষয়টী বন্ধ রাখিয়া পূর্ব্বে যে কথা হইতেছিল তাহাই শুনিতে চাই, দয়া করিয়া বলিবেন কি?

মহা।—নিঃসঙ্কোচে আপনি বলিতে পারেন, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যাহা শিক্ষা করিয়াছি এবং যতদূর সাধ্য, আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রশ্ন।—তাহা হইলে কি আপনি বলিতে চান্, মহাপ্রভু আচণ্ডাল আদি করিয়া যে কেউ ভগবদ্‌ভক্ত হইবেন তাঁহাদের সকলকে লইয়াই একত্র পান ভোজনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন?

মহা।—তাহা কেন? আপনার করিয়া লইলেই যে তাঁহার সহিত একত্র পান ভোজনাদি করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। মহাপ্রভু এরূপভাবে আচণ্ডাল আদি করিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজে আচরণ করিয়াও দেখাইয়াছেন সত্য কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে তিনি নিজেও যেমন কখনও বিধি লঙ্ঘন করেন নাই অপরকেও তেমন কখনও লঙ্ঘন করিতে উপদেশ দেন নাই। আপনি মহাপ্রভুর জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন তিনি নিজে কখনও ব্রাহ্মণ—শুধু ব্রাহ্মণ নয়, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের গৃহে ভোজন পর্য্যন্ত করেন নাই।

প্রশ্ন।—বলেন কি? মহাপ্রভু নিজেও কি এইভাবেই চলিয়াছেন?

মহা।—নিশ্চয়, একে একে বলিতেছি শুনুন—

সন্ন্যাসী অবস্থায় মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন সে সময় নবদ্বীপবাসী শ্রীনিবাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভক্তগণই মহাপ্রভুকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা* করাইয়াছিলেন। যথা চরিতামৃত মধ্য খণ্ডে ৩য় পরিচ্ছেদে—

"শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন॥"

তারপর মহাপ্রভু যখন প্রয়াগ-তীর্থে গিয়াছিলেন সে সময়ও ব্রাহ্মণের গৃহেই তাঁহার আহারাদি হইয়াছিল যথা—

"দাক্ষিণাত্য বিপ্রসহ আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়।" চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পঃ

আবার শরৎকালে যখন শ্রীবৃন্দাবন গমন বাসনা করেন তখনও রামানন্দ এবং স্বরূপের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই বলিয়াছিলেন—

"উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।†
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলু বিপ্র একজন॥ চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ পঃ

কাশীধামে তপনমিশ্রের বাড়ীতে দেখিতে পাই বলভদ্র ভট্টাচার্য্যই পাক করিয়া প্রভুকে সেবা করাইয়াছিলেন—

"প্রভুর নিমন্ত্রণ করি গৃহে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করাইল॥" চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ পঃ

কত বলিব, যেখানে দেখিবেন সেইখানেই মহাপ্রভুর নিজ জীবন অতি নির্ম্মল ভাবে দেখিতে পাইবেন। যে সকল বিষয়ে কেহ কোনরূপ কটাক্ষ করিতে

---

* সন্ন্যাসীর ভোজনকে ভিক্ষা বলা হয়। (লেখক)

† কেবল ব্রাহ্মণ হইলেই হইবেনা, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার যাঁহার অন্ন ভোজন করা যায় তাহাকেই ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ বলে। তাহা হইলেই দেখা যায়, মহাপ্রভু এ সকল বিষয় কতদূর বিবেচনা করিয়া চলিয়াছেন। (লেখক)

পারে বা ভবিষ্যতে কোন প্রকার গোলযোগ হইতে পারে, অন্তর্য্যামী প্রভু আমার সে সকল বিষয় কতদূর সাবধান হইয়া চলিয়াছেন তাহা আর বলিবার নয়। যে রামানন্দ রায়কে মহাপ্রভু আপনার রসরাজ মহাভাব, অন্তঃ কৃষ্ণ ও বহির্গৌর মুর্ত্তি দেখাইয়া ছিলেন, যে রামানন্দের সহিত গোদাবরী তীরে বসিয়া কতগুপ্ত-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন সেই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তশ্রেষ্ঠ রামানন্দের সঙ্গে বা তাঁহার গৃহেও কখন মহাপ্রভু ভোজন করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু রামানন্দের সহিত তত্ত্বালোচনা করিতেছেন—

"হেন কালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
* * *
নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিয়া॥
* * *
প্রভু যাই সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৮মপঃ

যেখানে ব্রাহ্মণ নাই সেখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ থাকিতেন তিনিই যাইয়া রন্ধন কার্য্য করিতেন যথা :—

যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
* * *

কত বলিব, অনন্ত মহাসমুদ্র তুল্য শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার দু'একটী বিন্দুমাত্র বলিলাম, আপনি যদি এসববিষয় মহাজনগণের প্রণীত গ্রন্থরত্ন অন্বেষণ করিয়া দেখেন তাহা হইলে অফুরন্ত প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

প্রশ্ন।—আচ্ছা, তবে কি বৈদিক আচার ব্যাবহারের বাহুল্য দেখিয়াই বৈষ্ণবগণের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের এভাব আসে?

মহা—তাই বা কেমন করিয়া বলি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সব আচার ব্যবহার যে সব সাধন ভজনের কঠোর নিয়মকানুন ছিল, আমাদের দয়াল প্রভুতো তাহারও অনেক সঙ্ক্ষেপ করিয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছেন ;—

"দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে।"

ভগবদুপাসনার জন্য কেবল ভক্তিরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। তবে ব্যভিচার যে কিছু কিছু সমাজে প্রবেশ করে নাই সে কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি না। অনেক কপটী আবার সেই ব্যভিচারকেই ঠিক বলিয়া প্রচার করিয়া অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত জনগণকে নিজ সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লইতেছে। তবে সে সব ব্যভিচার-দুষ্ট পথ শিক্ষিত সমাজ অনায়াসেই দূর করিয়া লইতে পারেন। সে সব সামান্য সামান্য ব্যভিচার-বিভীষিকা দর্শনে তাঁহারা বীতশ্রদ্ধ নয়।

প্রশ্ন।—তবে আর কি এমন কারণ থাকিতে পারে যাহার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণ বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান নয়।

মহা।—আছে বৈ কি, আপনিই ভাবিয়া দেখুন যে সব কথা আপনি বলিলেন তাহা ছাড়া এমন কোন বিশেষত্ব বৈষ্ণবগণের মধ্যে দেখিতে পান কি না?

প্রশ্ন।—আরতো দেখিবার মধ্যে দেখি এক বৈষ্ণবগণ নিরামিষ আহার করেন ও মালা তিলক ধারণ করেন। ইহাই কি কারণ?

মহা।—কতকটা বটে। আধুনিক নব্য-সম্প্রদায় আহারের সঙ্গে যে ধর্ম্মের কোন সংশ্রব আছে তাহা আদৌ স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা সাধারণতঃ বলেন—"আহারের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয় না। যাঁহার যেমন রুচি তিনি তেমন সামগ্রীই আহার করিতে পারেন।" এই মতের পোষকতায় তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম প্রভৃতি দেশী বিদেশী কয়েকটী ধর্ম্মের নাম করেন এবং বলেন এ সকল ধর্ম্মে জীব হিংসা করিতে এবং মৎস্য মাংস ভোজনের কোনরূপ নিষেধ করেন নাই। আমি নিজের কথা বলিতে চাইনা শাস্ত্র বাক্য, ঋষি বাক্য দ্বারাই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, জীব হিংসা বা মৎস্য মাংস আহার করাটা আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল কিম্বা জীবহিংসা না করা বা নিরামিষ ভোজনই আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল। এক্ষণে ভোজন সম্বন্ধে বলি, তারপর মালা তিলক সম্বন্ধে বলিব।

প্রশ্ন।—একটী নিবেদন জানাইয়া রাখি। আমরা হিন্দু, আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ আছে তাহাই বলুন, বাহিরের কথা শুনিতে

চাইনা, আপনাদের আশীর্ব্বাদে দশ বৎসর বয়স হইতে সে সব অনেক ঘাটাঘাটি করিয়া দেখিয়াছি।

মহা।—ভয় নাই, আমি আমাদের কথাই বলিব। প্রথমে জীব হিংসার মূল কোথা হইতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিল তাহা দেখুন। মনু বলিতেছেন—

"প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্ ॥৫।২৮

অর্থাৎ ভগবান মানবের ভোজনার্থে স্থাবরজঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণিরই ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু এখানে ভাবিবার কথা এই যে, সে ব্যবস্থা কোন সময়ের জন্য। বুঝিতে হইবে, যখন মানুষ কৃষিকার্য্য দ্বারা নানাবিধ দ্রব্যোৎপাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ তখনকার জন্য। কিন্তু যখন মানুষ নিজ নিজ শক্তিবলে কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা নানাবিধ ভোজ্য-দ্রব্য উৎপাদনে সমর্থ হইল তখনও যে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় জীব হিংসা দ্বারা উদর পরিপুরণ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। কাজেই সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আপনা হইতে তাহাদের মনে ধারণা জন্মিল যে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণিরই হিংসা করিতে নাই। তারপর আর একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিল "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" অর্থাৎ মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই হইল অহিংসা। কিন্তু এত করিয়াও দুর্ব্বার প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারিল না তখন আর কি করে, জীব হিংসার অনুকূলেই মত দিল কিন্তু তাহার ভিতরেও একটু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ব্যবস্থা দিল।—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥

মনু—৫।৩৯।

অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে পশু বধ করিলে তাহা অবধ বলিয়াই গণ্য হইবে। তা বলিয়া এইরূপ অবধ ভাবে জীব হিংসা প্রচলনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য,—ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সাত্তিক ভাবে আনয়ন করা। তারপরেই আবার শাস্ত্র বলিয়াদিলেন—

"বৈধ হিংসা ন কর্ত্তব্যা বৈধ হিংসা তু রাজসী।
সাত্বিক জপ যজ্ঞাদ্যৈ নৈর্বেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ ॥"

অর্থাৎ বৈধ হিংসাও সাত্ত্বিক নয় উহাও রাজসীক, সাত্ত্বিক হচ্চে জপ যজ্ঞ এবং নিরামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভগবদর্চ্চনা। পদ্মপুরাণে দেবী নিজে বলিয়াছেন—

"মদর্থে শিবকুর্ব্বন্তি তামসাঃ পশু ঘাতনম্।

আকল্পকোটীনিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ আমার জন্য জীবহিংসা করিলে কোটীকল্প পর্য্যন্ত নরকে বাস হয়।

প্রশ্ন।—আপনার কথা শুনিয়া আর যে কোন কিছু বলিব এমন মনে হয় না। দেখুন একটা কথা বলি, যখন শাস্ত্রে এত নিষেধ করিয়াছেন তখন কেন লোক ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পাপের বোঝাবৃদ্ধি করে?

মহা।—এইটাইত মজার কথা। এই যে কেন করে, এর উত্তর তারাও দিতে পারেনা। তারা মুখে বলে মাকে দিলাম কিন্তু তা'কৈ? মাকে দিবার আগে হইতেই যে নিজের জোগার করিয়া রাখে। হয়তো রাত্রে দ্বিপ্রহরে কালী পূজা হইবে তখন ছাগ বলি দেওয়া হইবে কিন্তু বেলাবেলিই সেই মাংস রন্ধন করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখে। কেন বাপু, যদি এতই মার প্রসাদে ভক্তি, তবে আবার রান্নাবাড়া কেন? মাকেও যেমন নখ চুল ছাল সমেত দিলে, নিজেও তেমনটী করিয়াই প্রসাদ পাওনা দেখি? মায়ের বেলা কাঁচা মাংস আর নিজের বেলা গরম মসলা ঘি ছোলা প্রভৃতি দিয়া সিদ্ধ করা। এ যে কতদূর জিহ্বা-লাম্পট্য তাহা ভাবিয়া দেখিলে সহজেই বোঝা যায়। যিনি জগজ্জননী জগৎপালয়িত্রী তিনি কি ছাগ মেষ খাইবার জন্য বসিয়া আছেন? ভক্ত রামপ্রসাদের গান আছে না?

মন তোমার এ ভ্রম গেল না।

ত্রিভুবন খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা

কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয় (দিয়ে) আতপচাল আর ছাগলছানা॥"

আসল কথা হ'চ্চে কি জানেন? মা বলি চান্ বটে, কিন্তু তিনি ছাগল মেষ মহিষ বলি চান্ না, তিনি চান্ আত্মবলি, তিনি চান্ রিপুবলি, উদ্দাম প্রবৃত্তি সমূহের বলি পাইবার জন্যই তিনি ব্যগ্র, নতুবা আত্মোদর পরিপূরণের জন্য দেবোদ্দেশ্যে পশু হিংসা কখনও শাস্ত্র সম্মত নয়। এই বলিয়া মহা-পুরুষ তাঁহার প্রিয় শিষ্য প্রেমানন্দকে বলিলেন "প্রেমানন্দ! সেই বলিদানের

গানটা গাও তো?" মহাপুরুষের আদেশে একতারা সংযোগে প্রেমানন্দ প্রেম-গদ গদ কণ্ঠে গাহিলেন,—

"মন তুমিরে কেমন ক'রে পাঁটা কাট জয় মা ব'লে।
মা কি তোমার কেনা বাঁধা সে কি মায়ের নয়রে ছেলে ॥
নিজের ছেলে ফুট্‌লে কাঁটা, শেলের মত বাজে সেটা
মায়ের ছেলে পাঁটা কাঁটা মায়ের প্রাণে সয় কি করে ॥
মনে কর মাংস লোভে, বিশ্বমাতা ভুলে যাবে
রাক্ষসী নয় মাতো তোমার (যে) ছেলে খাবে খিদে পেলে ॥
সে যে ডাকে ছাগল ছানা, তার মানে কি নাইরে জানা
মাকে ডেকে করে মানা বুঝনারে বুদ্ধি ভুলে ॥
মায়ের নামে পাঁটামারা, মনকে কেবল চক্ষু ঠারা
মাকে ভাব আপনপারা লোভের পাপে ডুবে ম'লে ॥
না বুঝিলে শাস্ত্রমর্ম্ম, না বুঝিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম
ধর্ম্ম ব'লে এ কি কর্ম্ম অধমেরে করাইলে ॥

গান শেষ হইলে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই আর একটী গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, মহাপুরুষের আদেশে প্রেমানন্দ আবার গাহিলেন,—

বলির কথা কি আর বলি।
বলি নয় কখনও পশু বলি ॥
পূজার তরে মায়ের কাছে রয় যে পূজার দ্রব্যাবলি।
মধুর কথায় ভক্তজনে তাকেই কিন্তু বলে বলি ॥
ফল ফুল জল দিয়ে মাকে রই যে মোরা কুতুহলি।
সেতো কেবল শিখ্‌তে ক্রমে স্বার্থ দিতে জলাঞ্জলি ॥
দিতে দিতে হৃদয় দানে পড়্‌'ব যবে পদে ঢলি।
বলি তখন পূর্ণ হবে হিংসাতে না মর্‌ব জ্বলি ॥
মেষ মহিষ ছাগ বলি বাক্যে বলি রিপু দলি
কাজে দেখি উদর দেবের পূজার তরে ঢলাঢলি ॥
কেউবা কালী খাড়া করি কসাই সাজে এমনি ছলি।
খাতিরে কেউ চালাই বলি আস্‌লে বাড়ী কুটুম কলি ॥

বলির তত্ত্ব এটাও বলি তমোগুণে যারা বলি।
তারাই খাঁটী বলি ভক্ত তাইতে সদা সামলে চলি॥

গান শেষ হইলে মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া যে বাবুটীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন তাহাকে বলিলেন, "মহাশয়? ব্যাপার বুঝ্‌লেনতো?"

প্রশ্ন।—আজ্ঞে, এ যে একেবারে বুঝ্‌বার চুড়ান্ত হইল, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করিবনা। আবার সময় মত আসিয়া প্রাণের কথা জানাব। এক্ষণে যেগুলি শুনিলাম, সেগুলি হৃদয়ে ধারণা করি। এই বলিয়া বাবুটী মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে একে একে সকলেই চলিয়া গেল, আমরাও মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে রামদাস বাবাজী।

শ্রীধাম নবদ্বীপের রাধারমণবাগের বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি মহাশয়ের নাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত ও নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেছি। ইনি মহাত্মা শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজি মহারাজের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিক গৌরভক্ত। একবার যিনি ইঁহার শ্রীমুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই ইহার গুণপনাও প্রেমভক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। হরিনামের মোহিনী শক্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তথাপি ভক্তমুখে যেন আরও সুমধুর বলিয়া মনে হয়। একদিন আমি কেবল দুই ঘণ্টা মাত্র বাবাজি মহাশয়ের মুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়াছি কিন্তু এখনও যেন সেই নাম সেই ভাব সেই সুমধুর স্বর হৃদয়ে জাগিয়া আছে। আমরা স্বর-তান সমন্বিত মূল্যবান সঙ্কীর্ত্তন অনেকবার শুনিয়াছি। বোধ হয় দুর্ভাগ্য ক্রমেই এইরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ লাভে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। বাবাজি মহাশয়ের নাম সঙ্কীর্ত্তনে যেন অমৃত-বাহিনী ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়া, মাদৃশ তার্কিক জনের চিত্ত-মরুভূমিরও

সরলতা সম্পাদন করে। চৈতন্য-রস-বিগ্রহ নাম-চিন্তামণি কীর্ত্তনকালে শ্রীচৈতন্যদেব যেন তাঁহার সম্প্রদায় মধ্যে আবির্ভূত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের শ্রোত্রমন পরতৃপ্ত করেন। হৃদয়ের বদ্ধমূল কলিকল্মস যেন সিংহ বিত্রস্ত মৃগের ন্যায় পলায়ন করে। হরিনাম ভক্তের প্রাণ, জ্ঞানীর জ্ঞান, সংসার দাবদগ্ধ মরুমৃগের শান্তি নিকেতন এবং বিষয়ীজনের শ্রোত্রমন পরিতৃপ্তিকর পরম বিষয়। শৈব শাক্ত গাণপত্যাদি নানামতাবলম্বী হিন্দু সমাজের মধ্যে কাহারও ইহাতে মতদ্বৈধ দেখা যায়না। সামান্য মানবের কথা কি, নামে পশুপক্ষী পর্য্যন্তও আকৃষ্ট হয়। এই নামের ভিতর যে কি প্রকার অচিন্ত্য ঐশীশক্তি খেলা করিতেছে, তাহা দেবাদিদেবেরও বর্ণনাতীত। বাবাজি মহাশয়ের নাম সংকীর্ত্তনের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার হৃদয়ে কোনও কপটতা নাই কাযেই তাঁহার নামে হরিরও মন হরণ হয়। কেননা তিনি নামের প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। হরিনাম পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বদ্ধমূল রোগাদির ব্রহ্মাস্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপদেশ-রত্নরাশির মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট রত্ন। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মচর্য্য আত্মসংযম বা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি কঠোরব্রত তপস্যাদি দ্বারা যাহা লাভ করেন, ভক্তগণ কাতর কণ্ঠে, "কৃষ্ণ হে মধুসূদন প্রভো রক্ষ মাং" এই বলিয়া একবার মাত্র ডাকিয়াই তাঁহারা, কৃপাময় শ্রীহরির পাতক-পর্ব্বত-ভেদিনী আনন্দ-নির্ঝরণী অমৃতময়ী কৃপাকণার অধিকারী হন। নাম দয়ার সাগর ও চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির মূল কারণ, এক নামের প্রভাবেই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, যমের যমত্ব ও ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, এমন কি কেবল মূর্ত্তি মাত্র ভেদ মহাদেবও নামে মাতোয়ারা, মুনিগণ চিরতপস্বী। অনন্তশক্তি শ্রীহরির সমস্ত ঐশীশক্তিগুলিই জলদ-জাল বিজড়িত তড়িতের ন্যায় ঐ নাম মহামন্ত্রের অন্তর্নিহিত থাকিয়া ভক্ত হৃদয়স্থ বাসনা রূপ দুর্ব্বৃত্ত দানব কুল নির্ম্মূল করত চিরানন্দ দানে পরিতৃপ্ত করেন। নাম উচ্চারিত হইবা মাত্রই মানব অশেষ কল্যাণের ভাগী হন। বলা বাহুল্য এক নাম মহামন্ত্রই যে জীবের সর্ব্বসাধক সত্ত্বশোধক ও হরি প্রাপক তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে যে আমরা অনন্তশক্তি ঐ নাম মন্ত্রের কোন শক্তিরই পরিচয় পাই না অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ নাম আমাদের সম্বন্ধে স্বক্রিয়া প্রকাশ বা নিজানন্দদান করেন না ইহার কারণ কি? তাহার উত্তর, আমাদেরই প্রবল দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা নামের যথেষ্ট

সমাদর ও অভ্যর্থনা করিতে পারিনা বা সামর্থ্য সত্ত্বেও করিনা অর্থাৎ আমরা নামের প্রয়োগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। আমরা কেবল ফলাকাঙ্ক্ষী অথচ অনুষ্ঠানের ত্রুটির দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। যেমন সুপ্রযুক্ত ঔষধ সেবনের সহিত বৈদ্যোক্ত সুপথ্য সুনিয়মেও চলিতে হয়। সুপথ্য সুনিয়মের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচার করিলে যেমন কেবল ঔষধ সেবন কোন ফলদায়ক হয় না। সেইরূপ হরিনাম গ্রহণের সহিত সদাচার গ্রহণ ও কুবৃত্তি বর্জ্জন এই দুইটিরও অনুসরণ করিতে হইবে। বৈদ্যোক্ত ঔষধ সেবনের সহিত অনুপান সেবনের ন্যায় ভগবদুক্ত সত্ত্ব-শোধক ও হরিপ্রিয় একাদশ্যাদি ব্রতগুলিরও সমাদর করা কর্ত্তব্য।

আমরা হরিনাম করি কিন্তু তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিনা এবং শূল দ্বারা হরি বক্ষঃ বিতাড়িত করিতেও ত্রুটি করিনা। যেমন দোহনকালে গাভিটিকে প্রহার দিলে সে দাঁড়ায় না বা দুগ্ধও দেয়না, সেইরূপ হরিপ্রিয় একাদশ্যাদি ব্রত ত্যাগ করিলেও হরিনাম স্বক্রিয়াপ্রকাশ করেন না। সুতরাং হরিপ্রীতির জন্য একাদশী, জন্মাষ্টমী চতুর্দ্দশ্যাদি ব্রত, অশ্বত্থ তুলসী সম্মান, গোব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা, মালা তিলক ধারণাদিও বৈষ্ণব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অকরণে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। যুবকের বেশ বিন্যাস, অর্থার্জ্জন বা কায় বাক্ মনোনিষ্ঠ ত্রিবিধ চেষ্টাই যেমন যুবতীপ্রীতির নিমিত্ত, সেবকের কায়মনো বাক্যে সেবা যেমন প্রভুপ্রীতির নিমিত্ত সেইরূপ ভগবদ্বিগ্রহ নাম-ব্রহ্মের প্রীতির জন্য তদীয় অনুকূল সেবাদিও কর্ত্তব্য। কেননা "গোবিন্দ স্মরণং নৃণাং যদেকাদশ্যু পোষনং" একাদশীতে উপবাস করিলেই শ্রীহরির স্মরণ করা হয়। না করিলে মানব ব্রহ্মহত্যাদি নানা পাপের ভাগী হয় ফলতঃ রাজ-নীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে যেমন রাজার প্রীতি হয় না পরন্তু বিরুদ্ধ কারীর দণ্ড হয় উক্ত ব্রতাদি অকরণেও সেইরূপ জানিতে হইবে। ইদানীন্তন মানব জীবনে ঐ প্রকার ব্রতাদি অকরণ জন্য অপরাধের প্রাচুর্য্য থাকায়, উষর ভূমি নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নামব্রহ্ম আমাদের সমক্ষে স্বপ্রকাশ হন না সুতরাং নাম প্রিয় ভক্তবৃন্দের এই অপরাধের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। ফলতঃ সদাচার বর্জ্জন ও স্বেচ্ছাচার এই দুইটিই নামের প্রতিবন্ধক। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। কেহ কেহ বলেন "হরের্নামৈব কেবলং" "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা দুরাচারী অজামিলের মুক্তির ন্যায় আমাদেরও কেবল

নামাভাসেই মুক্তি হইবে, সদাচার না করিলেও বস্তুশক্তির প্রভাবে আমাদেরও ভক্তি সিদ্ধ হইবে, শ্রদ্ধাদির আবশ্যক নাই ইত্যাদি" যাহারা এইরূপ বলেন, তাহাদের ইহাও ভুল ধারণা। যাহা অশ্রদ্ধায় উপ্ত হইলেও মুক্তিফল প্রসব করে। তাহা যদি শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে যে অবশ্য মহাফল প্রসব হইবেই তাহাতে আর সন্দেহ নাই সুতরাং ঈদৃশ প্রেম-প্রসবি হরিনামে (হেলা) অবজ্ঞা অনুচিত বা মূর্খতার পরিচায়ক। অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হইলে যে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয়না গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্যই তাহার প্রমাণ "অশ্রদ্ধয়াহুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চযৎ" ইহার দ্বারা ভজন মার্গে অশ্রদ্ধার নিষেধ থাকায়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই নাম গ্রহণ কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবিহীন মানবকে নাম উপদেশ দিলেও যখন অপরাধ হয়। তখন অশ্রদ্ধায় নাম গ্রহণেও অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। কেননা "কৃপণস্য ধনানীব তন্নামানি ভবন্তুমে" হে ভগবন্ কৃপণের ধনের ন্যায় আপনার নামসকলে যেন আমার সমধিক শ্রদ্ধা হয়। ইত্যাদি বাক্যে অশ্রদ্ধায় নাম গ্রহণ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নহে। মহর্ষিগণ যে নাম মহামন্ত্রের অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য নিরূপণ করিয়া তদাশ্রয়ে সর্ব্বসিদ্ধির ব্যবস্থা দিয়াছেন আবার তাঁহারাই যে অশ্রদ্ধার ব্যবস্থা দিবেন তাহাও সঙ্গত হয়না। তবে "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি" ইত্যাদি প্রমাণ নিরপরাধীর পক্ষেই জানিতে হইবে। মহাপাপী অজামিলেরও এক নামাভাসেই মুক্তি হইয়াছিল ইহা সত্য কিন্তু আমরা অজামিল অপেক্ষাও অধম, অজামিল বৃষলী সেবাদি পাপ করিয়াছিল মাত্র কিন্তু জ্ঞানকৃত ভগবদ্বিদ্বেষ তাহার ছিলনা অর্থাৎ অজামিল পাপী ছিল কিন্তু জ্ঞানকৃত অপরাধী ছিল না। শরীরী মাত্রেরই অপরাধ থাকা সম্ভব বিধায় তাহারও অপরাধ ছিল কিন্তু নাম গ্রহণের পর আর তাহার অপরাধ মোটেই ছিলনা, কাযেই তাহার নামাভাসেই মুক্তি হইয়াছিল।

আর আমরা হরিনাম করিয়াও পাপ করি, আমাদের এইরূপ ব্যবহার ক্রমিক চলিয়া আসিতেছে। আমরা হরিনামের সর্ব্বশক্তি সত্ত্বা জানিয়া শুনিয়াও পাপ করি সুতরাং মাদৃশ নামাপরাধীগণের অপরাধ ক্ষয় ব্যতিরেকে উদ্ধার নাই। অজামিলের মৃত্যু সময়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়াছিল। তখন তাহার ভবিষ্যত পাপ প্রবৃত্তির সম্ভবও ছিলনা এই জন্যই অজামিলের এক নামাভাসেই মুক্তি হইয়াছিল। আর আমরা নাম গ্রহণের পর শত শত

অপরাধ করিতেছি ও করিব। পাপ প্রবৃত্তির প্রবল বন্যা আমাদের হৃদয়ে সদাই বহিতেছে, কাযেই আমাদের অজামিলের মত নামাভাসেরও সম্ভব নাই। আমরা জানিয়া শুনিয়াও সৎকর্ম্ম করিনা। আমরা জ্ঞান-বল-দুর্ব্বিদগ্ধ। সুতরাং নিরপরাধ নাম গ্রহণেই সর্ব্বসিদ্ধি ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। নামৈক প্রাণ মহাত্মা রামদাস বাবাজি মহাশয় এইরূপ অপরাধের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সাবধানে নাম গ্রহণ করেন। সাধারণ অপেক্ষা ইহাই তাহার নাম গ্রহণের বিশেষত্ব। এই জন্যই তাহার নাম সংকীর্ত্তনের মাধুর্য্য অধিক, কাযেই শ্রোতৃবৃন্দের পিপাসাও বলবতী হয়। কেননা তিনি নাম-ব্রহ্মের কৃপাপাত্র হইয়াছেন। শরৎকালোদ্ভূত কমলিনী যেমন পরিদর্শকের নেত্রমন ও স্বাশ্রয় জলরাশির মলিনতা হরণ করে তদীয় মুখাম্বুজ সমুদ্ভূত নামামৃতও সেইরূপ স্বাশ্রিত ভক্ত ও যদৃচ্ছা প্রাপ্ত শ্রোতা সমূহের শ্রোত্র মনের মালিন্য অপহরণ করিয়া চিরতরে প্রসন্ন করেন। সাধারণতঃ শ্রী শ্রীহরিনামের মাধুর্য্যত আছেই তদাশ্রয়ে তাহার মুখ কমলেরও যে একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। নাম-প্রিয় ঈদৃশ মহাত্মার আগমন দেশের মঙ্গলের জন্যই জানিতে হইবে। আমাদের দেশেও কদাচিৎ উপদেষ্টার উদয় হয় বটে কিন্তু ঈদৃশ সদাচার প্রবণ বাবাজির উদয়েই প্রকৃত অন্ধকার নাশ হয়। অলমিতি।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ গোস্বামী পুরাণতীর্থ।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী।

(লেখক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।)

(৩)

ভক্ত নদীয়াবাসী তাহাকে দেখিয়া ভাবে, এমন সোণারচাঁদ, এমন বুদ্ধিমান নিমাই পণ্ডিত যদি ভক্ত হইত তাহা হইলে বেশ হইত, নদীয়ায় আর কেহ পাষণ্ড থাকিত না। একদিন নিমাই সঙ্গীগণ সহ সুন্দর নদীয়ার পথ কল-হাস্যে পরিণত করিয়া চলিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক প্রাচীন বৈষ্ণব তাহাকে দেখিয়া বড় দুঃখ করিয়া বলিলেন,—"নিমাই তুমি এত বড় পণ্ডিত

হইয়াছ, যদি ভক্ত হইতে, তাহা হইলে তোমার দ্বারা জগতের প্রকৃত মঙ্গল হইত।” নিমাই একথা শুনিয়া সেদিন চঞ্চলতার চূড়ান্ত করিয়া তুলিলেন। শেষে গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"এমত বৈষ্ণব মুঞি হইব সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব! এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥" চৈঃ ভাঃ

প্রকৃতই কিন্তু তিনি পরে তাঁহার নিজ বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠকগণকে আর সে কথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

এদিকে বল্লভাচার্য্যের আদরিণী বালিকা লক্ষ্মী, বৃদ্ধা শচীর গৃহস্থালীর ভার আপন হাতে লইয়াছেন। নিমাইর বড় সাধ প্রিয়ার হাতের রন্ধন এক দিন প্রিয় সঙ্গীদিগকে খাওয়ান। ছেলে মানুষ বউ, তাহাকে এই বয়সে রন্ধন কার্য্যের ভার দেওয়া শচীর ইচ্ছা নহে কিন্তু নিমাইও ছাড়িবার পাত্র নহে। দুরন্ত ছেলের গোঁ বজায় রাখিতে শচীকে পরাস্ত মানিতে হইল। নিমাই আনন্দে ভাল ভাল বৈষ্ণব যাঁহারা ছিলেন তাহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তাহাদের প্রতিবাসী, তিনিও তাহার স্ত্রী মালিনী দেবী—বাড়ীর পুরাতন দাসী দুঃখীকে লইয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিলেন। মালিনী দেবী তাঁহাদের স্নেহের নিমাইটীকে কচি বেলা হইতে কত কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। সে আজ তাহার কচি বধূটীকে লইয়া বৈষ্ণব ভোজনের আয়োজনে উদ্যত হইয়াছে, সুতরাং মালিনী দেবী ছুটীয়া আসিলেন। শচীমার অপেক্ষা মালিনী দেবী বয়সে ছোট সুতরাং অনেকটা সামর্থ তখনও তাহার দেহে বজায় ছিল। তাঁহারা নিমাইকে তখনও পর্য্যন্ত দুধের ছেলে বলিয়াই জানিত। সেই নিমাই যে আজ তাহার কচি বউটীকে মাত্র লইয়া এরূপ একটা বড় ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়াছে ইহাতে মালিনী দেবী তাহাকে মৃদু ভৎসনা করিয়া বলিলেন, বাপু! তুমি ছেলে মানুষ, তোমার কিছু দেখিবার আবশ্যক নাই, যাহা করিবার আমরা করিতেছি,

তুমি এখন তোমার সঙ্গীদের নিকটে যাও। লক্ষ্মীকে কেহ কিন্তু রন্ধন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেননা। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। আহা! ভ্রমক্রমে যাহাতে এই স্বর্গীয় সুষমাটুকু ম্লান হইয়া না যায় সেই দিকেই সকলের নজর।

ক্রমে রন্ধন কার্য্য সমস্ত হইয়া আসিল। নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। তখন কার সুখ-সৌভাগ্যশালী বাঙ্গালী গৃহস্থগণ একটী সামান্য ভোজেও কত প্রকার ব্যঞ্জন রাঁধিতেন কত কি ভোজ্য সামগ্রী আয়োজন করিতেন তাহার একটী তালিকা প্রাচীন মহাজনগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দিতেছি। কিন্তু সে সব যেন এখন আমাদের নিকট স্বপ্নের মত অলীক বলিয়াই বোধ হয়।

হরিভক্ত নদীয়াবাসিগণ আজ নিমাইর গৃহে অতিথি। তিনি বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। নিমাইর ভাল-বাসার পাত্র প্রায় সকলেই তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়াছেন। আজ জগদ্বাসী যে নিমাইর নামে উন্মত্ত সেই নিমাইর গৃহে যাঁহারা নিমন্ত্রিত, তাহাদের সুখ-সৌভাগ্যের কি আর সীমা আছে? ভাল ভাল লোক যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কাহাকেও আহ্বান করিতে নিমাই ভুলেন নাই। এমন কি সেই যবন হরিদাস—তিনি যে হরি নামের দিব্যমূর্ত্তি—তাঁহাকেও আদর করিয়া ডাকিয়া আনা হইয়াছে। নিমাইর চরিত্র যাঁহারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন কবি জয়ানন্দও তাহাদের মধ্যে একজন। এই সময়ে নিমন্ত্রিতদের পাতে কি কি দিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল তাহা তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ হইতে কিছু শ্রবণ করুন।—

ঘৃতান্ন সভারে দিলা শাক মুগ সূপ।
ফেণাবড়ী লাফ্‌রা পটোল বস্তুক॥
হিঙ্গঝাল ভাজা ঝোল অলা কাঞ্জিবড়া।
বড়াম্বু শর্করা লাজ মিঠামুখ বৌড়া॥
ক্ষীর অমৃতগুটিকা খরড়া নবাত।
মনোহরপুলি দুগ্ধপুলি দুগ্ধজাত॥
আর্দ্রা নারিকেলপুলি সাকরা কাকরা।
চন্দ্রকান্তি পায়েস পরমান্ন শর্করা॥

গুটিকা ডালিমা মধু প্রবাসাত পুলি
মনসন্তোষ নয়নসুখ গঙ্গাজল সিলালি ॥
মর্চ্যা ছেনা দুগ্ধ পুলি কোরা মৃষ্ট সর।
অনুপাম জগন্নাথ ভোগ সুখ-সার ॥

শচী মা অগ্রসর হইয়া সকলের ভোজন দেখিতেছেন যেন কাহারও ভোজনে কিছু ত্রুটী না হয়। আর বলিতেছেন দেখ বাপ সকল, এই যে সমস্ত রান্না ইহার সকলই আমার বৌমার হাতের। বৌমা আমার ছেলে মানুষ। তাহার রন্ধন হইলে সমস্তই আমি শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। বৌমা আমার কিরূপ রাঁধিয়াছেন? তাঁহার রান্না শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছেন তো! ভক্তেরা হাসিতে হাসিতে বলিলেন মা! আপনার বৌমাটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তাঁহার রান্না শ্রীকৃষ্ণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। রন্ধন গৃহে বসিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী এ কথা শুনিলেন। শুনিয়াও আনন্দে মুখখানি নত করিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রকৃতই সকলে বড়ই পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। সকলেই বলিলেন এমন মিষ্ট রান্না তাহারা ত আর কখনও খান নাই। লক্ষ্মীদেবী আজ প্রকৃত লক্ষ্মীদেবীর ন্যায়ই রন্ধন করিয়াছেন। আর সেই চঞ্চল যুবক নিমাই চাঁদটী কোথায়? তিনি সুস্থির হইয়া বসিয়া নাই। ভোজন-কার্য্যের তদারকে আঙ্গিনাময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। লক্ষ্মী বউটীর লক্ষ্মীর ন্যায় সুখ্যাতি শুনিয়া বড়ই আনন্দে মুখ টীপিয়া হাসিতেছেন।

ভোজন কার্য্য সমাপ্ত হইলে নিমাই সকলকেই যত্ন পূর্ব্বক মাল্য চন্দনও কর্পূর তাম্বুল দিয়া তুষ্ট করিলেন।

পিঠা পানা ভোজনে বৈষ্ণব সন্তোষিলা।
মাল্য চন্দন দিঞা সত্কারে তুষিলা ॥
কর্পূর তাম্বুল দিল দিল সদ্বাস।
কৃষ্ণ কেলি (বস্ত্র) দিয়া তুষ্ট কৈল শ্রীনিবাস ॥

হরিদাসের ভাগ্য কিন্তু আরও সুন্দর, কারণ ক্ষুদ্র বালিকা আজ জননীর মূর্ত্তি ধরিয়া হরিদাসকে বিদায় দিতে আসিলেন। আহা! হরিদাস যে আমাদের শৈশবেই মাতৃহারা! হরিদাস বিরাগী। তাহারত আর বসন ভূষণের আবশ্যক নাই, তাই তাঁহার জননী লক্ষ্মীদেবী তাঁহার জন্য একটী

হরিনামের ঝুলি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সেইটী ও একটী বহির্ব্বাস তাঁহার স্বামীর বড় আদরের হরিদাসকে দিতে আসিলেন। নারদ ঋষির মত হরিদাস দিবারাত্র হরিনাম লইয়াই থাকিতেন। হরিনাম করিয়া করিয়া হরিদাস বিনয়ের অবতার হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন জগজ্জননী মূর্ত্তি মা লক্ষ্মী নিজহাতে তাহাকে তাঁহার বড় সাধের হরিনামের ঝুলি ও বহির্ব্বাস দিতে আসিতেছেন। মাতৃস্নেহ কেমন জিনিস তাহা তাহার বড় একটা মনে নাই। সেই ক্ষুদ্র বালিকাটীকে তিনি অভিনব মাতৃমূর্ত্তিতে দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া মাথাটী হেঁট করিয়া দেবীর প্রসাদ মাথা পাতিয়া লইলেন। আর একবার সেই মাতৃস্নেহ স্বরূপিনী মাতার স্নেহ স্মরণ করিয়া আনন্দাবেশে কণ্টকিত গাত্রে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন।

কি সুন্দর দিন সে দিন নদীয়ার! নিমাইর আদর যত্নে সুখী হইয়া সাধু নদীয়া বাসীগণ আপন আপন গৃহে ফিরিলেন। পথে সকলেই বলাবলি করিলেন, ভাই! নিমাই কখনও মানুষ নহেন। যেমন তাহার ব্যবহার তেমনই তাহার রূপ। নিশ্চয়ই কোন স্বর্গের দেবতা আমাদের মধ্যে আনন্দ দিবার জন্য নদীয়ায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর সেই রন্ধন, যাহা তাঁহারা ভোজন করিয়া আসিতেছেন তাহা যে একেবারে অমৃত। বালিকাও কি তবে অমৃত স্বরূপিনী? কে জানে ইহারা কে?

নিমাই এখন নবদ্বীপের মধ্যে একজন বড় পণ্ডিত হইয়াছেন। শচীমার মত জননী, লক্ষ্মীর মত সহধর্ম্মিনী লাভ করিয়া তাহার সুখের সীমা নাই। তাহার আনন্দে তাহার আত্মীয় স্বজন এমন কি নদীয়াবাসী সকলেরই আনন্দ। কারণ তিনি যে সকলেরই নয়নানন্দ স্বরূপ ছিলেন। নিমাই পণ্ডিতকে সকলেই ভালবাসে। যাহার বাড়ীতেই কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় নিমাইর বাড়ীতে ভোজ্য বস্ত্র প্রভৃতি সকল দ্রব্য আগে পাঠাইয়া দেয়। সুতরাং তাহার গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। এদিকে আবার অতিথি অভ্যাগতেরও অভাব নাই। কোন দিন বা ১০।২০ জন অতিথি একত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অতিথি পাইলে বাড়ীর সকলেরই আনন্দ। লক্ষ্মীদেবী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যান, শচীমা তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, আর নিমাই বাহিরে তাহাদিগকে লইয়া বসিয়া নানা কথায় তাহাদের চিত্ত

প্রফুল্ল করেন। হায়! অতিথি সেবা-পরায়ণ বাঙ্গালার সেই এক সুখের দিন! আর আজ? আমাদের কি আছে। শাস্ত্র বলেন—অতিথি নারায়ণ—তাঁহাকে বিমুখ করিতে নাই। সাধ্যমত তাহাকে কিছু দিয়া সন্তোষ করিতে পারি ভালই নতুবা অক্ষম হইলে মিষ্ট কথাতেও সন্তোষ করিতে হইবে। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। নারায়ণের সেবা করিতে ভুলিয়া বাঙ্গালী আজ লক্ষ্মী ছাড়া হইতে বসিয়াছে। জগতের অন্ন ক্ষেত্র ধন ধান্যে পূর্ণা বঙ্গজননী আজ শ্রীভ্রষ্টা, স্বীয় সন্তানগণের অন্নাভাব মোচনে অসমর্থা। বাঙ্গালীর সেই পরিপূর্ণ সুখের দিনে তাহাদের পুণ্যে তাহাদের দেবতা পরিপূর্ণ আনন্দের মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে সে অনেক দিনের ঘটনা—কারণ তাহা প্রায় সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমরা তাহাকে ভুলিতে বসিয়াছি। বাঙ্গালী হাহাকার করিয়া কাঁদিতে শিখ—কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে স্মরণ কর—আবার তিনি আসিবেন।

তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন একথা তিনি নিজমুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তখন আবার তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে। তোমাদের গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ হইবে। তোমাদের আবার দেব-দ্বিজে ভক্তি আসিবে। অতিথি সেবা পরায়ণ হইবে। স্বর্গের সুষমা তোমাদের অঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িবে। স্বর্গের হাসি তোমাদের ম্লান মুখে ফুটীয়া উঠিবে। তোমরা ডাকিতে শিখ কিন্তু ডাকার মত ডাক চাই তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। সেই অভিন্ন ভ্রাতৃ-যুগল আবার যুগল মূর্ত্তিতেই আসিবেন। তাঁহাদের পদ-স্পর্শে পাপ তাপ আবার ছুটীয়া পলাইবে। ভারত তখন প্রকৃতই আবার সোণার ভারত হইবে।

নিমাইর নিদ্রা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মী দেবী গাত্রোত্থান করেন। পতিদেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গৃহ কার্য্যে যান। হিন্দু-নারীর গৃহ কর্ম্ম—সে যে সকল কর্ম্মের সার। এ গৃহ কর্ম্মে নাই কি। তাঁহাদের গৃহ কর্ম্মে ধর্ম্ম ও সেবা যে আপন আপন স্বরূপ মূর্ত্তিতে ফুটীয়া উঠিয়াছে। হিন্দু-নারীর এ গৃহ কর্ম্ম নহে—এ যে দেবতার আরাধনা, দেবতা কোথাও নাই—দেবতা তাহাদেরই মধ্যে। কিন্তু আবার বলি বুঝি আজ তাঁহারাও এ গৃহ কর্ম্ম ভুলিতে বসিয়াছেন। সর্ব্বস্ব হারা লক্ষ্য বিমুখ জীবন আমাদের—আমাদের ধারণায় তাহারা যে অনুপ্রাণিত হইতে শিখিবে তাহাতে আর

বিচিত্রতা কি। তবুও স্বীকার করিতে হইবে হিন্দুর হিন্দুত্ব এখনও যতটুকু বজায় আছে তাহা তাহাদেরই চেষ্টায়। তাই বলি হিন্দুললনা! একবার জাগ। সাধের ঘুমঘোর চক্ষু হইতে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে জাগাও। কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা।" তোমাদের জাগরণে আমরাও আবার জগতের চক্ষে দীপ্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিব।

আমরা লক্ষ্মীদেবীর গৃহকর্ম্মের কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার গৃহকর্ম্মের মধ্যে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবাই চরম লক্ষ্য ছিল। শচীর বয়স হইয়াছে। অনেক গুলি ছেলে মেয়ে ও স্বামীর শোকে তিনি আরও বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার উপর বিশ্বরূপের শেল—সে শেল যে তাহার বক্ষে সমান ভাবে বিঁধিয়া রহিয়াছে। মা লক্ষ্মী আমার কচি মেয়ে কিন্তু তিনি শাশুড়ীর দুঃখ সবই বুঝেন। তাই সব কাজের মধ্যে শাশুড়ীর সেবাটাই বড় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বৃদ্ধা শচী ইহাতে বড়ই শান্তি পান। নিমাইর বউটীকে তিনি বুকে ধরিয়া মুখখানি চুম্বন করেন। বলেন মা! তুমি কচি মেয়ে এত যত্ন, এত সেবা কোথায় শিখিলে, আবার অলক্ষ্যে চক্ষে জল আসে। আহা! এত কষ্টের ধন নিমাই কি তাহার বাঁচিবে? তাহার এই সোণার বউমাটীকে লইয়া ঘর করা করিবে? হতভাগিনীর কপালে কি এত সুখ-সৌভাগ্য ভগবান লিখিয়াছেন। শাশুড়ীর চক্ষে জল দেখিলে মা লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়েন, অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া দেন। আদর করিয়া কত কথা বলেন। শচীমার আবার বুকখানি জুড়াইয়া যায়। আহা মাগো! স্বর্গের সৌন্দর্য্য যদি কিছু থাকে তাহা যে মা তোমারই কাছে।

ইহার মধ্যে আবার কোন দিন নিমাই আসিয়া পড়েন। মায়ের কাছে বসিয়া কত গল্প করেন। লক্ষ্মীদেবী তখন একটু আড়ালে যান। বলেন মা! এখন তুমি বুড়া হইয়াছ, সংসারের কাজে তোমার হাত দিবার দরকার কি। তুমি কেন তোমার বধূকে সব কাজ শিখাইয়া দাওনা, সেই সব করুক। মা বলেন, পাগল ছেলে আমার, হারে! বউমা কি আমার কোন কাজ করিতে দেন; মা যে আমার হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া নিজে করেন। আহা! নিমাই! বউমাটী আমার বড় লক্ষ্মী। এমন লক্ষ্মী বউ আমি অনেক ভাগ্যে পাইয়াছি।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীগুরু।

(লেখক—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী।)

—০:০—

জীবন-ক্ষেত্রের' পর করিতে ভ্রমণ
ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন, আপন্ন-পরাণ
দেখিল আকুল হ'য়ে, আশে পাশে তার!
সারা পথ কাঁটা ঘেরা কোথা পরিত্রাণ!!
বন্ধুর কর্কশ বর্ত্ম, ভ্রান্তি-তর্কে ঢাকা
—পদে-পদে পদে ব্যাথা করিছে সৃজন
যে সুধা-শান্তির আশা; সে যে বহুদূর!
—ভাবি, প্রাণ, হত-আশে করিল ক্রন্দন!
কল্‌ কলি' রুদ্ধ স্রোত হৃদয় যেন বা
—বহিল নয়ন দিয়া, তপ্ত-অশ্রুচ্ছলে।
নমিত হইল শির, ধীরে ধীরে ধীরে—
—অহমিকা জ্ঞান ভাঙ্গি' গেল ডালে মূলে!
কি এক সমাধি মগ্নে আবাহণ মন্ত্র
জাগিল, ধ্বনিল, স্তব্ধি আয়াস, প্রয়াস।
নিমীলিত ছিল আঁখি, হ'ল উন্মিলীত
দেখিল—জীবন-ক্ষেত্র নবীনে প্রকাশ
দেখিল—প্রজ্ঞার বাতি বাম হাতে ধরি
স্মিত-শ্বেত-কলেবর স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়
শ্রীঈশ দ্বিতীয় রূপ, করেন নির্দ্দেশ—
অনাদি অব্যয় তত্ত্ব চিদানন্দময়।
সকল শুদ্ধি ও শান্তি সেই পূত অঙ্গে
পুঞ্জীকৃত, সঞ্জীবিত দেহের বিধানে।
দেখিল—মহান্‌ সহ-সুধা স্নেহ ধারা
ঝরে তাঁর দৃষ্টি হ'তে নীরব ভাষণে—

সে দৃষ্টি পরাণে দিল চির ধ্রুব মন্ত্র
চিনিল তাহাতে নর, যাহা ধার্য্য কার্য্য
সঙ্গে হৃদয়ে তাহা করিল গ্রহণ
জয় জয় গুরুদেব সাধন আচার্য্য !!

গৌর শূন্য নদীয়া।

কাটোয়া নগরে গোরা করিয়া সন্ন্যাস,
করিছেন কতদিন নীলাচলে বাস।
গৌরাঙ্গ বিহনে হেথা নদীয়া নগরী,
নাহিক সৌন্দর্য্য তার নাহিক মাধুরী,
কান্দয়ে নদীয়া বাসী গৌরাঙ্গ বিহনে,
বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচী অঝোর নয়নে,
পড়ুয়া পণ্ডিত যারা বিরোধী আছিল,
গৌরাঙ্গ বিহনে সবে পাগল হইল।
গৌর শূন্য ন'দে ভূমি আঁধার হেরিয়া,
ভক্তগণ কেহ কেহ গেলেন ছাড়িয়া,
কেহ গেল যতি হ'য়ে, কেহ বারানসী,
গোরা চাঁদে কেহ হেথা মিলিলেক আসি।
নদীয়া রহিল যারা নদীয়ার লোক,
গৌর বলি কাঁদে সদা কি গভীর শোক।
গোরা বিনু প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব,
সোণার গৌরাঙ্গ মোর কোথা গেলে পাব।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

ভিক্ষা।

—:০:—

ভেবেছিনু মনে বুঝিবা স্বপনে
দেখা দিবে আসি তুমি।
ছি ছি একি রীতি না কর পীরিতি
আঁখি জলে ভাসি আমি॥
নয়ন আমার চাহে অনিবার
তোমার আনন খানি।
বাহু-লতা চায় ধরিয়া জড়ায়
সুচারু ও দেহ খানি॥
বদন আমার চাহে অনিবার
গাহিতে তোমার নাম।
নদীয়া-নাগর করুণা-সাগর
তুমি হে আমার প্রাণ॥
পরাণে বাসনা বিকাব আপনা
তব ও রাঙ্গা-চরণে।
"নদীয়া-রমণ" এই অকিঞ্চন
কাতরে মাগিছে দীনে॥

দীন—শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদকীয়।—বহু পাঠকের ইচ্ছা পূর্ব্বের মত একটী করিয়া প্রার্থনা প্রতি-মাসে ভক্তিতে দেওয়া হয়। আগামী মাস হইতে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা।

(বঙ্গাব্দ ১৩২৭। চৈতন্যাব্দ ৪৩৪।৪৩৫।)

—:•:—

বৈশাখ।

একাদশী	২রা বৃহস্পতিবার।
অক্ষয়তৃতীয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা	৮ই বুধবার।
জহ্নু সপ্তমী	১২ই রবিবার
ত্রিস্পৃশ্য মহাদ্বাদশী	১৬ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী	১৮ই শনিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোলযাত্রা	২০শে সোমবার।
একাদশী	৩১শে শুক্রবার।

জ্যৈষ্ঠ।

একাদশী	১৪ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা	১৮ই মঙ্গলবার।
একাদশী	৩০শে রবিবার।

আষাঢ়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা	৪ঠা শুক্রবার।
ঐ পুনর্যাত্রা	১১ই শুক্রবার।
শয়নৈকাদশী (রাত্রি ১২।২০ মিনিটের পর শ্রীশ্রীহরির শয়ন) চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ	১৩ই রবিবার।
একাদশী	২৮শে সোমবার।

শ্রাবণ।

একাদশী	১০ই সোমবার।
একাদশী	২৫শে মঙ্গলবার।

ভাদ্র।

একাদশী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ	৯ই বুধবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ	১০ই বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন, শ্রীশ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা	১৩ই রবিবার।
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত	২১শে সোমবার।
একাদশী	২৪শে বৃহস্পতিবার।

আশ্বিন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী	৪ঠা সোমবার।
পার্শ্বৈকাদশী ও ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস, মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবামনদেবের জন্ম-পূজাদি, সায়ংকালে শ্রীশ্রীহরির শয়ন	৮ই শুক্রবার (পরদিন ৯ই প্রাতে ৬:৩৫ মিনিট মধ্যে পারণ।)
একাদশী	২২শে শুক্রবার।

কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	৫ই শুক্রবার।
একাদশী	৬ই শনিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎরাসযাত্রা	১০ই বুধবার।
একাদশী	২০শে শনিবার।
গোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট	২৫শে বৃহস্পতিবার।

অগ্রহায়ণ।

গোপাষ্টমী	৪ঠা শুক্রবার।
উত্থান একাদশী, ভীষ্মপঞ্চক	৭ই সোমবার।
শ্রীহরির উত্থান ও রথযাত্রা (বেলা ৮:৪৯ মধ্যে) চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন	৮ই মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণেররাসযাত্রা	১০ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী	২১শে সোমবার।

পৌষ।

একাদশী	৬ই মঙ্গলবার।
একাদশী	২০শে মঙ্গলবার।

মাঘ।

একাদশী	৭ই বৃহস্পতিবার।
পুষ্যাভিষেক যাত্রা	১০ই রবিবার।
একাদশী	২১শে বৃহস্পতিবার।

ফাল্গুন।

বসন্ত সপ্তমী শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন	১লা রবিবার।
মাকরী সপ্তমী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব	৩রা মঙ্গলবার।
ভৈমী একাদশী	৬ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব	৮ই রবিবার।
একাদশী	২১শে শনিবার।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত	২৪শে মঙ্গলবার।

চৈত্র।

একাদশী, আমর্দ্দকীব্রত, শ্রীগোবিন্দার্চ্চন	৭ই রবিবার।
শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ৪৩৬ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ	১০ই বুধবার।
একাদশী	২২শে সোমবার।

সম্পাদক—শ্রীভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল—কলিকাতা।

"ঈশ্বর-তত্ত্ব।"

(লেখক শ্রীযুক্ত সভ্য চরণ চন্দ্র উকীল।)

—:০:—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" (ব্রহ্মসংহিতা।)

লোকে বলে "ঈশ্বর" "ঈশ্বর" শুনিতে পাই; কিন্তু ঈশ্বর ত কেহ কখন দেখিতে পাইলাম না। বাস্তবিকই লোকে যদি একবার ঈশ্বরকে দেখিতে পাইত তাহা হইলে কেহই আর জগতে অসদাচরণ করিত না, জগৎ অমরাবতী হইয়া যাইত। কাহারও দ্রব্য অপর কেহ হরণ করিত না, কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষ হইত না; সকলেই পরস্পর মহানন্দে কাল কাটাইতে পারিতেন। ভাবনা মাত্র থাকিত না। কেহ কাহারও আততায়ী হইতনা।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি প্রেমপরায়ণ হইতেন। জগতে মহাশান্তি—পরমানন্দ পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত থাকিত।

এইরূপ উদ্দেশ্যেই জগতের যাবতীয় জাতির শাস্ত্রে স্ব স্ব ভাষায় জীবগণকে ঈশ্বর সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের বঙ্গভাষায় তদ্রূপ উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'। দেবভাষাই অবশ্য মূল আকর। সংস্কৃত গ্রন্থনিচয় হইতেই প্রমাণাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক মহাপূজ্য ভক্তশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিজ মাতৃভাষায় পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে ঈশ্বর-তত্ত্ব গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা বঙ্গ-ভাষার এক অদ্বিতীয় সম্পত্তি। পাঠকগণ, শ্রীগ্রন্থ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

কিন্তু শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ পড়ার সুযোগ ও অবসর অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই জন্য সরল অথচ সংক্ষিপ্ত ভাবে যদি কেহ বাঙ্গালা ভাষায় ঈশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহা হইলে অস্মৎ সমাজের বিশেষ উপকার হয়। আমাদের তদ্বিষয়ক চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কারণ ঐরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে লেখককে ভক্তির সাধক ও অনুভব বা ভাবসিদ্ধ হওয়া চাই। কেবল পাণ্ডিত্য প্রতিভায় ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝান যায় না। যাহা হউক শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইলে তদ্রূপ মহাত্মার অভাব থাকিবেনা এক্ষণে আমরা কেবল মাত্র কৌতুহল নিবারণার্থ শ্রীচরিতামৃতকে আদর্শ রাখিয়া দিগ্‌দরশন স্বরূপে এই উপহাসাস্পদ প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইলাম।

মূলতত্ত্ব।—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" মনে করুন, চিনির দ্বারা আমি নানা প্রকার খেলানা প্রস্তুত করিলাম। এখন, সেই সকল খেলানা দেখাইয়া আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি 'চিনি দেখিতেছেন কি?' আপনি যদি বুদ্ধিমান হন, অমনি বলিবেন হাঁ, চিনি দেখিতেছি। কারণ চিনিই হাতী ঘোড়া, প্রভৃতি নানা মূর্ত্তির খেলানায় পরিণত হইয়াছে।

সেইরূপ, শাস্ত্র বলিলেন 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'। আর আমরা সেই 'ইমানি ভূতানি" দেখিয়া অমনি কি 'ঈশ্বর' দেখা যায়না বলিব? মাটী হইতে ইট হয়; ইট দেখিয়া যদি কেহ বলেন মাটী দেখিতে পাইতেছি না, সেও যেমন—আর ঈশ্বর হইতে নিখিল বস্তু সঞ্জাত হয়, অথচ নিখিল

বস্তু দেখিয়া যদি কেহ বলেন 'ঈশ্বর' দেখিতে পাইতেছি না, সেটাও ঠিক সেইরূপ। শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয় ;
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥"
"ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবান তুমি কহ নিরাকার ?"

'ঈশ্বর' শব্দে সর্ব্ব বুঝায়। শ্রীগীতায় উক্ত আছে "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বং।" তুমি সকলই গ্রহণ করিতেছ অতএব তুমিই সর্ব্ব, তুমিই সকল। শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান।
যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন ॥"
"স্বয়ং ভগবান সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমসর্ব্ব রসময় ॥"
"সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে।
প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ সেই আমি হইয়ে ॥"

এখন, সর্ব্ব বা সকল বলিলে কি বুঝিতে হইবে দেখা যাউক। আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি, ঘ্রাণ করি, স্বাদ করি ও স্পর্শ করি, আবার যাহা আমরা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাইনা, ঘ্রাণ করিতে পাই না, স্বাদ করিতে পাই না ও স্পর্শ করিতে পাই না ; আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়া অনুভব করি যেমন দেশ, কাল ইত্যাদি, আবার যাহা চিন্তা ও বুদ্ধির অগোচর—এই সমস্তই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরকে দেখা যায়না বলিলে ভুল হয়। কারণ যাহা দেখি তৎ-সমস্তই ঈশ্বরাংশ। "প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ সেই আমি হইয়ে।" যেমন নদী বা পর্ব্বত দেখিয়াছি বলিলে নদী বা পর্ব্বতের একদেশ মাত্র দেখা বুঝায় ও অবশিষ্টাংশ অনুমান সাধ্য হয়, সেইরূপ ঈশ্বর দেখিয়াছি বলিলে ঈশ্বরের অংশাংশ মাত্র দেখা বুঝায়, সমগ্রদর্শন প্রাকৃত নেত্রের কার্য্য নয়। বুদ্ধি, অনুমান ও অনুভব দ্বারা সমগ্রের আভাস মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত সমগ্রের সাক্ষাৎকার হয় না। শ্রীগীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে শ্রীঅর্জ্জুনই তাহার দৃষ্টান্ত। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল। সেই দেখে যায় আঁখি হয় নিরমল॥"

পুনরুক্তি দোষের সম্ভাবনা থাকিলেও দেশের নিরীশ্বরতার কথা ভাবিয়া আমরা প্রাগুক্ত প্রসঙ্গ নানা উদাহরণ দ্বারা পাঠকের হৃদ্‌বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

মনে করুন কোন স্থানে একটি ইটের ঘর আছে। ঘরের মধ্যে বহুবিধ মৃন্ময় পাত্র আছে ঐ সকল দেখিয়া যদি কেহ বলেন 'আমি কেবল মাটীই দেখিতেছি' তাঁহার যেমন ভুল হয় না, সেইরূপ জাগতিক যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তি বা স্থান সকল দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে 'আমি এক ঈশ্বরই দেখিতেছি' তাঁহারও কোন ভুল হয় না। শ্রীচরিতামৃতমধ্যলীলায় বলিয়াছেন—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান। ইচ্ছায় জগত রূপে পায় পরিণাম॥"

পরিণামবাদ ব্যাস সূত্রের সম্মত। অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥"

বরং পক্ষান্তরে যিনি নানা দর্শনীয় বস্তু দর্শন করিয়াও বলেন যে ঈশ্বরকে দেখা যায় না তিনিই ভ্রমে পতিত হন। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন 'ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই' এক তিনিই আছেন, দ্বিতীয় কিছুই নাই। তবে যে দ্বিতীয়ের জ্ঞান হয় তাহা ঐ বহুবিধ মৃন্ময় পাত্র দর্শন সদৃশ। ইহাই অদ্বয় বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব।

"সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান।
যাহা বিনুকালত্রয়ে বস্তু নাহি আন॥
সেই অদ্বয় তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপ, শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥"

আবার মনে করুন আপনি মোদক দোকানে গিয়াছেন, তথায় সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি যত প্রকারই মিষ্টান্ন দেখুন না, সকলই সেই দুগ্ধ ও ইক্ষু রসের রূপান্তর মাত্র। দুগ্ধ ও ইক্ষুরসই যেমন নানা প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়া নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য হইয়াছে, ঈশ্বরও তেমনি নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন মূল বস্তু কিন্তু এক ঈশ্বর। সকল কারণের মূল কারণ সেই এক ঈশ্বর। এখানে হয়তো তার্কিক তর্ক তুলিয়া বলিবেন যে,—

তবে কি ঈশ্বর একটি মূল জড় পদার্থ ?' যেমন হায়ড্রোযান বা জলজান, অক্সিজেন বা অম্লজান, প্রভৃতি ? না ; তাহা হইতে পারে না। কারণ মূল যদি জড় হইত, তাহা হইলে অজড় বা চিৎ পদার্থ একবারেই প্রকাশ পাইত না, উহার সম্পূর্ণ অভাব হইত। সুতরাং মূল চিন্ময়। চিৎঘন হইয়া কোথাও জড়রূপ হইয়াছেন, কোথাও বা চিৎস্বরূপে আছেন, আবার কোথায়ও বা চিদচিৎরূপে সম্মিলিত আছেন।

তবে কি ঈশ্বর কেবল চিৎপদার্থ বা জ্ঞানময় পদার্থ ? না ; তা'ও হইতে পারেনা। কারণ শুধু জ্ঞান হইতে আনন্দ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, মূলে আনন্দ থাকা চাই। অতএব ঈশ্বর চিদানন্দময়, সর্ব্ব বা সর্ব্বব্যাপী, এক, অদ্বিতীয়, নিত্য বিরাজমান বিগ্রহ। অবশ্য রূপান্তর নানা প্রকারের হয়, কিন্তু মূল অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনশ্বর। শ্রীচরিতামৃতই বলিতেছেন—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।" "সৎচিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।"

"ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥"

"তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। চিদানন্দ তেঁহো তাঁর স্থান, পরিবার॥"

এই আদির আদি কোথায় পাইব ? এই আদির আদি নাই। এই আদি অনাদি। এই মূলের অন্ত কোথায় ? অন্ত নাই। ইহা অনন্ত। তাই শ্রীব্রহ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

ঈশ্বর ত 'সকল' কিন্তু এখন এই 'সকল' ঈশ্বর কি না ? পূজ্যপাদ শ্রীল চরিতামৃতকার মহাশয় বলিয়াছেন—

"দুগ্ধ যথা অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধ ভিন্ন বস্তু নয়, (কিন্তু) দুগ্ধ হৈতে নারে॥"

দুগ্ধই দধিরূপ ধারণ করে, কিন্তু দধি দুগ্ধ হইতে পারেনা। অর্থাৎ ঈশ্বর স্বেচ্ছাযোগে 'সর্ব্ব' রূপ ধারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'সর্ব্ব' ঈশ্বর হইতে পারেন না ; ঈশ্বরের অংশাংশ হইতে পারেন। সর্ব্ব মায়াধীন, ঈশ্বর মায়াধীশ। মায়ার কথা আমরা পশ্চাৎ বুঝিবার চেষ্টা করিব। শ্রীগীতা বলেন "একাংশেন স্থিতং জগৎ।"

এই যে 'সর্ব্ব' বা পরিদৃশ্যমান সৌর জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড, এখানে সকল বস্তুই গতিশীল। কি সূর্য্য কি চন্দ্র কি অপরাপর গ্রহ তারা নক্ষত্র নিচয়, কি মানব কি পশু সরীসৃপগণ, কি তরু গুল্ম লতাচয়, কি বারি বহ্নি বায়ু কেহই স্থির নাই। সকলেই চঞ্চল চরণে, তীর্থ যাত্রীর মত, কি জানি কোথায় চলিয়াছেন। গতিই যদি 'সর্ব্বের ধর্ম্ম হয়, তবে মূল কারণেও নিশ্চয়ই গতি আছে। অতএব সেই মূল কারণ নটবর বা নৃত্যপর। কারণ সর্ব্বোত্তম্ গতিই নৃত্য।

এখন দেখা যা'ক এই 'সর্ব্ব' বা নিখিল বস্তু নিচয় কোন্ দিকে যায়? কাহার আকর্ষণে চলে? যাঁর এত আকর্ষণী শক্তি, যিনি নিখিলাকর্ষী, তিনিই কৃষ্ণ। মহর্ষিগণ তাঁহাকেই 'শ্রীকৃষ্ণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁরই সেই মধুর মোহন আকর্ষণে সকলেই সর্ব্বদা স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্যে রত আছে। সে আকর্ষণ ছাড়িয়া পলায়নের ক্ষমতা কাহারও নাই।

কিন্তু সেই মূল কারণে লক্ষ্য স্থির না থাকায় অর্থাৎ সেই মূলের কথা বিস্মৃত থাকায় লোকে নিজ নিজ কর্ম্ম কারিতার অন্যান্য কারণ আরোপ করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। কেহ বলিতেছেন পুত্র পরিজনের জন্য, কেহ বলিতেছেন দেশের জন্য, কেহ বলিতেছেন আত্মোন্নতির জন্য শ্রমস্বেদ নির্গত করিতেছি। ফলতঃ প্রকৃত কথা কেহই বুঝিতেছেন না। প্রত্যেকেই সেই মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়ী লীলা পূরণের জন্যই কর্ম্মাধীন রহিয়াছেন। সে লীলা পালন হইতে পারে, সংহার হইতে পারে অথবা সৃজন হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঐ ত্রিবিধের একটিও নয়, তাহা কেবল আনন্দ রসময়ী খেলা মাত্র।

সাধারণ জীবের সম্বন্ধে ঐ লীলাকে শিশুগণের মহানন্দ জনক ও অতি প্রিয় 'লুকোচুরি' খেলার ন্যায় এক প্রকার 'লুকোচুরি' খেলা বলা যাইতে পারে। গোপাল বলিতেছেন—'ভাই জীব! ধর্ দেখি আমায়! ধরা দি দি দিনা। এমন মুখোস পরিয়াছি, এমন ভাবে লুকাইয়াছি যে তুমি আমায় কিছুতেই ধরিতে পারিবে না।' 'যেমন প্রদীপের ঠিক নিম্নভাগে অন্ধকার বর্ত্তমান থাকে, আলোক তাহা অপসারিত করিতে পারেনা সেইরূপ জীব তুমি চিৎকণ, জ্ঞানময় হইয়াও তোমার হৃদেশস্থ আমাকে কিছুতেই বুঝিতে বা স্মরণ রাখিতে বা ধরিতে পারিতেছনা। ইহাই আমার 'লুকোচুরি' বা 'আত্ম

গোপন' বা 'অন্তর্ধান' লীলা। আমি চোর, তুমি আমায় ধর দেখি! তুমি যা'তে হাত দাও, যা' ধর, তা' আমি নয় মনে কর, সুতরাং ধরিতে পার না। অথচ আমি সবেতেই আছি, সব আমাতেই আছে। "ময়িতে তেষু চাপ্যহং" তুমিও আমাতে আছ, আমিও তোমাতে অংশের রূপে আছি। চোরকে যদি ধরিতে চাও জগৎ সম্রাটের 'চাপরাস্ পর। দারোগা বা গোয়েন্দা বা চোরের ন্যায় ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে অভ্যস্ত হও। কেবল উপর দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিওনা। যদি দর্শন শক্তি পাও, অন্তর্বহিঃ উভয়তঃই আমাকে দেখিতে পাইবে।"

একজন কখনও বরফ দেখে নাই। বরফ দেখিয়া সে বুঝিতে পারেনা যে, জল হইতেই বরফ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে জানে, সে বরফ দেখিলে জল ব্যতীত আর কিছুই মনে করিবেনা। সেইরূপ ঈশ্বর তত্ত্ব যে জানিয়াছে, সে যাহা দেখিবে, শুনিবে বা অনুভব করিবে সমস্তই এক ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত মনে করিবে।

মাকড়্সার জাল অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু মাকড়সারজাল কিরূপে প্রস্তুত হয় তাহা বোধ হয় অনেকে অনুসন্ধান করেন নাই। মাকড়সার উদর হইতে আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়। আমরা যেমন ইচ্ছামাত্র নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে পারি, মাকড়্সাও সেইরূপ ইচ্ছানুসারে উক্ত আঠা বাহির করিতে পারে। জাল রচনার ইচ্ছা হইলে মাকড়সা ঐ আঠা নির্গত করিয়া তন্তুর আকারে স্বভাবসিদ্ধ রূপে জাল রচনা করে। আবার আবশ্যক হইলে ঐ জাল আকর্ষণ করতঃ গুটাইয়া লইতে পারে।

উপরি লিখিত উদাহরণে আমরা মাকড়সাকে রচয়িতা স্বরূপেও পাইলাম আবার মাকড়সারই অন্তর্গত অংশ বিশেষ যে রচনার-উপকরণ বা উপাদান স্বরূপ তাহাও পাইলাম।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঐরূপ। সেই চিদানন্দময় আদি কারণ নিজেই রচয়িতা অর্থাৎ বিশ্বের নির্ম্মাতা, আবার তাঁহার নিজেরই অংশ বিশেষ এই বিশ্ব রচনার সামগ্রী বা উপাদান। সুতরাং বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই ঈশ্বর পদার্থ। পদার্থ দ্বিতীয় নাই ও কখন ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বেও না পরেওনা। বরং সৃষ্টির পরে মায়াযুক্ত মানবের মনে মায়াবৃত দ্বিতীয় বস্তুর অনুভব হওয়া

অসম্ভব নয়; কারণ 'মায়া' অঘটন ঘটন পটীয়সী। উহা ঈশ্বরেরই তৃতীয়া শক্তি। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ইহাকে ঈশ্বরের 'বহিরঙ্গা শক্তি' নামে পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে বা আদৌ বা প্রথমে 'এক'ই ছিল। সেই একই ঈশ্বর। "একাত্মানাবপি ভুবি পুরা।"

সেই একই বহু হইবার ইচ্ছাবশে নিজেরই তৃতীয়া শক্তি অঘটন ঘটন পটীয়সী দ্বারা এই বহুবিধ বস্তু সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। যেমন যাত্রা'র দলে কোন ব্যক্তি কখন রাম কখন বিভীষণ সাজিয়া যাত্রা করে, সেইরূপ তিনিই—সেই 'এক'ই পুত্র, মিত্র, পত্নী, ভৃত্য পশু, পক্ষী আদি সাজিয়া জীবের সহিত, বা নিজেই নিজের সহিত, ক্রীড়া করিতেছেন।

যেমন একই সমুদ্রে নানা আকারের তরঙ্গ উত্থিত হয়, প্রত্যেক তরঙ্গ অপর তরঙ্গ হইতে পৃথক অথচ স্বরূপতঃ এক ও একই স্থানে উদ্ভূত এবং একই স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন পদার্থও এক হইতে উৎপন্ন হইয়া একেই অবস্থিত থাকে ও পরিণামে একেই মিশিয়া যায়।

ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভেদাভেদ—দেখিতে ভেদ, কিন্তু স্বরূপতঃ অভেদ। দেখিতে ভিন্ন কিন্তু স্বরূপতঃ এক।

যেমন একই কলে জল উত্থিত হইয়া নগরের লক্ষ লক্ষ নলদ্বারে বহির্গত হয়,—নগরবাসী মনে করে 'আমার বাড়ীর নল দিয়া যে জল পড়ে তাহা অন্যের বাড়ীর জল হইতে পৃথক, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র কলের শক্তিতেই সকল নল হইতে জল বহির্গত হয়, সেইরূপ মানবগণ কেহ মনে করেন 'আমি ডাক্তার চিকিৎসা করি' কেহ মনে করেন 'আমি বিচারক বিবাদ ভঞ্জন করি' ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু বস্তুতঃ কেহ পৃথক বা স্বতন্ত্র ভাবে কিছুই করেন না,—সেই একের শক্তিতেই সকলে চালিত। 'সূত্রে মণিগণাইব' সকলেই এক সূত্রে গ্রথিত। পরস্পরের পার্থক্য প্রতীয়মান মাত্র। পরমার্থতঃ এক, অভিন্ন; কোন প্রভেদ নাই। কারণ, দ্বিতীয় বস্তুই নাই। কাহার সহিত কাহার ভেদ হয়?

একস্থানে কতকগুলি বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, দেরাজ সিন্দুক প্রভৃতি আছে। একজন বলিলেন 'এখানে অনেক রকম কাঠের সামগ্রী

দেখিতেছি; আর একজন বলিলেন 'না, না, আমি একটি মাত্র বস্তুই দেখিতেছি, অর্থাৎ কেবল গাছই দেখিতেছি।' এস্থলে প্রথম ব্যক্তি বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক; আবার, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্তর্দৃশ্য দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মত আমরা যদি জগতের যাবতীয় বস্তু দেখিয়া তদন্তর্গত সেই একমাত্র পদার্থের সত্তা অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের ঈশ্বর দর্শন হয়। আমাদের ভেদ বুদ্ধি ঘুচিয়া যায় বিবাদ বিসম্বাদ মিটে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি আসে, পর আপন হয় এক কথায় আমরা ঈশ্বর পরায়ণ হই।

এইরূপে সেই একের দর্শন ঘটিলে আমাদের আর মৃত্যু ভয় থাকেনা। কাহারও মৃত্যুতে তাহাকে আর হারাইবার ভয় থাকেনা। কারণ সেই 'এক' একই আছেন। তাঁহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। যাহাকে আমরা মরণ বলিয়া ভয় করিতেছি তাহা সেই এককেত কমাইতে পারেনা। যাহাকে আমরা জন্ম বলিয়া আনন্দ করি তাহাত সেই একের বৃদ্ধি করিতে পারে না। সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রকে বাড়াইতেও পারেনা বা তাহা ভগ্ন হইলে সমুদ্রের হ্রাসও হয়না।

কোন বেতন ভোগী কর্ম্মচারীকে তাঁহার প্রভু একদেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করিলে প্রথমোক্ত দেশে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়না বটে, কিন্তু জগতে বা ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার একান্ত অভাব হয়না। কোন না কোন স্থানে কোন না কোন স্বরূপে থাকেন। শিশু যুবা হইল শিশু নাই বটে কিন্তু শিশু যুবা হইয়া আছে। ঠিক সেইরূপ, জীবের মৃত্যু বা একান্ত অভাব হয়না তাহার দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়, কিন্তু একান্ত ধ্বংস হইবার নয়, হয়ও না। শ্রীগীতা স্পষ্টই বলিয়াছেন—

বাসাংসি "জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" গীতা ২।২২

মাটীই ইট হয় বটে, কিন্তু যেমন মাটীর কার্য্য পৃথক এবং ইটের কার্য্য পৃথক। সেইরূপ সেই 'এক'ই জীব ও জীবদেহ রূপ ধরিয়াছেন সত্য, কিন্তু দেহ জীব নহে, অর্থাৎ দেহ আমি নই। আমি সেই ভিতরের জীব মাত্র। এই জ্ঞান হৃদয়কে অধিকার করিলে দেহের দিকে দৃষ্টি কমিয়া দেহান্তর্গত জীবের দিকে বা আত্মার দিকে দৃষ্টি পড়ে। এই আত্মাই জীব ও চিৎকণ। স্বরূপতঃ ঈশ্বরের

অংশাংশ, কিন্তু দেহাবদ্ধ হইয়া মায়ার বশীভূত অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির বোধক বা ভোক্তা হইয়া পড়ায় মায়াধীশ ঈশ্বরের সহিত বিভিন্ন। ইহাই ভেদাভেদ বাদ। যেমন অগ্নিকুণ্ডস্থ বৃহৎ অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বৃহৎ অগ্নিকে অন্ধকার আচ্ছন্ন করিতে পারেনা কিন্তু স্ফুলিঙ্গ সামান্য মাত্র অন্ধকারেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

ছেলেকে যে ভয় দেখায় সে সেই ভয়ে কাতর হয়না বটে কিন্তু ছেলেরা ভয় পায়। সেইরূপ ঈশ্বর বাজীকর; তিনি জানেন কোন্‌টা কি অথচ আমরা মায়ামুগ্ধ হইয়া 'এককে আর মনে করিয়া নানা প্রকার প্রতারিত ও বিষাদিত হইতেছি। আমরা সে ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারিতেছিনা। যদি কখন সেই একের অনুভব পাই, তবেই সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকার ন্যায় মায়াজাল আপনিই অপসৃত হইয়া যাইবে।

এ অধ্যায়ের উপসংহারে আমরা বলিয়া রাখিতে চাই যে এই মূল তত্ত্বের গুণ বা ধর্ম্ম সংখ্যা করা যায়না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যেখানে যত গুণ বা ধর্ম্মের পরিচয় পাই, সকলই সেই একের গুণের পরিণাম মাত্র সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই 'এক' অনন্ত গুণের আধার। তাই শাস্ত্র বলেন;—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগইতীঙ্গনাঃ॥"

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী। (৪)

(লেখক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।)

—:০:—

বধূর এইরূপ অজস্র সুখ্যাতি শুনিয়া নিমাই হাসিয়া উঠেন। গৃহ মধ্যে লক্ষ্মীদেবীও অতি সুখে হাসিতে থাকেন। প্রকৃতই লক্ষ্মীদেবী গুণবতী। তাহার গৃহ কর্ম্মের নিপুণতায়, তাহার সেবায় শচীদেবী অপার আনন্দ পান। ভাবেন মেয়েটী সামান্যা নহে তাহাতে দেবতার অধিষ্ঠান আছে। বৈষ্ণবকবি লোচনদাস বলেন,—

পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগত প্রাণ।
আনন্দে শচীর সেবা করয় বিধান॥

দেবতার সজ্জ করে গৃহ সম্মার্জ্জন।
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি মাল্য চন্দন॥
সব সংস্কারি দেয় দেবতার ঘরে।
বধূর শিল্পতায় শচী আপনা পাসরে॥

ঠাকুর নরহরি লিখিয়াছেন—

লক্ষ্মী-প্রায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
শাশুড়ির সেবা করে দিবস রজনী॥
পতি প্রতি অচলা ভকতি।
পতি সেবা করে দিনরাতি॥

এখন লক্ষ্মীর বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা নদীয়ার প্রাচীনা গৃহিণীগণের ন্যায়ই গৃহ-কর্ম্মে নিপুণা। শচীমার প্রাণে আনন্দ ধরে না। পল্লীনারীগণ তাঁহার গৃহে বেড়াইতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে বসাইয়া বধূর গুণের কথা বলেন। বড় দুখানি ঘর, আঙ্গিনা, বাহিরের ঘর, গঙ্গার ঘাটে গমনের ক্ষুদ্র রাস্তাটুকু সমস্তই লক্ষ্মীর আবির্ভাবে যেন হাসিতেছে। শচীমা বলেন বৌমাটী আমার বড় পয়মন্ত। তাহার আগমন অবধি আমার গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। নিমাই আমার বাহিরে থাকিতেই ভাল বাসে, আর যখন সে গৃহে থাকিতনা তখন তাহার অভাবে ঘরখানি যেন আঁধার বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু বৌমাটী আসিয়া পর্য্যন্ত আমার আর কোন দুঃখই নাই, বৌমা আমার ঘরখানি আলো করিয়া থাকে। আর এই বয়সে সে কত যত্ন করিতে শিখিয়াছে। আমাকে কত যত্ন করে। আমার নিমাইর কাজগুলি সে গুছাইয়া করে। নিমাই আমার দুরন্ত ছেলে। সে এক দণ্ডও ঘরে থাকিতনা, সর্ব্বদাই বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইয়া বাহিরে থাকিত, কিন্তু আমি তাহা ভালবাসিতাম না; এই ছাই বিদ্যা শিখিয়াই যে বিশ্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। বৌমার গুণে নিমাই আমার ঘরে থাকিতে শিখিয়াছে। আহারের পর বসিয়া কত কথা বলে—কত গল্প করে। এক কথায় পুত্রবধূর গুণ শচীর মুখে যেন ধরেনা। গৃহিণীরা বলেন দিদি, সত্য সত্যই তোমার বৌমাটী বড় ভাল। এমন বৌ আমরা ন'দের মাঝে দেখিনা।

বল্লভাচার্য্য তাহার আদরিণী বালিকাকে প্রায়ই দেখিতে আসেন। তাহার গৃহিণীও আইসেন। আহা! বাপ মার বক্ষের ধন বালিকা। তাহাদের যে বড় আদরের। তাঁহারা আসিলে শচী মা বড় আনন্দ পান, বড় যত্ন করেন। সে যত্ন বড় মধুর, আর তাঁহাদের কন্যার সুখ্যাতি সে যে মধু হ'তেও মধু। বড় সুখে তাঁহারা বলেন, বেহান! এ সমস্ত তোমার ও তোমার পুত্রের গুণ। তোমাদের গুণেই আমার মেয়েটীর এত যশ হইয়াছে। নিমাই দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করুক। এটীই যে আমাদের সব চেয়ে বড় সুখ আর নারায়ণের নিকটও ইহাই প্রার্থনা।

নিমাই মন দিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া নদীয়ার একজন বড় পণ্ডিত হইয়াছেন। সকলেই তাহাকে সম্মান করেন। বিষয়ী লোক তাহাকে পথে দেখিলে দোলা হইতে নামিয়া প্রণাম করিয়া যান। সকলেই তাহাকে দেখিলে আনন্দ পান। ডাকিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করেন। নিমাইকে কাছে পাইলে সকলেরই প্রাণে কোথা হইতে যেন আনন্দ আইসে। সকলেই বলেন নিমাইর কথাগুলি বড় মিষ্ট। এক কথায় নিমাইর নাম, নিমাইর ঘরের কথা সকলের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সুতরাং নিমাই, শচীমা, লক্ষ্মীদেবী ইহারা নদীয়ার আদর্শ। সুখ শান্তি ইহাদের নিকট পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান।

এইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দে, বিদ্যাবলে উন্মত্ত নিমাইর দিনগুলি কাটিতেছে। তিনি অধ্যায়ন শেষ করিয়া একটী টোল খুলিয়াছেন। নিমাই পণ্ডিতের নাম অনেক দূরদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাই বহুদেশ হইতে আগত বহু ছাত্র আসিয়া মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডী মণ্ডপস্থ নিমাইর টোল গৃহটী সুশোভিত করিয়াছিল। সুতরাং এখন তিনি একটু ব্যস্ত এবং পূর্ণ সংসারী। কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেও হঠাৎ তাহার মনে একটী খেয়াল জন্মিল। সে খেয়াল কি তাহা খুলিয়া বলিতেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা, নিমাই গদাধরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতরে বড় ঘর খানির দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। নিমাই ও গদাধরে বড় ভাব। গদাধর নিমাইর প্রতিবাসী—মাধব মিশ্রের পুত্র। বড় ভাল ছেলে। নিমাইর সমবয়সী, রূপও প্রায় তাঁহারই মত। তবে নিমাই চঞ্চল, গদাধর কিন্তু বড় শিষ্ট বড় শান্ত। গদাধর নিমাইকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন, এক দণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারে না। দু'জনে অনেক কথা হইতেছে। শচী

দেবী দূরে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন আর লক্ষ্মীদেবী রন্ধন গৃহে আছেন; নিমাই বলিলেন—দেখ ভাই, আমার একবার পূর্ব্বদেশ দেখিবার সাধ হইয়াছে। কিছুদিনের জন্য বাহির হইয়া পড়িব মনে করিতেছি। আর দেখ বিবাহ করিয়াছি, ঘরে বুড়া মা রহিয়াছেন, তাহার উপর—ইষ্ট মিত্র রমণী কুটুম্ব দাসদাসী ইহারাও ত আছে। এখন অর্থ উপার্জ্জনের আবশ্যক। বিদেশ গমন না করিলে তাহা কিরূপে হইবে। তাই আমি স্থির করিয়াছি, একবার বাহির হইয়া পড়িব। এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময়ে অদ্বৈত আচার্য্য, হরিদাস প্রভৃতি যাঁহারা তাহাকে ভালবাসিতেন তাহাদের অনেকেই আসিলেন। তাঁহারা নিমাইর এই সংকল্পের কথা শুনিলেন; শুনিয়া বিশেষ দুঃখিতও হইলেন। নিমাইর অদর্শন জনিত ভাবী বিরহের কথা স্মরণ করিয়া কাহারও চক্ষে জল আসিল। অনেকে আবার তাহার সহিত যাইবেন বলিয়া জিদ ধরিলেন। স্বভাব সুন্দর নিমাই, সকলের দুঃখ দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন আপনারা কি বলিতেছেন? সকলে গেলে আমার বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আমার বৃদ্ধা জননীকে কে দেখিবে, আর আমি সেখানে গিয়া কতদিনই বা থাকিব। শীঘ্রই চলিয়া আসিব। নিমাইর কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহসী হইল না।

আপনারা সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিয়াছেন নিমাইর পূর্ব্ব দেশ গমন ধনার্জ্জনের নিমিত্ত নহে। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলায়, ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ও পিতামহী শোভা দেবী এখনও বর্ত্তমান। নিমাই যখন তাহার মাতার গর্ভে, তখন শচীদেবী তাঁহার শাশুড়ির নিকট প্রতিশ্রুত হন যে গর্ভস্থ সন্তানটীকে তাঁহাদিগকে একবার দেখাইয়া যাইবেন। শচীদেবী কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। এদিকে উপেন্দ্র মিশ্র ও শোভা দেবী তাঁহাদের নাতিটীর অনেক কথা তত দূরে বসিয়া শুনিতে পান। একবার দেখিবার বড় সাধ হয়। কিন্তু তাঁহারা অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। অত দূরদেশে চলিয়া আসিবার ক্ষমতা নাই। নিমাইর পূর্ব্বদেশ গমনের ইহাও একটী কারণ। কিন্তু প্রকৃত কারণ অন্যরূপ।

সকলেই জানেন এবং আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মানুষকে প্রেমিক হইতে শিখাইবার জন্য স্বয়ং ভগবানই নিমাই হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কাজটী সিদ্ধ করিবার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বহুদেশ ভ্রমণ করিতেও হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তিবলে ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তখন আর পূর্ব্বদেশ গমনের সুবিধা হইবেনা বলিয়াই এখন সে কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিলেন।

এদিকে তিনি পূর্ব্বদেশ যাইবেন, সকলেই শুনিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবীও শুনিলেন। শুনিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন। তাহার স্বামী—যাঁহাকে তিনি সেই বালিকা বয়স হইতেই ভালবাসিয়াছেন সেই আরাধ্য দেবতা তাহাকে কতদিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন, কতদিন ধরিয়া তাহাকে একাকী থাকিতে হইবে? সে যে বড় দুঃখ। সে দুঃখ স্মরণ করিয়া বালিকা শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল ইহার উপায় কি, কি করিলে তাঁহার যাওয়া না হয়। সে যে তাহার প্রাণবল্লভকে ভালরূপেই জানে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা করিবেন। নিরূপায় বালিকা কি করিবে, বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন ভিন্ন আর এ বিপদে কাহার শরণ লইবে। বড় দুঃখে বালিকা গৃহাধিষ্ঠিত দেবতার নিকট প্রাণের বেদনা জানাইল কিন্তু ঠাকুর পাষাণ হইয়া রহিল বালিকার বুকের বেদনা বুঝিল না।

তখন অপরাহ্ন, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যা হয় হয়। নিমাই সঙ্গীদের লইয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছে। এদিকে বালিকা লক্ষ্মীর মনে সুখ নাই, প্রাণে শান্তি নাই, সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, ভাবিতেছে কি করিলে এ যাওয়া না হয়। শচীদেবী তাহার শুষ্ক মুখখানি দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। নিজের দুঃখ ভুলিয়া তাড়াতাড়ি বালিকাটীকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিলেন। বলিলেন "চিন্তা কি মা! নিমাইর ওসব বাজে কথা। তাহার কিসের দুঃখ কিসের অভাব যে তাহাকে ধন উপার্জ্জনের জন্য বিদেশ যাইতে হইবে?" বালিকা কিন্তু আজ কিছুতেই শান্তি পাইতেছেনা। যন্ত্র চালিতের ন্যায় যেন কার্য্য করিয়া যাইতেছে। কাজগুলি সব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতেছেনা। অনেক কাজে ভুল থাকিয়া যাইতেছে। একবার পায়ে হোঁচট লাগিল। শচীমা তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি বড়ই কাতরা হইয়া তাহাকে কাছে করিয়া লইয়া বসিলেন। বলিলেন মা! আজ তোর

তোমার কিছু করিয়া কাজ নাই। তাহার নিজের মনেও সুখ নাই কিন্তু বধূর মনোভাব দেখিয়া নিজের মনোকষ্ট চাপা দিলেন। নানা কথা বলিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

শচীমাতা মালা জপ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজ আর তাঁহার মালা জপ হইতেছেনা। তাঁহার বাম হস্তখানি শ্রীমতীর পৃষ্ঠদেশে ছিল। তাহাকে ভুলাইবার জন্য নানা কথা বলিতে হইতেছে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে মালা জপ আর হইতেছেনা। এমন সময় শ্রীমতীর প্রিয়সখী চিত্রলেখা আসিলেন। শচীমা ভাবিলেন ভালই হইল। এখন দু'জনে গল্প করিয়া অনেকটা ঠাণ্ডা হইতে পারিবে।

চিত্রলেখা আসিয়া শ্রীমতীর হাতখানি ধরিয়া অন্য গৃহে লইয়া গেলেন। আর দেখিলেন তাহার সখীর সুন্দর মুখখানি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। চিত্রলেখা বড় বুদ্ধিমতী। নিমাই চাঁদের কোনরূপ ব্যবহারেই যে শ্রীমতী এত দুঃখ পাইয়াছেন তাহা বুঝিলেন। তবে নিমাই চাঁদ যে বিদেশে যাইবেন তাহা তিনি এ পর্য্যন্ত জানিতেন না। বলিলেন সখী, তোমার কি হইয়াছে, মুখখানি এমন আঁধার দেখিতেছি কেন, আমার যে বুক ফাটীয়া যাইতেছে, পণ্ডিত ঠাকুর কি তোমাকে কিছু বলিয়াছেন? (চিত্রলেখা নিমাইকে পণ্ডিত ঠাকুর বলিতেন।) শ্রীমতী এতক্ষণ তাহার সখীর গলা জড়াইয়া তাহার বুকে মুখখানি লুকাইয়া ছিলেন এক্ষণে সখীর কথা শুনিয়া মুখখানি তুলিয়া বলিলেন,—না সখী তোমার পণ্ডিত ঠাকুর আমায় কিছুই বলেন নাই। আর তুমি ত জান তিনি তেমন লোক নহেন। এই বলিয়া তিনি তাঁহার বিষাদের কারণটী সখীকে বুঝাইয়া বলিলেন। সখী চিত্রলেখা এ কথা শুনিয়া ক্ষণকাল একটু চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন না সখী তুমি ভুল বুঝিয়াছ। পণ্ডিত ঠাকুরের বিদেশ যাইবার কি আবশ্যক আছে, তোমাদের গৃহে ত কোন অভাব নাই। সুতরাং তাঁহার কি এমন অভাব হইল যে ধন উপার্জ্জনের জন্য বিদেশ যাইতে হইবে। না না সখী তুমি ওসব কথা একেবারেই বিশ্বাস করিওনা।

শ্রীমতী বলিলেন না সখী তুমি তোমার পণ্ডিত ঠাকুরকে চিননা। তাঁহার যেই কথা সেই কাজ। তিনি যাইবেনই, আর আমিও তাহা হইলে প্রাণে মরিব, তাঁহার বিরহ আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবনা।

চিত্রলেখা একথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার কাণে একথা ভাল শুনাইলনা। তিনি একবার সভয়ে সখীর মুখখানির দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সে মুখখানি বড়ই শুষ্ক বড়ই মলিন। তিনি বুদ্ধিমতী বুঝিলেন এ প্রসঙ্গ লইয়া আর অধিকক্ষণ আলোচনা করা উচিত নহে, বলিলেন সখী, ঠাকুরের ফিরিবার সময় হইয়াছে আরতিরও সময় হইয়াছে। ঠাকুরঘরে পুজার সজ্জা করিয়া দাও। ক্রমশঃ।

ভাবশুদ্ধি কোথায়।

(পল্লীবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

সম্প্রদায়ের উন্নতি হইলে, সম্প্রদায়ীর আনন্দের অবধি থাকে না। আমার ইষ্ট, আমার ধর্ম্ম, আমার মতবাদ জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এ সংবাদে কাহার না হৃদয় প্রফুল্ল হয়? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এমনই উন্নতির লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া আজি কালি কোন কোন ভক্ত ভাই আনন্দে অধীর হইয়া থাকেন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, দিকে দিকে এখন শ্রীশ্রীগৌর-ধর্ম্মের বহুল প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। বহু সাহিত্যসেবক এখন গদ্যে পদ্যে নাট্যে উপন্যাসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত সত্য প্রখ্যাপনে ব্রতী হইয়াছেন। উল্লেখযোগ্য সকল সাময়িক পত্রে এখন এমন সংখ্যা নাই বলিলেও হয়, যাহাতে শ্রীগৌড়ীয় ধর্ম্মের কোন না কোন কথার আলোচনা নাই। তা' ছাড়া কাব্যকলার চরমোৎকর্ষ যে চারুচিত্র ও কারুশিল্প, তাহার ভিতর দিয়াও এখন বৈষ্ণবের নানা তত্ত্বের বিশ্লেষণ চেষ্টার পরিচয় পাই। সঙ্গীতেও এখন পদাবলী-সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ আসন অবিসম্বাদিত।

শুধু তাহাই নহে, দেশে এখন যে একটা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবের বাতাস আসিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মকে জড়াইয়া লইবার উৎকট বাসনা অনেক স্থলে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে এখন প্রায়ই

হরিসভা হইতেছে, বক্তৃতা হইতেছে; পাঠ-কীর্ত্তন-কথকতাতেও এখন উত্তরোত্তর লোকের মতিগতি ফিরিতেছে; এ সকলই ত গৌরনাম প্রচারের পরম সহায়! তারপর বিভিন্ন প্রান্তে যে সব মহাপুরুষ আজকাল সিদ্ধ বলিয়া সম্মানিত, তাঁহাদের অধিকাংশই যখন শ্রীগৌরাঙ্গের দোহাই দিতেছেন, তখন তাঁহাদের শিষ্যবর্গ মধ্যে যে শ্রীগৌর-ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

এইরূপে নানা প্রকারে নানা দিক্ হইতে নানাজনের সাহায্যে আমাদের শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু, এ সময় শুধু আনন্দে অধীর হইয়া আত্মহারা থাকিলে চলিবে না। এই প্লাবনের মুখে তরণীকে সংযত রাখিতে পারিলেই না কর্ণধারের শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট হয়! নতুবা চারিদিকের এই উদ্বেল উচ্ছ্বাসের মধ্যে সচ্ছন্দচারণে ছাড়িয়া দিলে, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় কোথায় সে চূর্ণ হইয়া যাইবে। যে সংযম বলে শত শত যুগের শত বিপ্লব প্রতিরোধ করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আজিও আপন অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ রহিয়াছে, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যবৃন্দ তৎপ্রতি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

কথাটা একটু খোলসা করিয়াই বলি। আজ কাল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া শ্রীগৌড়ীয় ধর্ম্মকে যে বর্ণাশ্রমেতর উদার ধর্ম্মরূপে উপস্থাপিত করতঃ বাবু-বৈষ্ণবেরা একটা জগাখিচুড়ী পাকাইবার ফিকির করিতেছেন, খাঁটি বৈষ্ণবগণকে আমরা সেইটার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিতে পরামর্শ দেই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু নামসংকীর্ত্তনে সাধারণের সমান অধিকার দিলেও, অন্তরঙ্গ-সাধনে সাড়ে তিন জনেরই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। আপামর চণ্ডালকে কোল দিয়া কৃতার্থ করিলেও প্রভু কখন ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। গম্ভীরমধুর শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্রের এই সকল চমৎকারিত্বে লক্ষ্য না রাখিয়া আজি কালি যে মগম্লেচ্ছ জড়াইয়া গৌড়ীয় ধর্ম্ম খাড়া করিবার চেষ্টা চলিয়াছে, গোস্বামিগণ প্রতিপাদ্য প্রকৃত গৌরধর্ম্ম যে তাহা হইতে নিতান্ত স্বতন্ত্র, ইহাতে যেন কাহারও ভুল না হয়। যাহারা মনে প্রাণে গৌর মানে না, তাহারাও এখন গৌরধর্ম্মের বক্তা, কথক ও ব্যাখ্যাতা সাজিয়াছে তাঁহারা গৌরনামের দোহাই দিতেছেন বলিয়া আমাদের আদরণীয় হইলেও একান্ত

ভাবে গৌরনির্ভর করিতে না পারায় তাঁহাদের কথা আদৌ ভাবশুদ্ধ হয় না। অধিকাংশ স্থলে বরং সিদ্ধান্তবিরোধ হইয়া বিষম বিষময় হইয়া উঠে। গৌর প্রাণ ভক্তগণকে আত্মমঙ্গলের জন্যই আমরা সম্প্রদায়ের এই ভাব বিপর্য্যয়ের প্রতি অবহিত হইতে বলিতেছি।

(শ্রীব্রহ্ম-কৃত গোবিন্দ-স্তব।)

—:•:—

(১)

নিখিল নিলয় যথা চিন্তামণি ময়।
চারিদিকে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ চয়॥
কামধেনুবৃন্দ যথা স্নেহে সুরক্ষিত।
নিরজনে লক্ষ্মীগণ যথা সেবারত॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

(২)

মুরলী বাদন পর পদ্মদলেক্ষণ।
চূড়ায় ময়ূর পাখা মস্তক রঞ্জন॥
শ্যামল জলদ কান্তি শ্রীঅঙ্গ যাঁহার।
কোটী কাম জিনি কমণীয় শোভা যাঁর॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

(৩)

শিখিপুচ্ছ প্রান্ত যাঁর কাঁপিতেছে শিরে।
বনমালা গলে শোভে মুরলী অধরে॥
রতন অঙ্গদ উভভুজে রাজে যাঁর।
সপ্রণয় পরিহাস বিলাস যাঁহার॥

ত্রিভঙ্গ ললিত শ্যাম সদা প্রকাশিত।
ভজি শ্রীগোবিন্দ আদিপুরুষ নিয়ত॥

(৪)

উজ্জ্বল বিগ্রহ যাঁর চিদানন্দ ময়।
সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিশীল যাঁর অঙ্গচয়॥
দর্শন শ্রবণ আদি করি অনুক্ষণ।
এ জগৎ চিরদিন করিছে পালন॥
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি॥

(৫)

আদি নাই যাঁর রূপ অনন্ত যাঁহার।
অচ্যুত অতুল যিনি আদ্য সবাকার॥
পুরাণ পুরুষ নব যুবা নিরন্তর।
সুদুর্লভ চারিবেদ ভক্তিতে সুকর॥
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি॥

(৬)

পবন অথবা মুনিশ্রেষ্ঠ শুদ্ধমন।
কোটীবর্ষে যায় যথা করি বহু শ্রম॥
সেই পথ নিরন্তর আছে বিরাজিত।
যাঁর চরণাগ্রে যার শক্তি চিন্তাতীত॥
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি॥

(৭)

হইলেও এক যিনি পারেন সৃজিতে।
কোটী কোটী ভূমণ্ডল অদ্ভুত শক্তিতে॥
সে ব্রহ্মাণ্ডগণ আছে যাঁহাতে নিয়ত।
ক্ষুদ্র অণু ব্যাপিয়াও যিনি অবস্থিত॥

আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

(৮)

যাঁর রূপ ভাবিতে ভাবিতে নরগণ।
তন্ময় হইয়া লভে মহিমা তেমন॥
সেইরূপ রূপ যান আসন ভূষণ।
বেদ উক্ত সূক্ত মন্ত্রে করে আরাধন॥
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি॥

(৯)

চিন্ময় আনন্দ রসে রচিত মূরতি।
অখিল বিশ্বের আত্মা যেই বিশ্বপতি॥
হ্লাদিনীর বৃত্তি ভূতা প্রিয়াগণ সহ।
শ্রীগোলোকে বিরাজিত রন অহরহ॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

(১০)

শ্যামল সুন্দর যাঁর রূপ গুণচয়।
চিন্তাতীত কভু নহে চিন্তার বিষয়॥
প্রেমাঞ্জনে সুরঞ্জিত ভকতি নয়নে।
অন্তরে বাহিরে যাঁরে হেরে সাধুগণে॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
সদা ভজি শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

(১১)

পরম পুরুষ যেই স্বশক্তি বিধানে।
রাম আদি বহুমূর্ত্তি প্রকাশি' ভুবনে॥
করিলেন অবতার বিবিধ প্রকার।
আপনি শ্রীকৃষ্ণ রূপে হৈলা অবতার॥

আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

(১২)

অগণ্য বসুধা আদি বিভূতি নিচয়।
হেরিলে যাঁহারে ভেদ প্রাপ্ত মনে হয়॥
অনন্ত অশেষ যিনি অংশ নাই যাঁর।
হেন ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি যাঁর চমৎকার॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

(১৩)

যাঁর মায়া প্রসবে ব্রহ্মাণ্ড শত শত।
ত্রিগুণে সগুণ বেদে যে মায়া বিস্তৃত॥
হইয়াও মায়িক বিমিশ্র সত্ত্বাশ্রয়।
তদতীত শুদ্ধ সত্ত্ব রূপ যেই হয়॥
গোলোকের পতি সেই আদিম পুরুষে।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দে মনের হরষে॥

(১৪)

উজ্জ্বলাখ্য প্রেমরসে হৈয়া আলিঙ্গিত।
মন্মথ-মথনরূপে হন প্রতিভাত॥
অখিল জীবের মনে যেই প্রেমময়।
অমানুষী লীলাবশে বিশ্ব করি' জয়॥
আদিমপুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি।

ক্রমশঃ।

শ্রীসত্য চরণ চন্দ্র বি, এল।

প্রার্থনা।

—০—

অপরাধ সহস্রসঙ্কুলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

দয়াময়! দীনের গতি কি হইবে? তুমি দয়া করিয়া একবার কৃপাদৃষ্টিপাত না করিলে উদ্ধারের যে আর কোনই উপায় দেখিতেছি না। আমার অবস্থা যে অতি শোচনীয় হইয়াছে, অপরাধের বোঝা দিন দিন বাড়াইয়া একেবারে চরমে উঠাইয়াছি। অপরাধের সীমা যার আছে তার প্রায়শ্চিত্তও আছে, কিম্বা তোমার নিকট সে প্রার্থনাও করিতে পারে যে, আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত করুন। কিন্তু প্রভো! আমার যে অপরাধের সীমা পরিসীমা নাই; অসীম অপরাধে অপরাধী তাই এমন ভয়ঙ্কর সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, যেদিকে চাই কূল-কিনারা দেখিতে পাই না। অতি ভীষণ সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া অবিরত ডুবিতেছি, উঠিবার অবলম্বন তো পাই না; জীবনে যে উঠিতে পারিব এমন আশাও করিতে পারিতেছি না। তাই হতাশপ্রাণে অগতির গতি, পতিতের একমাত্র ভরসাস্থল তোমার ঐ রাঙ্গাচরণে শরণ লইলাম। শরণাগত বৎসল! অধমকে শ্রীচরণে স্থানদানে উদ্ধার করিয়া তোমার করিয়া লও, আমিও সকল যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রাণ ভরিয়া বলি—

"তুমি একজন হৃদয়ের ধন দীনবন্ধু দয়াল হরি।
(আমি) মনপ্রাণ সব তোমায় দিয়ে হইলাম তোমারি॥"

দীনশরণ! বিষয়ভোগ তৃষ্ণাই আমাকে সং ভুলাইয়া অনন্তের দিকে লইয়া যাইতেছে, বিষয় বিষকে সুরস বোধে পান করিয়া এখন জ্বালায় জ্বলিতেছি, এবং "আমি তোমার তুমি আমার" এই শান্তিপ্রদ সম্বন্ধ ভুলিয়া "আমি আমার" এবং আমারই সকল ইত্যাকার কুসংস্কারে জীবন বিপন্ন করিতেছি, আর কেন প্রভু, দীনহীনকে পরীক্ষা করিয়া আর বিপন্ন করিও না, তোমার করিয়া লও। তোমার চরণে আজ আমার ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীগোপালভট্টের মনোবাঞ্ছা।

দীনবন্ধু, পতিতপাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব, পতিত উদ্ধারের জন্য, কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য কত না করিয়াছেন, অবশেষে সন্ন্যাসী সাজিয়া তীর্থপর্য্যটন ছল করিয়া পতিতজীবের দ্বারে দ্বারে দীনহীন কাঙ্গালের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।

এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভু আমার ভট্টমারি গ্রামে ভাগ্যবান বেঙ্কটভট্টের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত, বেঙ্কটভট্টের পুত্রের নাম শ্রীগোপালভট্ট। যদিও বয়স অল্প তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গে উঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর সেবা প্রর্থানা করিতেন, ভক্তবৎসল অন্তর্য্যামী ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাই বুঝি বালক গোপালভট্টের নিকট আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত।

তীব্র ব্যাকুলতা আসিলে—অকপটভাবে সেবা করিবার ইচ্ছা প্রাণে জাগিলে এমনি করিয়াই ভগবান আসিয়া থাকেন। এই সত্য জগতে দেখাইতেই বুঝি আজ প্রভুর গোপালভট্টের নিকট আগমন। যাহাই হউক প্রভুকে পাইয়া গোপালভট্টের আর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই; একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, আপনাকে ভুলিয়া গিয়া গোপালভট্ট প্রভুর সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। ভগবান ত ভক্তের অধীন চিরকালই, তিনি ত নিজেই বলিয়াছেন ;— 'অহং ভক্ত পরাধীন।" আরও বলিয়াছেন ;—

"ভক্তের হাতে প্রেমের ডুরি,
যে দিক্ ফিরায় সে দিক্ ফিরি।"

প্রভুও তাই ভক্তের ভক্তিডুরিতে আবদ্ধ হইয়া চারিমাস কাল ভট্টমারি গ্রামে থাকিয়া প্রিয়ভক্ত গোপালভট্টের সেবা গ্রহণ করিলেন, অবশেষে তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দ্বারা শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। ধন্য গোপালভট্ট তুমিই ধন্য—আর ধন্য তোমার পিতামাতা ও তোমার জন্মভূমি। তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রভু আমার নীলাচল হইতে তোমার নিকটে উপস্থিত। একেই তো বলে ভক্তি—একেই তো বলে প্রেমের টান।

ভাগ্যবান গোপালভট্ট এইভাবে প্রভুর কৃপালাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে ডগমগ হইয়া গেলেন। আর তাহাকে বাঁধে কে? ঐশ্বর্য্য! তুমি ভট্টকে আটকাইয়া রাখিবে? কখনই নয়, জগতের সকল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী যিনি তিনিও যাঁর পদতলে দাসী হইয়া পদসেবা করিতেছেন, তাঁহার সুমধুর আহ্বান

গোপালভট্টের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে আর তাহাকে কেমন করিয়া রাখিবে? সচ্চিদানন্দঘন প্রেমময় শ্রীভগবানের দয়া যাহার উপর একবার পড়িয়াছে—পিতামাতার তুচ্ছ স্নেহবন্ধন, তুচ্ছ বিষয়ের প্রলোভন, তুচ্ছ—অতিতুচ্ছ কামিনীর মনোমুগ্ধকারিণী মোহিনী শক্তি, বন্ধু-বান্ধবের মমতা তাহাকে কেমন করিয়া আট্‌কাইতে পারে? তাই গোপালভট্ট কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ-প্রায় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন ক'রলেন এবং তথায় প্রেমবিভোর ভাবে শ্রীশালগ্রামরূপী নারায়ণের সেবায় আপনার সর্ব্বেন্দ্রিয়-মন নিযুক্ত করিলেন।

এমনি করিয়া সেবানন্দে গোপালভট্টের দিন চলিয়া যাইতেছে। একদিন কোন৺ ধনী শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ সকল দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন, তাই প্রাণের আবেগে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার ও সেবার নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার ভিন্ন ভিন্ন দেবমন্দিরে প্রেরণ করিলেন, ক্রমে গোপালভট্টের শালগ্রামের সম্মুখেও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার ও নানাবিধ সেবার উপচার আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপালভট্টের আনন্দ আর ধরে না, নয়নে প্রেমধারা, সর্ব্বাঙ্গ পুলকেভরা বদনকমলে সুমধুর হাস্য ভট্ট যেন একেবারে কেমন হইয়া গেলেন। প্রেমভরে একবার বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির দিকে চাহিতেছেন আবার শ্রীশালগ্রাম শিলার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, বড়ই বাসনা এই সব বস্ত্রালঙ্কারে প্রভুকে সাজাইবেন।

হটাৎ ভট্টের চমক্ ভাঙ্গিল। এতো ভট্টের চমক্ ভাঙ্গা নয়, এ যে অবিশ্বাসী জগবাসীর চম্‌ক ভাঙ্গা, এযে গোপালভট্টকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া জগতের জীবকে দেখান যে, ভগবান ভক্তের নিকট সম্পূর্ণ অধীন।

যাহাহউক হঠাৎ ভট্টের মনে হইল—তাই তো আমার শালগ্রাম শিলার যদি হস্তপদাদি অবয়ব থাকিত;—ভক্ত গোপালভট্ট আর ভাবিতে পারিলেন না কান্দিতে কান্দিতে ভুমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বাহিরের লোকে দেখিল ভট্ট কান্দিতে কান্দিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়াছেন।

আর কি প্রভু থাকিতে পারেন? যিনি দ্রৌপদীর জন্য বস্ত্ররূপধারণ করিয়াছিলেন—যিনি স্তম্ভের মধ্যে অপরূপ নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছিলেন যিনি মোহনমূর্ত্তিতে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষিতকে রক্ষা করিয়াছিলেন আজ তাঁর অতি প্রিয়ভক্ত গোপালভট্ট হস্তপদাদি সংযুক্তমূর্ত্তি দেখিবার বাসনা করিয়াছেন এ অবস্থায় আর কি তাঁর স্থির থাকা হয়? কে যেন গোপালভট্টের কাণে কাণে জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া দিল "গোপাল উঠ, একবার শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখ আমার হস্তপদাদি সমস্তই আছে।"

এ কি? গোপাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায় কোথায়? একেবারে মন্দিরের মধ্যে। ওকি? গোপাল আবার কাঁদ কেন? তোমার কোলে ওকি, অমন ভুবনমোহন ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠাম মুরলীধরমূর্ত্তি গোপাল কোথায় পাইলে? তোমার সে শালগ্রামশীলা কোথায় গেল?

গোপাল যেন ভুতাবিষ্টের মত বির্‌বির্ করিয়া কি বলিতেছে। ভক্তগণ কাছে যাইয়া শুনিলেন গোপাল কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন প্রভো! এত দয়া তোমার তবুও তো তোমায় চিনিতে পারিলাম না। আমি নগন্য ক্ষুদ্র কীটানু-কীট আমার ইচ্ছামাত্র তুমি শালগ্রামশীলা হইতে এমন অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময় মূর্ত্তি প্রকট করাইলে। আবার অবিশ্বাসী জীব যদি বিশ্বাস না করে তাই তাহাদের বিশ্বাস-জন্য সেই শালগ্রামশীলা নিজপৃষ্ঠদেশেই বহন করিতেছ? ধন্য তোমার লীলা, লীলাময় ধন্য তুমি—আর ধন্য তোমার লীলা-দর্শকগণ।”

পাঠকগণ! ব্যাপার কিছু বুঝিলেন কি? গোপালভট্টের ইচ্ছা হইল বস্ত্রালঙ্কার প্রভুকে পরাইব। কিন্তু শালগ্রামশীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করিলেন আমার ঠাকুরের যদি হস্তপদাদি থাকিত তাহা হইলে এই সমস্ত অলঙ্কার মনের সাধে পরাইতে পারিতাম। অমনি যে ভাবনা সেই কার্য্য, সঙ্গে সঙ্গে সেই শালগ্রাম হইতে ইন্দীবর শ্যাম ত্রিভঙ্গ-মুরলীধর গোবিন্দমূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। শুধু তাহা নহে পাছে কেহ অবিশ্বাস করে তাই সেই শালগ্রামশীলাটী দ্বিখণ্ডিত অথচ সংলগ্নভাবে বিগ্রহের পৃষ্ঠদেশে বিরাজমান।*

এক্ষণে আমরা কাহার জয় দিব। ভক্তের না ভগবানের; যে যাহাই বলুন না কেন, আমি তো বলি প্রাণভরিয়া গোপালভট্টের জয় ঘোষণা করাই শ্রেয়। ভক্ত গোপালভট্ট তুমিই ধন্য? ধন্য তোমার সেবাপ্রীতি, ধন্য তোমার শক্তি, আজ শালগ্রাম হইতে তুমি চিদ্‌ঘনবিগ্রহ প্রকট করাইলে? কেনই বা হবে না, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান তোমার প্রেমে বাঁধা; যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, যাঁর শক্তিতে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত তিনি আজ তোমার ইচ্ছায় নাচিতেছেন, তোমার ইচ্ছায় সাজিতেছেন, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিতেছেন।

গোপালভট্ট শ্রীবিগ্রহের রূপদর্শনে একেবারে বিহ্বল, একবার কোলে লইতেছেন, একবার মুছাইতেছেন, একবার বসাইয়া দর্শন করিতেছেন, যেন আশা মিটিতেছে না। ক্রমে স্থির হইয়া সেই সমস্ত পরিচ্ছদাদি লইয়া মনের সাধে রাধারমণের শ্রীঅঙ্গে পরাইতে লাগিলেন।

* অদ্যাপিও শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ বিরাজিত, লেখক সৌভাগ্যবলে নিজে দর্শন করিয়া এবং বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে উহা কৃত্রিম নয়।

গোপালভট্টের হাতে আজ ভগবান শ্যামসুন্দর বড়ই সুন্দর সাজিতেছেন। ভট্ট এক একখানি অলঙ্কার এক এক অঙ্গে পরাইতেছেন, আর এক একবার শ্রীমুখকমল পানে চাহিয়া অঝোরে প্রেমবারি ঢালিতেছেন। আজ গোপালভট্টের কি আনন্দ, ভগবান নিজে মদনমোহনরূপে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আর তিনি নিজে অবাধে মনোসাধে তাঁহাকে সাজাইতেছেন। তারপর ইহাতে তাহার নিজের কোন কামনা নাই, শুধু ভক্ত সেই রূপ দেখিতেছেন আর আনন্দময়ের রূপসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন।

ভাই-বন্ধু স্ত্রী-পুত্র ধন-রত্ন তোমরা কেউ কি এই আনন্দের সমান তো দূরের কথা ইহার শত ভাগের একভাগ আনন্দও দিতে পার? না কখনই নয়, তাহা যদি পারিতে তবে ভক্ত কখনই সব ছাড়িয়া ভগবানের জন্য এমন ভাবে ব্যাকুল হইতে পারিত না।

দয়াময় শ্রীগোবিন্দ! তোমার লীলা তুমিই জান—আর তোমার ভক্তের মনোভাব তুমিই বুঝিতে পার। আজ ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য লীলারূপী নারায়ণ হইতে এমন ভুবনমোহন মূর্ত্তির বিকাশ করিলে। ধন্য তোমার ভক্তবাঞ্ছাপূরণলীলা, আর ধন্য তোমার ভক্ত। হরিবোল।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী। (৫)

(লেখক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা)

সখীর কথা শুনিয়া শ্রীমতীর আবার গৃহকর্ম্ম মনে পড়িল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুরঘরের দিকে গেলেন। ঠাকুরঘরের রাস্তায় বসিয়া শচীমা মালাজপ করিতেছিলেন, তিনিও ইঙ্গিত করিয়া শ্রীমতীকে ঠাকুরঘরেই যাইতে বলিয়া দিলেন। লক্ষ্মীদেবীও ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে নিমাইচাঁদ গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—ঠাকুরের আরতির সময় হইয়াছে বুঝিয়া গৃহে ফিরিলেন, বুঝিবা সেদিন তাঁহার একটু শীঘ্র শীঘ্র গৃহে ফিরিবার আবশ্যকও হইয়াছিল।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতি কার্য্য শেষ হইলে নিমাই ঠাকুরঘরের বাহিরে যেখানে শচী মা বসিয়া মালাজপ করিতেছিলেন তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন। নিমাইর চাঁদমুখখানি দেখিয়া শচীমার বুক আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া বড় স্নেহে তাহার মাথায় আপন হাতখানি রাখিলেন। জননীর

এই স্নেহস্পর্শে নিমাই যেন কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত একটু বিমনা হইয়া পড়িল। না—না তাহা হইলে চলিবে না—তাহার যে আজ কিছু বলিবার আছে। তিনি সাহস সঞ্চয় করিলেন। পুত্র-স্নেহ-পাগলিনী মাতার প্রাণে তিনি আজ যে আঘাত দিতে যাইতেছেন তাহার জন্য সাহস সঞ্চয়ের দরকার বই কি! নিমাই জানে তাহার জননী একদণ্ড তাহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। ছেলেটী যে বৃদ্ধার নয়নমণি। লোকে বলিবে যে কোন্ জননীর নিকটই বা তাহার পুত্র স্নেহের আধার নয়নমণি তুল্য নহে? কথা সত্য বটে। কিন্তু নিমাইর মত এমন রূপে গুণে অতুলনীয় পুত্র কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। নিমাই ভাবিতেছেন, কাল ত প্রবাস-যাত্রা করিবার দিনস্থির করিয়াছি। এখন কিরূপে মায়ের অনুমতি লই; নিমাই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেন মাতা অতি স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন; "হাঁরে নিমাই আমার মনে হইতেছে তুই যেন আমাকে কিছু বলিতে চাহিস।" নিমাই বলিলেন—"হাঁ মা! আমি সত্য সত্যই তোমায় কিছু বলিব, আমি তোমার অনুমতি লইতে আসিয়াছি যে, কাল অপরাহ্নে প্রবাস-যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি; এক্ষণে প্রসন্ন মনে আমাকে অনুমতি দাও যেন মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া শীঘ্রই তোমার কাছে ফিরিয়া আসিতে পারি।" শচীমা পুত্রের কথায় বড়ই কাতরা হইলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য বিহ্বল হইয়া পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন—"এমন কথা মুখে আনিস না বাপ! তোর কিসের অভাব যে তুই বিদেশে যাইবি।" নিমাই বলিলেন—"মা তুমি কাতর হইও না, আমি শীঘ্রই ফিরিব, আর আমার অনুপস্থিতি কালে শ্রীবাস পণ্ডিত তোমাদের দেখা শুনা করিবেন। গদাধর মুকুন্দমুরারি হরিদাস এরা রহিল নিত্য তোমার তথ্য লইবে, আর আমিও বেশীদিন থাকিব না। ফিরিবার সময় তোমার জন্য গরদের জোড়, তোমার বধূর জন্য কত অলঙ্কার আনিব। আর অন্যান্য দ্রব্য এত আনিব যে দেখিবে তোমার ঘরখানি ভরিয়া যাইবে।" মাতা বলিলেন—"হাঁরে নিমাই তুই আমাকে অবোধ শিশুর মত কি ভুলাইতেছিস্, তোকে না দেখিলে যে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখি। তুই যদি বিদেশে গমন করিস্ আমি আর কিসুখে কাহাকে লইয়া গৃহে থাকিব বলত? আর তুই যে গদাই হরিদাস মুকুন্দ প্রভৃতির নাম করিলি তারা কি আর তোকে না দেখিলে এ নবদ্বীপে থাকিতে পারিবে? তারপর বধূমাতার কথা একবার ভাবিয়া দেখ, সে নিতান্ত বালিকা তোকে ছাড়া সে যে আর কিছুই জানে না। আহা!

সরলা বালিকা সে যে এত দুঃখ সহিতে পারিবে না। তার বুকে শেল হানিয়া যেতে কি তোর একটুও কষ্ট হবে না।" এসব কথা নিমাইর ভাল লাগিল না। বড় দুঃখে মুখখানি তাহার আঁধার হইয়া গেল। বুঝিলেন এ অবস্থায় আর জননীকে নিবৃত্ত করা যাইবে না। চতুর নিমাই বড় চতুরতা করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন "মাগো! তুমি যে নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়েছ, দেখ দেখি কতখানি রাত হ'য়েছে আমার বুঝি আর ক্ষুধা পায় না।" সন্তানের ক্ষুধার কথায় জননী বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন "নিমাই বোস বাবা, আমি দেখে আসি রান্নার কতদূর হইল। কিন্তু তাঁহাকে যাইতে হইল না। দেখিলেন তাঁহার বধূমাতা অবগুণ্ঠণে দেহটী ঢাকিয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইতেছে। শচীমা বুঝিলেন মনের চাঞ্চল্যে বালিকা রন্ধনের কথা ভুলিয়া এতক্ষণ তাহাদের কথাই শুনিতেছিল।

তখন দুইজনে মিলিয়াই রন্ধনগৃহে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন আর শচীদেবী দরজার নিকট বসিয়া বধূর সহিত নানাপ্রকার সুখ-দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন।

এদিকে এই অবসরে নিমাই গঙ্গার ধারে একটু বেড়াইতে গিয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার ছেলে ত সে নহে। রন্ধনকার্য্য শেষ হইল মা দেখিলেন ছেলে তাহার ফিরিয়া আসিতেছে; সঙ্গে গদাধর, এরূপ প্রায়ই ঘটিত। নিমাই গদাইকে লইয়া একত্রে খাইতে বড় ভালবাসিতেন। শচীমাও গদাইকে বড় ভালবাসিতেন। সে বড় ঠাণ্ডা ছেলে নিমাইর মত চঞ্চল নহে। দেখিলে তাহার প্রাণটা ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। এক্ষণে নিমাইর সহিত গদাইকে আসিতে দেখিয়া আপনি উঠিয়া দুইজনের জায়গা করিয়া দিলেন। দুটীতে খাইতে বসিলে তিনি নিকটে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন।

নিমাইর নিয়ম, খাওয়া হইলে তিনি আর একবার বাহিরে একটু বেড়াইয়া আসিতেন। কিন্তু আজ আর বাহির হইলেন না, আপন শয়ন-মন্দিরে গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতেছেন এখন তাহার একটী বড় কাজ রহিয়াছে। বালিকা লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দেওয়া। সে যে বড় অভিমানিনী, বড় আদরিণী সরলা বালিকা। তাহাকে ত বুঝাইয়া বিদায় লইতে হইবে? ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মীর আসিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিলেন। হায় হায়, কত ভঙ্গিমাই জান ঠাকুর?

আহারান্তে বালিকা লক্ষ্মী শয়নমন্দিরে আসিতেছেন। বালিকার বুকটী কিন্তু

আজ কি জানি কি এক অজ্ঞাত ভয়ে দুর্‌দুর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। না জানি স্বামীকে আজ সে কি ভাবে দেখিবে। তাঁহার নিকট হইতে না জানি আজ কি নিদারুণ বাণীই শুনিতে হইবে। বড়ই সঙ্কোচে, বড় ধীরে ধীরে বালিকা তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল প্রিয়তম তাহার অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। দেখিয়া একটু সুস্থ হইল, একটু দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রিয়তমের মুখখানি দেখিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া আজ যে তাহার সাধ মিটিতেছে না। আহা! শত চাঁদ নিঙাড়িয়া কে ঐ মুখখানি নির্ম্মাণ করিল রে! ভগবান এ ক্ষুদ্র বালিকাকে যদি এত সুখ সৌভাগ্যের অধিকারীই করিল, তবে ভোগ করিবার অধিকার দিল না কেন? এমন যে অকলঙ্কশশী পতি সেও প্রবাসে যাইবে আর হতভাগিনী কি স্বামীহারা হইয়া গৃহে থাকিবে? না না, তাহা হইতে পারে না। বালিকার দুঃখ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। কিন্তু এদিকে আবার একটা লোভের উদয় হইল, সেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বালিকা সেই অত বড় দুঃখটাকেও সংযত করিতে পারিল। নিমাইচাঁদ অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন, লক্ষ্মীর সাধ হইল স্বামীর ঐ রাতুল চরণ দুইখানি কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া অতি ধীরে ধীরে একবার সেবা করিবে। কি সুন্দর ঐ পা দুখানি! যেন নিখিল সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত হইয়া ঐ পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িতেছে রে! অবোধিনী বালিকা বড় আদরে, বড় সন্তর্পণে, বড় লোভের ঐ পা দুখানি কোলের মাঝে উঠাইয়া লইল। বালিকা বালিকা! করিলে কি? প্রভাত বায়ুর তাড়নায় কমলদল মধ্যস্থ বারিবিন্দু গুলি যেন ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। অতি দুঃখের পর অতি সুখে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। সে সুখাশ্রুর তপ্তবিন্দু বোধ করি নিমাইয়ের পায়েও পড়িয়া থাকিবে। তাহার আর কপট নিদ্রা হইল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া প্রিয়তমার হাতখানি ধরিলেন। লক্ষ্মীদেবী একটু অপ্রস্তুত হইলেন। স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে একটু ভীতও হইলেন। নিমাইচাঁদ কিন্তু তাহাকে কিছুই বলিবার অবসর না দিয়া সাদরে তাহাকে আপন কোলে উঠাইয়া লইলেন। বালিকা স্বামীর অজ্ঞাতে অঞ্চলাগ্রে আপন চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আজি এই মিলন-নিশীথে বাঞ্ছিতের পরশে সে গোপন-অশ্রু আর রুদ্ধ রহিল না। বেদনা ঢাকা আঁখিপল্লব বহিয়া ঝর ঝর করিয়া মুক্তাবিন্দুগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বড়ই সুখে, বড়ই নির্ভয়ে বালিকা তাহার স্বামীর বিশাল বক্ষে মুখখানি লুকাইল। নিমাইর বিশাল উরু প্লাবিত করিয়া প্রেমের সে মন্দাকিনী ধারা বহিয়া চলিল।

নিমাই তখন বড়ই আদরে আদরিণীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বসনাগ্রে তাহা মুছাইয়া দিলেন। বসন্তের ফুল্ল শ্রীর মত শরতের শরৎ-চন্দ্রনিভ সে অমল-মুখখানির পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সেই পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠে স্বীয় অধরোষ্ঠ দ্বয় আনিয়া মিলিত করিলেন। যেন প্রফুল্ল কমলে ভ্রমর প্রবিষ্ট হইল। যেন সহকার তরুতে মাধবিকার মঞ্জু শ্রী ফুটিয়া উঠিল। তখন লজ্জা আসিয়া দেবীর চোখদুটি চাপিয়া ধরিল। যেমন করিয়া অস্তগামী রবির শেষ কিরণটি বুকে করিয়া কমলদল বদ্ধ হয়, লজ্জাবতী লতা স্পর্শ পাইয়া যেমন ঢলিয়া পড়ে, মুক্তাগর্ভ শুক্তি যেমন স্বাতীনক্ষত্রের জল পাইয়া মুদ্রিত হয়, এ দৃশ্যও তদ্রূপ মনোরম হইল। নিমাই বড় চতুর, বুঝিলেন বালিকার ক্ষুদ্র বুক ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাই তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অনেক মিষ্টকথা বলিলেন। বালিকার তপ্ত-বক্ষ জুড়াইয়া গেল। আদরে—সোহাগে নূতন করিয়া তাহার অঙ্গ প্রসাধণে নিমাই ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মী প্রথমে লজ্জা পাইল। ছি ছি! উনি পুরুষমানুষ আমার আবার বেশ করিয়া দিবেন কি? কিন্তু নিমাইচাঁদ তাহা শুনিলেন না। লক্ষ্মীদেবী যে কাপড়খানি পরিয়া ছিলেন তিনি সে কাপড়খানি আর এক রকম নূতন করিয়া পরাইয়া দিলেন। চুলগুলি খুলিয়া আর এক রকম নূতন প্রণালীতে বাঁধিয়া দিলেন। শিল্প-কুশল হস্তে কজ্জল ও চন্দন দ্বারা মুখখানি চিত্রিত করিয়া সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া দিলেন। কি অভিনব সে সৌন্দর্য্য! লক্ষ্মী ভাবিতেছেন প্রাণনাথ তাহার এ সব কার্য্যে তাহাদের অপেক্ষাও সিদ্ধহস্ত। স্বামীর প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়া তাহার আজ বড়ই আনন্দ হইতেছে। প্রিয়াকে বিনোদ বেশে সাজাইয়া চতুর নিমাই তাহাকে আর একবার আপন অঙ্কে উঠাইয়া লইয়া বসিলেন। 'হায় নিমাই! তুমি বড়ই নিষ্ঠুর। যাহার প্রতি এত স্নেহ দেখাইলে, ভালবাসার নূতন নূতন রস আস্বাদন করাইয়া মজাইয়া তুলিলে, তাহাকে কিরূপে ফেলিয়া যাইবে। সে অবোধ বালিকা তোমাকে ব্যতীত যে আর কিছুই জানে না। যে তুমি এক্ষণে কুসুম অপেক্ষাও কোমল হইয়াছ সেই তুমিই আবার পরক্ষণে বজ্র অপেক্ষাও কঠোর হইবে। বুঝিয়াছি মহাপুরুষদের ইহাই নিয়ম। তোমাদের লীলাখেলা তোমরাই বুঝ।'

নিমাই হঠাৎ একটু গম্ভীর হইলেন। সেই কুসুম-কোমল বালাকে কিরূপে বিচ্ছেদবার্ত্তা শুনাইবেন ইহা ভাবিয়া সেই বিশাল হৃদয়েও বোধ হয় একটু ভাবনা উদয় হইয়াছিল। হৃদয় দেবতাকে নীরব হইতে দেখিয়া দেবী আপন নয়নদ্বয় উন্নত করিয়া প্রিয়তমের মুখের পানে তাকাইলেন। দেখিলেন মুখখানি যেন

একটু আঁধার হইয়াছে, যেন তিনি কি ভাবিতেছেন। এ সময়ে ভাবনা তাহার ভাল লাগিল না, তিনি একটী অসমসাহসিক কার্য্য করিলেন। ধীরে ধীরে প্রিয়তমের গণ্ডদেশে একটী চুম্বন রেখাঙ্কিত করিয়া দিলেন। ইহাতে বাঞ্ছিত ফললাভ হইল। নিমাইর বদন কমলে মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তমাকে বড়ই স্নেহে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমাকে একটী কথা বলিব, বল তাহা রাখিবে? আমি বিদেশ যাইতেছি, সেখান হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া তোমাকে বহু অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব; আরও কতকি আনিব।" দেবী পূর্ব্ব হইতেই ইহা জানিতেন, ক্ষণিক আনন্দাবেশে ভুলিয়াছিলেন মাত্র। সন্ধ্যাকালীন সমস্ত কথাই তাহার মনোমধ্যে জাগ্রত হইল। দেবীর মুখখানি অমনি প্রদোষে মুদ্রিতা কমলিনীর ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। তিনি জানিতেন স্বামী অতি তেজস্বী প্রকৃতির লোক। তিনি একবার যাহা স্থির করেন কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি যখন আমাদের ভালরজন্যই যাইতেছেন তখন আর কি বলিব।

যাইবার পূর্ব্বে নিমাই আর এক কাজ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী বড়ই ব্যথিতা হইয়াছেন বুঝিয়া তাহাকে আদর করিয়া একটী কৌটায় ভরিয়া স্বীয় পদধূলি দিলেন আর দিলেন নিজাঙ্গের ছিন্ন একগাছি পুরাতন পৈতা। বলিলেন "এই দুইটী দ্রব্য রক্ষা কর, ইহা হইতেই আমার বিরহ জনিত বেদনা অনেক উপশম হইবে। আর আমার মাতার সেবা করিও, তাহাতেই তুমি অনেক নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।"

শচীমাও ছেলেকে তাঁহার নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন ছেলেটী তাঁহার যাহা ধরে তাহা ছাড়িতে চাহে না। মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বহু কষ্টে তিনি নিমাইকে বিদায় দিলেন। অপরাহ্নকালে শুভ সময় বুঝিয়া নিমাই যাত্রাকরিলেন। বনমালী আচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজনা পণ্ডিত এবং তাঁহার সমবয়সী কয়েকজন বন্ধু সঙ্গে গেলেন। নিমাই যে যে দ্রব্য খাইতে ভালবাসেন তাহার কিছু কিছু শচীমা পূর্ব্বাহ্নেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাইবার সময় তাহা নিমাইর সঙ্গে দেওয়া হইল। মাতৃস্নেহে নিমাই বড়ই মুগ্ধ হইলেন। মুখে কিছু না বলিয়া কেবল একটু হাসিলেন মাত্র। মাতার পদধূলি লইয়া তাঁহাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া নিমাই শুভমুহূর্ত্তে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল শচী নির্নিমেষ নেত্রে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন। ওঃ আর

যে দৃষ্টি চলে না। উদ্গত অশ্রু যাহা এতক্ষণ তিনি চেষ্টার দ্বারা রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন তাহাই এখন তাহার দৃষ্টি রোধ করিল। কিন্তু ও কি, ঘরে যেন কিসের শব্দ হইল; তিনি চক্ষু মুছিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, বধূমাতা তাঁহার মূর্চ্ছিতা হইয়াছে। নিমাই যখন মাতার নিকট বিদায় লয়, দ্বারের আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্মীদেবী সমস্ত দেখিয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল, ততক্ষণ অতিকষ্টে দাঁড়াইয়াছিলেন, পরে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। অব্যক্ত যন্ত্রণাভারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। শচীমা নিকটে বসিয়া অতি সন্তর্পণে শুশ্রূষা করিয়া তাহার চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীঈশ্বর-তত্ত্ব। (২)

(লেখক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র, বি-এল্।)

এ পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারিয়াছি, তাহাই শ্রীভক্তমালগ্রন্থের সপ্তদশ মালায় পরমার্চ্চনীয় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের ভ্রাতা পূজ্যপাদ শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজকে তাঁহার অভিষ্টা দেবী শ্রীশ্রীশঙ্করী যেরূপে উপদেশ দিয়াছেন, ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ আমরা এখানে উক্ত গ্রন্থ হইতে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি,—

"দেবী কহেন গোবিন্দ মূলতত্ত্ব নাহি জানো।
আপনারে পণ্ডিত করিয়া মাত্র মানো॥
পরম ঈশ্বর যেই পরাৎপর হরি।
নির্গুণ পরমব্রহ্ম সর্ব্ব-অধিকারী॥
নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয়।
সুন্দর বিগ্রহ সৎ চিদানন্দ ময়॥
তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয়।
চিৎশক্তি জীবশক্তি মায়া এই ত্রয়॥
চিন্ময় স্বরূপ শক্তি, জীব যে তটস্থা।
মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বিকারী অবস্থা॥
সেই যে স্বরূপশক্তি চিৎশক্তির বৃত্তি।
হ্লাদিনী সন্ধিনী আর সংবিত শকতি॥

হ্লাদিনী স্বরূপা তাঁর প্রেয়সীর গণ।
সন্ধিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধু হন॥
বসন ভূষণ গৃহ আদি বৃক্ষ ধাম।
খাদ্য সামগ্রী আদি যত লীলাকাম॥
সংবিত শক্তির বৃত্তি কৃষ্ণ ভক্তি জ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞান আদি যত তাঁর পরিজন॥
জীব যে তটস্থা শক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাস।
শক্তির বিশেষ হেতু তাঁহার আভাস॥
তেঁহো স্বতঃসিদ্ধ, জীব তাঁহার অধীন।
অতএব দাস,—ইহা সিদ্ধান্ত প্রবীণ॥
মায়া শক্তি বহিরঙ্গা ত্রিগুণ আত্মিকা।
স্বাভাবিকী জড়া হন বিকার অন্তিকা॥
প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয়।
নানাবস্তু জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ড রচয়॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর এমতি শকতি।
ভুলাইলা আব্রহ্ম যে সবাকার মতি॥
অনিত্যেতে নিত্যবুদ্ধি সংসার রচন।
সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চ মহাভূত।
পঞ্চ তন্মাত্র আদি চরাচর যত॥
যত দেখ সকলি প্রকৃত মায়াময়ী।
এমতি শকতি তাঁর ত্রিভুবন জয়ী॥
হেন মায়া মহিমা যে মন-অগোচর।
যোগমায়া যেঁহো তাঁর কোট্যংশের কর॥
যোগমায়া স্বরূপ শকতি ঠাকুরাণী।
তাঁর দাসী অভিমান করয়ে আপনি॥
সেই মায়াশক্তি হন আমার অংশিনী।
মুই যাঁর অংশ তোমায় কহিনু বাখানি॥
অতএব সেই যে স্বরূপ শক্তি যেঁহো।
শক্তিমান সহিত অভেদ হন তেঁহো॥

তত্ত্ব বিবরণ তোমায় কহিলাম সার।
অতএব ভজ কৃষ্ণ প্রভু যে আমার॥
তাঁহার অধরামৃত পূজাতম মোর।
ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার॥
শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বাসে।
বিমলা রূপেতে কেবল প্রসাদের আশে॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অবতার-তত্ত্ব :—এ পর্য্যন্ত আমরা এই পাইলাম যে, একই বস্তু আপন ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নানা মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।

হইয়াছেন বটে কিন্তু সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ সমান নয়। কোথাও স্বল্প প্রকাশ, কোথাও বিশদ প্রকাশ। মৃত্তিকাতে তাঁহার যে প্রকাশ তদপেক্ষা বৃক্ষে তাঁহার অধিক প্রকাশ আমরা বলিয়া থাকি। আবার বৃক্ষে তাঁহার যে প্রকাশ তদপেক্ষা প্রাণীতে তাঁহার আরও অধিক প্রকাশ আমরা বলি। আবার নানা প্রাণীতে তাঁহার যতদূর প্রকাশ মানবে তাঁহার তদপেক্ষা অধিকতর প্রকাশ আমরা বলি। আবার আমমাংসভোজী বর্ব্বরে তাঁহার যে প্রকাশ, সুসভ্য মানবে তাঁহার তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ আমরা বলি। সুসভ্য মানবের আবার শারীর বলে, মানস বলে, ও হৃদয়ের বলে, তারতম্য আছে।

এইরূপে যেখানে সেই মূলতত্ত্বের সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় প্রকাশ তাহাই অবতার নামে পরিচিত হন। বৃক্ষ হইলে তাহা সাধারণ বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন, মৎস্য হইলে তাহা সাধারণ মৎস্য হইতে স্বতন্ত্র, পশু হইলে তাহা সাধারণ পশুর সমান নয়, মানব হইলে তাঁহাকে আর মানব পর্য্যায়ে গণ্য করা হয় না। ভগবান গৌতম, ভগবান কপিল, ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আখ্যা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ইনি বা ইঁহারা ভগবান বা ঈশ্বর পর্য্যায়ে গণ্য হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে মানব বলিলে শাস্ত্রমতে ভুল করা হয়।

"সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥

অবতার প্রসঙ্গে আমরা মীন, কূর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ক্রমে পরশুধারী, ধনুর্দ্ধারী ও পরে শান্ত দয়ালু বুদ্ধ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। জলচর, উভয়চর, স্থলচর, নৃপশু, খর্ব্বনর, কুঠারধারী, তীরধারী পরিশেষে নিরস্ত্র

শান্ত করুণাময় কেহই বাদ যান নাই। সর্ব্বত্রই সেই এক প্রকাশিত হইয়া অবতারাখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

সকলই সেই একের প্রকাশ সত্য, কিন্তু প্রকাশে আবার তারতম্য আছে! বুদ্ধদেব সেই মূল কারণের প্রসঙ্গ বড় একটা করিতেন না বা ভক্তগণকেও করিতে দিতেন না। কাজেই লোকে ইহকাল ও ইহলোক সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িল। সেই সময় ভগবান শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া সুতীক্ষ্ণ দার্শনিক তর্কযুক্তি প্রভাবে বৌদ্ধের শূন্যবাদ ও নির্ব্বাণ বাদ খণ্ডন করেন। কিন্তু তিনি জগৎ 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' সদৃশ অলীক ঘোষণা করায় মানবগণ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ এমন কি অবতারাদি সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া উঠেন।

অথচ মূলকারণ যদি সৎ বা সত্য হন, তাঁহা হইতে অসৎ বা অলীক পদার্থের উৎপত্তি সুসঙ্গত হয় না। সেই জন্য দয়াময় শ্রীভগবান কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎ সত্য অথচ নশ্বর বা ক্ষণস্থায়ী, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, স্বেচ্ছায় ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত, কলিযুগে শ্রীভগবন্নামই জীবের একমাত্র সাধন, ইত্যাদি তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইহাই যুগোচিত ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা। শেষে প্রাদুর্ভূত হওয়ায় ইনি সকল অবতারের চূড়ামণি হইয়াছেন। ইঁহাতে সেই 'একের' যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অধিকন্তু ইনি আমাদের বাঙ্গলাদেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুটীরে আবির্ভূত হওয়ায় আমরা সর্ব্বতোভাবে ধন্য, মান্য ও সমাদৃত হইয়াছি। বাঙ্গালার দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী যেমন জগতে কোহিনুর সদৃশ, তেমনি আমাদের মহাপ্রভুও জগতের যাবতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ অবতার।

এই অধ্যায়ের উপসংহারে আমরা বলিয়া রাখিব যে, সেই শ্রীকৃষ্ণই এই সমুহ অবতারের মূল কারণ বা অবতারী অর্থাৎ তিনিই এইরূপে নানাভাবে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্গীতায় তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীব্রহ্ম-কৃত গোবিন্দ-স্তব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১৫

স্বধাম গোলকে কিম্বা নিম্নদেশে তার।
যথাক্রমে হরি শিব দেবীধামে আর॥
ধামোচিত দিব্য তেজ পরকাশ করি।
নিত্য শুদ্ধ পূর্ণভাবে বিরাজেন হরি॥
আদিম পুরুষ সেই গোলোকের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

১৬

সৃষ্টিস্থিতি ধ্বংসকারী যাঁর শক্তিভূতা।
একা দুর্গাদেবী ছায়াপ্রায় অনুগতা॥
করি সর্ব্বকার্য্য যাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী।
পালিয়াছেন বিশ্ব বিশ্বমাতা দয়াময়ী॥
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি॥

১৭

দুগ্ধ যথা বস্তুযোগে দধিরূপ হয়।
হইলেও সমজাতি ভিন্নকভু নয়॥
সেইরূপ সংহারেচ্ছা-যোগে যেই হরি।
অবতীর্ণ হন ভুবে নানারূপধরি॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

১৮

অন্য বর্ত্তি লভি দীপশিখা যেইমত।
অভিনব দীপরূপে হৈয়া পরিণত॥
মূলদীপ সমধর্ম্ম করে প্রকটন।
সেইরূপ যিনি বিষ্ণুরূপে ব্যক্ত হন॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

১৯

স্বকীয় পরমামূর্ত্তি স্বরূপ আধারে।
যোগনিদ্রা যান যিনি কারণ সাগরে॥
যাঁর প্রতি লোমকূপে করে বিচরণ।
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড কত কে করে গণন॥
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি॥

২০

যাঁর লোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডেরগণ।
শ্বাসৈক সময়ে করে জীবন ধারণ॥
সেই মহাবিষ্ণু অংশ অংশের যাঁহার।
যিনি সর্ব্বঅন্তর্যামী করুণাপাথার॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

২১

সূর্য্যকান্ত মণিখণ্ডে মিহির যেমন।
নিজদাহশক্তি আদি করে প্রকটন॥
সেইরূপ বিরিঞ্চিতে স্বশক্তি সঞ্চারি।
সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন যে হরি॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

২২

বিঘ্নেশ গণেশ প্রণিপাতকালে যাঁরে।
শ্রীপদ পল্লবদ্বয় ধরিয়া সাদরে।
শিরকুম্ভদ্বয়ে যত্নে করিয়া স্থাপন।
বিঘ্ন বিনাশের শক্তি করেন অর্জ্জন॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

২৩

অনিল অনল বারি বসুধা গগন।
দিক্ কাল আত্মা মতি এই ত্রিভুবন॥
যাঁহা হ'তে লভে জন্ম যাঁতে নিত্য রয়।
যাঁহাতে প্রবেশ করে অন্তিম সময়॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

২৪

সর্ব্ব দেবতারমূর্ত্তি সর্ব্ব গ্রহ রাজা।
সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্য অনুপম তেজা॥
বিরাট মুরতি ধারী যাঁহার নয়ন।
যদাদেশে করে কাল চক্রে বিচরণ॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

২৫

বিবিধ তপস্যা শ্রুতি ধর্ম্ম পাপচয়।
আব্রহ্ম বিহঙ্গ কীট যত জীব হয়॥
যাঁহার প্রদত্ত মাত্র বিভব লভিয়া।
প্রভাব বিস্তার করে জীবন ব্যাপিয়া॥
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি।
ভজি নিত্য শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি॥

২৬

ইন্দ্রগোপ নামে কীট ক্ষুদ্র অতিশয়।
অথবা সুরেশ সুররাজ মহাশয়॥
স্বকর্ম্ম সদৃশ ফল দেন সবে যিনি।
ভকতের কর্ম্ম কিন্তু দহেন আপনি॥
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি।
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি॥

গীত।

মুখে বল কালী অন্তরে যে কালী
না জানি কেমন সাধনা।
সর্ব্ব জীবে যাঁর শকতি সংস্থায়
(তাঁরে) পারণা করিতে ধারনা॥
কোন দেশে যাও কাহারে সুধাও,
কোন কর্ম্ম কর কি মন্ত্র ধেয়াও,
(তোমার) হৃদয় আসনে ব্রহ্মময়ী ধ্যানে
অজপা সহিত জপ না॥
(ও মন) কর সাধু সঙ্গ জ্ঞান ভক্তি তরে,
তবে কেন বাঁধা কামনা নিগড়ে,
(তোমার) প্রাণে নাহি বাজে শুধু লোক মাঝে
নাম কিনিবার বাসনা॥

বৃথাই তোমার সাধনা ভজনা
পর দুঃখে যদি প্রাণ কাঁদিল না,
কোথা ব্যাকুলতা প্রেম বিহ্বলতা
জ্যোতি নিরমল নিশানা ॥
হবে শুভক্ষণ দুঃখ যাবে দূরে,
কালী কৃষ্ণ ভেদ ভেবনা অন্তরে,
(দাও) মায়ের পদতলে প্রাণমন ঢেলে
(আর) অভিমান ভরে থেক না ॥
মায়ের চরণ তলে প্রাণাহুতি দিলে
রবে না এ ভব ভাবনা ॥

সৎসঙ্গ।

সৎসঙ্গ অর্থাৎ সতের সংসর্গ। সৎ বলিতে কেবল একটী বস্তু বুঝায়, সেই বস্তুটী শ্রীভগবান, অতএব সেই শ্রীভগবানের সঙ্গই সৎসঙ্গ।

আমরা মলিন, আমরা অসৎ ভাবে ভাবিত, শ্রীভগবানের সঙ্গ কেমন করিয়া ভোগ করিব? তবে "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস" এই আশাপ্রদ বাক্যটি কি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব; শাস্ত্রোক্ত অমূলক কথা নাই. সাধুদিগের মুখ হইতে নিরর্থক বাক্যত বাহির হয় না। অধিকন্তু শ্রীভগবান দয়াময়, তিনি চিরতরে আমাদিগকে অসতে ডুবাইয়া রাখিবেন; ইহাইবা কিরূপে হইবে? আমরা খঞ্জ, আমরা অন্ধ, আমরা বধির; তাই বলিয়া কি জগৎপিতা আমাদিগকে বিপদসঙ্কুল এই পঙ্কিল পথে ছাড়িয়া দিয়া তামাসা দেখিবেন? নিজ-শক্তিতে উঠিতে গিয়া ক্রমশঃ পঙ্কে মগ্ন হইতেছি, ইহা কি তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবেন? তুলিবার জন্য কি আদৌ চেষ্টা করিবেন না? যাঁর স্নেহকণা পাইয়া পিতামাতা পুত্রাদির জন্য এত যত্ন, এত কষ্ট করেন সেই স্নেহাধার, সেই করুণাময় ভগবান কি আমাদিগের দুর্গতি স্থিরভাবে দর্শন করিবেন? তিনি কি আমাদিগকে তুলিয়া লইবেন না? তিনি কি আমাদিগকে সৎপথে চালাইবেন না? সদ্ভাবে ভাবিত করিবেন না?— নিশ্চয়ই করিবেন। আমাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য, আমাদিগকে সৎপথে চালাইবার জন্য, ভগবৎসঙ্গলাভে উপযুক্ত করিবার জন্য তিনি সর্বদা যত্ন করি-

তেছেন। আমরা দুর্ব্বল, প্রত্যক্ষ তাঁহার সঙ্গ সহ্য করিতে অসমর্থ; তাই দয়াময় আপনার শ্রীনাম, মধুময় লীলাপ্রসঙ্গ, লীলাত্মক গ্রন্থাদি এবং স্বীয় দেহরূপ ভক্তগণকে আমাদিগের উদ্ধারের জন্য আশে পাশে চতুর্দ্দিকে রাখিয়াছেন। আমাদিগের পক্ষে ভগবল্লীলাদির আলোচনা, তাঁহার শ্রীধামাদি দর্শন, ভগবল্লীলাত্মক গ্রন্থাদি পাঠ এবং ভক্তগণের সংসর্গ,—যাহা হইতে ভগবচ্চরণে রতি জন্মে ও ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা হয়,—সেই সকলই সৎসঙ্গ। ইঁহাদের সংসর্গগুণেই আমরা সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের সঙ্গলাভে অধিকারী হইব।

শ্রীভগবানের কি দয়া! ঐ সকলের সঙ্গকরণোপযোগী ইন্দ্রিয়াদিও দিয়াছেন; শুধু তাহাই নয়,ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করিবার ক্ষমতাও আমাদিগকে দিয়াছেন। কর্ণ দিয়াছেন, পরনিন্দায় পরচর্চ্চায় তাহা ব্যবহার না করিয়া নামশ্রবণে নিযুক্ত করিতে পারি। আমাদিগের মন আছে, শূন্যে প্রাসাদনির্ম্মাণের কল্পনায় তাহা নিযুক্ত না করিয়া ভগবল্লীলাদি ও ভক্তগণের বিষয় চিন্তা করিতে পারি। আমরা অনেকে পড়িতে জানি, ছাইভস্ম কতকগুলা না পড়িয়া শ্রীভগবানের লীলাপ্রধান গ্রন্থ ও ভাগবতগণের চরিত্র পড়িলে ক্ষতি কি? আমরা কত স্থানে যাই, এদিক ওদিক কত কি দেখিতে যাই, আর কোন শ্রীমন্দির কি কোন শ্রীবিগ্রহ, কি সাধুসজ্জন দেখিলেই কি সর্ব্বনাশ হইবে? তবে কেন দেখি না, কেন সদ্বিষয়ের আলোচনা করি না, কেন সদ্ভাবে ভাবিত হই না; সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অসতের দিকে কেন ধাবিত হই? নিয়ত অসৎসঙ্গ করিয়া আসিতেছি, অসৎসংসর্গের ক্ষণিক সুখই স্বর্গীয় সুখ মনে করিতেছি, তদতিরিক্ত আনন্দ আছে বলিয়াই জানি না, তাই আমরা সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাই হরিনাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করি, তাই সাধু দেখিলে ভণ্ড বলিয়া দূরে গমন করি, তাই তীর্থস্থানকে জুয়াচোরের অড্ডা বলিয়া থাকি এবং সেদিকে মুখই ফিরাই না; বড়ই আশঙ্কা, পাছে সেই ক্ষণভঙ্গুর সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

কি দুঃখের বিষয়! অসুখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিলাম, প্রকৃত আনন্দের যাহা তাহাই অশান্তিময় বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম ইহা কি মূর্খতা নয়? ভাই, এখনও সময় আছে, এখনও অভ্যাস সেরূপ দৃঢ় হয় নাই; এস ভাই এই বেলা সদ্ভাবে ভাবিত হইতে যত্ন করি, দু একদিন রসভঙ্গ হইবে, দু একদিন বিরক্তিবোধ হইবে, কিন্তু ধীরতার সহিত কার্য্য করিলে অচিরাৎ নির্ম্মল আনন্দের উদয় হইবে। ভগবৎসঙ্গ করিবার জন্যই মনুষ্যজীবন; ইন্দ্রিয়ভোগ পশু পক্ষীরাও করিয়া থাকে। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিব,

মনুষ্যোচিত কার্য্য কিছুই করিব না? আমরা যেমনই পাপাচারী হই না যেমনই বিষয়াসক্ত হই না কেন, হই না কেন ভগবদ্বিদ্বেষী, এস সৎসঙ্গ করি, সাধুর চরণে আশ্রয় লই, প্রাণ টলিবে গতি ফিরিবে, অসদ্বস্তুতে ঘৃণা জন্মিবে, শ্রীভগবানের জন্য প্রাণ কাঁদিবে। আমরা অন্ধ—পথভ্রান্ত, সৎসঙ্গই আমাদের একমাত্র অবলম্বন—পথপ্রদর্শক, বিশেষতঃ সাধুভক্ত যাঁহাতে নিখিল সদ্ধৃত্তি, সমস্ত ভগবদ্ভাব জীবন্তভাবে বর্ত্তমান, তাঁহার সংসর্গে যে অসীম ফললাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য সাধুসঙ্গ করিলেও অনায়াসে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়।

সৎসঙ্গ ভগবদ্ভক্তির জনক, পোষক, বিবর্দ্ধক ও রক্ষক। যতদিন চিত্ত ভগবদ্ভাবে বিভোর না হয়, ততদিন সৎসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে।—

"ভক্তি নববৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গ সিঞ্চনে।
পালন করহ ভাই পরম যতনে॥
বিচার যে বাড় দেহ রক্ষার কারণে।
অসৎসঙ্গ—গো ছাগল না করে ভক্ষণে॥
তবে সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা হইয়া।
আকাশে উঠয়ে নানা রঙ্গেতে ব্যাপিয়া॥
হৃদি আলবালে শোভি করে স্নিগ্ধ ছায়া।
সর্ব্বজীবের হরে দুঃখ পাপ তাপ মায়া॥
যবে সেই ভক্তি-বৃক্ষ বলবান হয়।
দুষ্টসঙ্গকরী হইতে বিঘ্ন না জন্মায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান কপিলদেব স্বীয় জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

যথার্থই সৎসংসর্গে হৃদয় ও কর্ণ তৃপ্তিকর ভগবল্লীলা গুণাদি যুক্ত কথার

আলোচনা হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে স্বতঃই পরম কৈবল্যধাম ভগবান শ্রীহরির প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়।

সাধুসহবাসের কথা কি? ক্ষণকালের জন্য সাধুকে দর্শন কি স্পর্শন করিলেই নিখিল পাপ বিদূরিত হয় এবং হৃদয় পবিত্র ও ভগবৎপ্রবণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে;—

"নহ্যম্মদীয়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের তীর্থসকল মৃত্তিকা ও শীলাময় দেবতাসকল কাল বিলম্বে পবিত্র করে, কিন্তু সাধুগণের দর্শনমাত্রে নিখিল পাপ বিদূরিত হয়।

"যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ॥
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ যে সাধুগণের স্মরণমাত্র জীবের গৃহপর্য্যন্ত পবিত্র হয়; তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও অবস্থান প্রভৃতিতে কি ফললাভ হইবে তাহা অনুমান করাও সুকঠিন বর্ণনাতো দূরের কথা।

অথবা স্মরণেই বা আবশ্যক কি? "বৈষ্ণবের নামে সর্ব্বপাতক নাশয়" যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌযুগে॥"

অর্থাৎ প্রত্যহ প্রাতে যাঁহারা বৈষ্ণবগণের নাম কীর্ত্তন করেন তাঁহারা পরম ভাগবত হন।

সাধুর এতই শক্তি! ভক্তের এমনই মাহাত্ম্য! তাই ভগবান নিজ মুখে বলিতেছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ!
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাশ্চ তে নরাঃ॥
মদ্ভক্তো বল্লভো যস্য স এব মম বল্লভঃ।
তৎপরো বল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যে আমার ভজনা করে সে আমার সেরূপ ভক্ত নহে, যে আমার ভক্তের ভজনা করে সেই আমার প্রিয়, সেই আমার ভক্ত। যে ব্যক্তি আমার ভক্তের শরণাগত হইয়াছে, আমি তাহারই আশ্রিত, তাহা অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহ নাই।

"বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্ববেদবিদো জগৎ ॥"

অর্জ্জুন! বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর, তাঁহাদেরই শরণাগত হও। বৈষ্ণবগণ নিখিল বেদের বেদ্য বস্তু আমাকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিতেছেন, সমস্ত জগৎকে তাঁহারা উদ্ধার করিতে পারেন। তাই বলি ভাই, এস সাধুর চরণে শরণ লইয়া প্রেমময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মলাভের উপযুক্ত হই। যদি বল, কাজ কি আমাদের ভগবৎ চরণ লাভে? বেশত সুখে স্বচ্ছন্দে আছি! তাহার উত্তর একমাত্র বলি—ভূত লইয়া ভূত সাজিয়া থাকিবার জন্যত মানুষ হই নাই! যদি তুমি ইহা অস্বীকার কর, তবে আরো বলি—ভাই, আমরা ত সুখ চাই, আমরা ত সুখের জন্য লালায়িত, মন ত ইতস্ততঃ সুখের জন্যই ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু সুখ কোথায়? এ জিনিষের পরও জিনিস পাইতেছি কিন্তু তৃপ্তি কোথা? মনের ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে একটা অভাব পুরণ করিতেছি, তৎক্ষণাৎ আর একটী অভাব—প্রবলতর অভাব উপস্থিত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ দেখি কাম্যবস্তু পাইতেছি, তথাপি সাধ মিটে না কেন?

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

কাম্যবস্তু উপভোগ করিলে কামনা নিবৃত্ত না হইয়া বরং ঘৃতসংসর্গে অগ্নির ন্যায় প্রবলই হইয়া উঠে।

তাই বলি ভাই ভূত লইয়া থাকিও না, এস ভূতভাবন ভগবানের ভাব পাইবার জন্য যত্ন করি।

"যংলব্ধাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

যে লাভ হইতে আর শ্রেষ্ঠ লাভ নাই, এস সেই ভগবৎসঙ্গরূপ পরমবস্তু লাভে প্রয়াসী হই। আনন্দ পাইব, চিরশান্তি সাগরে ডুবিব। কিন্তু সেই পরমবস্তু লাভের উপায় কি?—

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যজ্ঞদানতপোভির্বা বেদাধ্যায়নকর্ম্মভিঃ।
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা ॥"

কেবল যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারা ভগবানের দর্শন লাভ হয় না; ভক্তিই তাঁহার দর্শন লাভের একমাত্র উপায়।

"ভক্তেন্মু পারবস্তুং তে দৃষ্টং মেহস্য রঘুদ্বহ।"

ভগবান ভক্তাধীন, ভক্তের প্রীত্যর্থে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্ত কিরূপে হই, কি উপায়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করি ?—

"সতাং সঙ্গতি রেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্।"

সৎসঙ্গই ভক্তি লাভের প্রধান সাধন। ভগবান আপনিই ধরা দিয়াছেন; দয়াময় দুর্ব্বল সন্তানগণের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছেন, জীব! ভোগবাসনাভিভূত হইয়া বার বার বিড়ম্বিত হইও না, "ভোগা মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্লতেব চঞ্চলাঃ" বিষয়ভোগ মেঘমালাস্থিত বিদ্যুৎলতার ন্যায় চঞ্চল। ভগবানকে পাইতে যত্নবান হও, চিরশান্তি অনায়াসে হস্তগত হইবে।

"সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা যদা ত্বাং সমুপাসতে।
তদা মায়া শনৈর্যাতি ত্বামেব প্রতিপদ্যতে॥"

সৎসঙ্গজনিত ভক্তিদ্বারা ভগবানের উপাসনা করিলে মায়া দূরে যায় ক্রমশঃ ভগবদ্ভাবের উদয় হইয়া থাকে; তাই বলি—

"বৈষ্ণবের সঙ্গ কর হরি অনুরাগ ধর,
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই।"

"অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ।
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ॥
বৈষ্ণবের পদরজঃ শিরের ভূষণ।
করিয়া এড়াও ভাই শমন বন্ধন॥
কৃষ্ণ—কৃষ্ণভক্ত—রস আস্বাদন কর।
কৃষ্ণপ্রেমে মজ, যদি ব্রজ আশা কর॥"

গুরু-নিষ্ঠা।

মনুষ্য মাত্রেরই প্রত্যেক কার্য্যের কেহ না কেহ শিক্ষাদাতা আছে; মনুষ্য হইতে শিক্ষা করা ত আছেই, এমন কি জাগতিক অন্যান্য পদার্থ হইতেও আমাদিগের শিক্ষা হইয়া থাকে। যাঁহা হইতে আমরা কোনও শিক্ষা পাই, তাঁহাকেই আমাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করা উচিত। শ্রীভগবানই আমাদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জীবের এমন কি গুল্ম-লতার ভিতরও অণুপরমাণুরূপে অবস্থান করিয়া গুরুরূপে আমাদের মঙ্গল করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেকেরই সেই গুরুশক্তিতে সরলবিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে যে গুরুপাদপদ্মাশ্রয় গ্রহণের শাস্ত্রীয় বিধান আছে তাহা সামান্য মনে করা উচিত নহে। ইহা নিশ্চয়ই

বুঝিতে হইবে যে, ভগবান আমাদের ধারণা অনুযায়ী রূপধারণ করিয়া গুরুরূপে জগতে আগমন করিয়া থাকেন।

স্বীয় গুরুদেবকে সরলপ্রাণে ভালবাসিয়া, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ না করিলে উদ্ধারের আর উপায় কৈ? ভগবানকে পাইতে হইলে গুরুদেবকে ভগবানের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে, নতুবা ভগবানকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু নিশ্চয়ই সামান্য বস্তু নহেন। গুরু ইষ্টদেবের ভাবে মনুষ্যরূপে জীবকে কৃতার্থ করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন।

"গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।"

সেইজন্য গুরু, ইষ্টদেব ও মন্ত্র অভেদ ভাবিয়া উপাসনা করিতে হয়। তাহা হইলে হৃদয় সরল হইবে, বিষয়ের মলিনতা ও ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন দূরে যাইবে।

যতদিন আমাদের নিজ গুরুদেবের উপর ভগবদ্‌জ্ঞানে বিশ্বাস ও ভক্তি না আসিবে এবং যতদিন গুরুদেবও প্রাণের সহিত নিজ শিষ্যের যথার্থ মঙ্গলকামনা না করিবেন, ততদিন উক্ত গুরুকরণ প্রণালী একটী ব্যবসা ও সামাজিকতা রক্ষা ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ততদিন আমাদের দুঃখের অবসান নাই, ততদিন আমরা ভগবান হইতে অনেক দূরে আছি ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে। তাই বলি, ভাইসকল এস, প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন আমরা সদ্‌গুরু পাইয়া তাঁহাকে সরলপ্রাণে ভগবান বলিয়া জানিতে শিখি, তাহা হইলে আমরা সেই দয়াময় গুরুর কৃপায় ইহজগতে আনন্দে কাটাইয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই আনন্দধামে যাইবার উপযুক্ত হইতে পারিব।

গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কি পার্থিব কি পারমার্থিক সকল কার্য্যই নিতান্ত অসম্ভব হইলেও অনায়াসে সাধিত হইতে পারে। এখানে আমরা একটী প্রাচীন উপাখ্যান বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

পূর্ব্বকালে কোন এক পরমবৈষ্ণব গঙ্গাতীরে আশ্রম সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল; সকলেই তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিত ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহাকে সুখী করিত। এই শিষ্যগণের মধ্যে একজন শিষ্যের শ্রীগুরুদেবের উপর অটল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি শ্রীগুরুর অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না এবং শ্রীগুরুদেবের সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন সাধন ভজনও ছিল না।

গুরুদেবও শিষ্যগণকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, সকল সময়েই শিষ্যগণকে সদুপদেশ দিতেন; তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। সদা শিষ্যগণের মঙ্গলের

জন্ত কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন।

একদিন উক্ত বৈষ্ণব কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করায় তাঁহার শিষ্যের প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইল; তিনি অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও শ্রীগুরুদেবকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবেন ইহা ভাবিয়া নিতান্ত অধীর হইলেন। ইহাতে দয়ালগুরু অনেক রকমে শিষ্যকে সান্ত্বনা করিলেন ও বলিলেন যে, "যতদিন আমি না আসি ততদিন তুমি গঙ্গাতীরে উপাসনা করিও তাহা হইলেই আমার পূজা করা হইবে।"

সেইদিন হইতে উক্ত শিষ্য আর গঙ্গাজলে পাদস্পর্শ করিতেন না, তটস্থ হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন; এবং পান করা ভিন্ন অন্ত কোন কার্য্যে গঙ্গাজল ব্যবহার করিতেন না। ইহা দেখিয়া অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কিছুতেই টলিলেন না; গুরুর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন; এবং কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন।— "গুরুদেব! সদা বিষয়মদে মত্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়সেবায় রত থাকিয়া তোমার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেছি না। কবে আমার সেই শুভদিন আসিবে, যেদিন মনেপ্রাণে তোমার ভাব বুঝিয়া তোমার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য তোমারই কার্য্যবোধে করিতে পারিব। কবে তোমাকে হৃদয়রথের রথী করিয়া মনরজ্জু তোমার হাতে দিতে পারিব এবং তুমি আমার ইন্দ্রিয়গণকে তোমার ভাবে বিভোর করিয়া ঠিক পথে চালাইবে। গুরুদেব! কেমন করিয়া তোমাকে হৃদয়েশ্বর করিতে হয় জানি না, তুমি দয়া করিয়া না শিখাইলে আর আমার উপায় নাই। দয়াময়! দয়াকর।"

এইভাবে দিন যায়, কিছুদিন পরে গুরুদেব আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে শিষ্যগণ যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কথায় কথায় ঐ নৈষ্ঠিক শিষ্যের বিষয়ও যথাযথ গুরুদেবকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি মনে মনে সমস্তই বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাস্ত করিয়া "দেখা যাবে" এই মাত্র বলিলেন।

একদিন তিনি স্নান করিবার জন্ত সমস্ত শিষ্যবর্গ লইয়া গঙ্গায় গেলেন এবং একগলা গঙ্গাজলে নামিয়া সেই প্রিয় শিষ্যকে বলিলেন,—"বৎস! আমার গামছাখানি লইয়া আইস।" ইহাতে শিষ্য উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি কিরূপে গঙ্গাজলে পাদস্পর্শ করিবেন ইহা ভাবিয়া অস্থির হইলেন; এ দিকে গুরুদেবের আজ্ঞা পালন না করিলেও মহা অনর্থ হয়—অবশেষে তিনি গুরু-আজ্ঞাই শিরোধার্য্য বিবেচনা করিয়া গামছা লইয়া জলে নামিতে উদ্যত হইলেন।

গুরুভক্তির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, গুরু-কৃপায় হয় না এমন কি আছে? শিষ্য যেমন গঙ্গাজলে পা দিলেন অমনি প্রত্যেক পদের নিম্নে একটী করিয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল; শিষ্যও অমনি তাহার উপর পা দিয়া অনায়াসে গুরুদেবকে গামছা দিয়া আসিলেন। তখন অপর শিষ্যগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এতদিন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া সকলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

শিষ্য! তোমার গুরুভক্তি ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসকে কোটি কোটি নমস্কার করি। আজ জগৎ তোমার গুরুনিষ্ঠার ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তোমার নিকট হইতে শিক্ষা করুক যে, কেমন করিয়া গুরুসেবা করিতে হয় ও গুরু আজ্ঞা পালন করিতে হয়। আমি অতি অধম, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার চরণধূলি লইয়া তোমার অচল অটল বিশ্বাস ভক্তির কণামাত্রও লাভ করিতে পারি।

লীলাগান বা রসকীর্ত্তন।

(কীর্ত্তনবিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

(পল্লীবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

সাধকপ্রবর নবরসিক কবিমুকুটমণি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায়, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রসগীতিগুলির রচয়িতা। তাঁহারা হৃদয়-নিকুঞ্জে আরোপে যে সকল লীলা দর্শন করিতেন ভাবায় সেই সকল লীলা-রস বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ইহা সাধনের সাধ্য বস্তু,—পার্থিব সামান্য গীতিকাব্য নহে; তাঁহারা সখিভাবাশ্রিত সাধক ছিলেন বলিয়া এই সকল অপ্রাকৃত লীলা বর্ণন করিতে পারিয়া ছিলেন। ইহাতে একাধারে পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, রচনালালিত্য প্রভৃতি সমস্ত গুণই বর্ত্তমান আছে, সুতরাং ইহা ভক্তজনের সহিতই আস্বাদনের সামগ্রী।

দেশ কাল-পাত্র ভেদে এখন দেব গড়িতে সর্ব্বত্র বানর হইয়া পড়িতেছে। ঘাটে, মাঠে, যেখানে সেখানে এখন তাই এই সকল রসগীতির ছড়াছড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। মদের দোকান, চাটের দোকান প্রভৃতি অপবিত্র স্থানেও এখন ইহা গীত হয়। বাবাজী মহাশয়গণ নাম দিতে গিয়া অকাতরে সকল স্থানেই ঐ সকল পদাবলী গান করিয়া বেড়ান,—অথচ ইহার যে কি মূল্য, তাহা তাঁহাদের গোচর নাই; সেই জন্যই ঐ সকল পদাবলী গান করিয়া আপনাদের নৈমিত্তিক নাম দেওয়া কার্য্য সমাধান করিয়া থাকেন। যদি বলেন যে, পতিতপাবন

দয়ালশিরোমণি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যবনাদিকেও ত নাম দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, তবে আর তাহাতে তেমন ক্ষতি বা দোষ কোথায়? কিন্তু, মনে রাখিবেন—তাহা এই রস লীলা-গীতি নহে, তাহা শুদ্ধ নামসংকীর্ত্তন,—যাহা সর্ব্বত্রই গীত হইতে পারে। কিন্তু লীলা রস অযথা-স্থানে গীত হইলে অপরাধী হইতে হয়।

নীলাচলে অবস্থিতি কালীন শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিনটি দশায় সময় অতিবাহিত হইত,—বাহ্য, অর্দ্ধবাহ্য, আর অন্তর্দশা। বাহ্যদশায় নামসংকীর্ত্তন, অর্দ্ধবাহ্যে, প্রলাপ বর্ণন এবং অন্তর্দশায় প্রভু আমার স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় সঙ্গে গম্ভীরা-ভিতরে অতিগভীর রজনীতে ঐ সকল লীলা-রস আস্বাদন করিতেন। অতএব ইহা আমাদের স্মরণ-মননেরই গোপনীয় ধন, পাত্র ভেদেই ইহার আস্বাদন হওয়া সম্ভব।

অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
তৎকালে বিনাশ হয় হাসিতে খেলিতে॥

যৎকালীন গোদাবরী তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায়কে সাধ্য নির্ণয় বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি অনেকানেক সাধনভক্তি বর্ণনা করায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন না। তজ্জন্য রামানন্দ রায় যথাক্রমে সর্ব্বসাধ্য ব্রজভক্তির বর্ণন করিলেন। প্রভু আমার শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতিকে "এহোত্তম" বলিলেন বটে, কিন্তু তখনও রায়কে বলিলেন যে, যদি ইহার উপর কিছু থাকে তাহাই বর্ণনা কর। রায় তখন মধুর রসের বর্ণন করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন—ইহাই সাধ্যের অবধি হইল। তবে এইভাবের অধিকারী একমাত্র গোপীগণ, অন্যের ইহাতে অধিকার নাই। অতএব অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ইহা বলিবার বা শুনিবার অধিকার কোথায়?

শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ-লক্ষণাদি দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইনি একজন সামান্য সন্ন্যাসী নহেন, দেবারাধ্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তথাপি তত্ত্ব বস্তুর গৌরব রক্ষার নিমিত্ত সহসা প্রকাশ না করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্ণন করিলেন। সুতরাং ইহা যে আমাদের হৃদয়ের ভাব্যনিধি, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ খণ্ডিতা-রসের এই পদটিতে প্রমাণিত হইতেছে। খণ্ডিতা-নায়িকা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীকে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

এ ধনী মানিনী করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেমঘট- হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত॥

তুয়া বিনা হাম যদি পরশ করি কোয়।
তুয়া হার-নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারী বোলে যদি নহে পরতীতি।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিতী॥
ভুজপাশে বাঁধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উর-কারাগারে বাঁধি রাখ দিবারাতি।
বিদ্যাপতি কহে উচিত ইহ শাতি॥

এ কথা কে বলিতে পারেন? সামান্য কন্দর্পপীড়িত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বলিবার ইহা সাধ্য হইতে পারে কি? যিনি কন্দর্পবিজয়ী রসিকশেখর, তিনিই ইহা বলিবার ও আচরিবার উপযুক্ত পাত্র।

জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লয়ে গোপীগণ॥

এ সব যদি আদিরসপূর্ণ অশ্লীলবাক্য হইত, তাহা হইলে মহাভাগবত বিদ্যাপতি ঠাকুর কখনই বর্ণন করিতেন না। তিনি সংযমী ভাবুক পুরুষ ছিলেন, তাই নির্ভয়ে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল জয়দেব গোস্বামী দিব্য দিয়া গিয়াছেন যে,—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং
মধুরকোমলকান্ত-পদাবলিং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীং।

অতএব অযোগ্য পাত্রে ইহা আলোচিত হইবার বস্তু নহে। এই সকল পদাবলী বহুকাল পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা যখনই গীত হইবে, তখনই নূতন বলিয়া বোধ হয়; কখন পুরাতন হইবার নহে। কারণ, ইহা লেখনী-সাধ্য কবিতা নহে, আরোপসিদ্ধবস্তু,—সাক্ষাল্লীলা দর্শন না হইলে এরূপ বর্ণিত হইবার নহে। এই সকল লীলারসবর্ণনকারী মহাজনগণ সখিকৃপায় সখিদেহ লাভ করিয়া সাক্ষাৎ দর্শনে যাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাদের ভাণ্ডারের জিনিষ বলিয়া তাহার চিরকালই নূতনত্ব থাকিবে এবং চিরদিনের জন্ত তাহা নব নবরূপে প্রকাশমান হইবে।

এই লীলারস গানের কতকগুলি নিয়ম-পদ্ধতি আছে। সময়োচিত ভিন্ন

এক সময়ের গান অন্য সময়ে গান করিলে অপরাধী হইতে হয়। কেন না ইহা স্মরণমনন, উপাসনার ধন। ধ্যান-ধারণাদি সাধনা হইতেও উৎকৃষ্ট ভজন। পাছে নিয়ম বহির্ভূত হয় তাই বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ "ক্ষণদা" ও "দণ্ডাত্মিকা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব উক্ত গ্রন্থের প্রণালী অনুসারে এই লীলা-রস গান করা কর্ত্তব্য। কোন্ পক্ষের কোন্ তিথিতে ও অষ্টকালীন কোন্ দণ্ডে কোন্ লীলা গীত হইবে, তাহার বিশিষ্টরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির কতকগুলি বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে সেই সকল নিয়মানুসারে এই সকল লীলা গীত হইবে। অভিসারিকা-লীলার কতকগুলি নিরূপিত বিধান আছে। প্রথমতঃ পক্ষভেদে—কৃষ্ণা ও শুক্লা, দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ষড়ঋতুর প্রকার ভেদ; তাহা ছাড়া দিবাভিসার ও সময়নির্দ্ধার স্বতন্ত্র। বাসকসজ্জা ও উৎকণ্ঠিতাতেও ঐ প্রকার ঋতুভেদ ও সময় নির্দ্ধারিত আছে। খণ্ডিতার আরও অধিক বিশেষত্ব আছে—নায়িকা ও নায়ক ভেদ। যে নায়িকার যোগ্য যে নায়ক, সেই মত উক্তিতে গান করা কর্ত্তব্য; এক নায়িকার গান অন্য নায়কের উক্তিতে গান করা চলিতে পারে না।

যে স্থানে লীলাগান হইবে, তথায় বিছানা দেওয়া অনুচিত। পাদুকা লইয়া গমন, তাম্বুল চর্ব্বন, ধূমপান প্রভৃতি একেবারে নিষিদ্ধ। শ্রীধাম নবদ্বীপ, শান্তিপুর গোস্বামী-মালীপাড়া প্রভৃতি স্থানে বহুকালাবধি এই প্রথা প্রচলিত আছে। অনেকানেক পল্লীগ্রামে এই নিয়ম এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকিবার কারণ এই যে,—যে স্থানে ভগবল্লীলা গীত হয়, অবশ্যই সেই স্থানে লীলাকারী প্রভুর শুভাগমন হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ শ্রীভগবান্ শ্রীমন্ নারদঋষিকে বলিয়াছিলেন যে, যে স্থানে আমার লীলাগান হয়, আমি নিশ্চয় সেই স্থানে বিরাজিত থাকি। আমরা যখন কোন গুরুজনের সাক্ষাতে ঐরূপ আচরণ করিতে পারি না, তখন লীলাগান স্থানে ঐরূপ আচরণ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল আচরণে অন্যমনস্ক হইতে হয়, অন্যমনা হইলেই শ্রবণের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয়; কেন না,—

নিরুপাধি কৃষ্ণ-প্রেম উপাধি নাহি সয়।
উপাধি হইলে এক বিন্দু নাহি রয়॥

অতএব অতি পবিত্রভাবে ইহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; অন্যথা ঘোরতর অপরাধ ঘটিয়া থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে শ্রবণ-

কীর্ত্তন যে চৌষট্টি ভক্তির অন্তর্গত, তাহা অনুমতি করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে,—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম উপাধি নাহি সয়।
উপাধি হইলে এক বিন্দু নাহি রয়॥

এই রসলীলা যিনি গান করিবেন তাঁহার বিশেষরূপ যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন। আহারাদি সবই তাঁহার সাত্ত্বিকভাবে হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া প্রথমতঃ কিছু লেখাপড়া জানা প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ মহৎসঙ্গ করিতে হইবে, নতুবা এই অপ্রাকৃতলীলার কখনই স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। যে লীলা গীত হইবে, সেই লীলারস যদি গায়কের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা হইলেই কীর্ত্তনে ও শ্রবণে পরমানন্দ লাভ হইবে; নতুবা ভেকের কোলাহল মাত্র,—বৃথা পরিশ্রম করাই সার হয়। এটি আবার সৌভাগ্য-সাপেক্ষ; বহু জন্মের সুকৃতি না থাকিলে নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি হইবার নহে। তবে, বস্তুশক্তির গুণ কখনই নষ্ট হইতে পারে না, তদ্‌ভাবে চিত্তার্পণ করিলে অবশ্যই কোন না কোন সময় সেই রসের আবির্ভাব হইবে; অতএব লীলা-কীর্ত্তনকালীন গায়ক মাত্রেরই নিবিষ্টচিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

যিনি এই লীলা-গান কীর্ত্তন করেন, তিনি অবশ্যই সৌভাগ্যশালী, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদিও অর্থ গ্রহণ করেন বটে, তথাপি ইহা সাত্ত্বিক উপার্জ্জন। এই অর্থই পরকালের সহায় থাকিবে। তাহার আদর্শপ্রমাণ পুষ্প-বিক্রেতা ও মাংসবিক্রেতা; উভয়েই ব্যবসা করে এবং উভয়েই মূল্য গ্রহণ করে, কিন্তু ইহার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য এই যে, পুষ্পবিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করে ও সুগন্ধ ভোগ করিতে পায়। আর মাংসবিক্রেতা মূল্য পায় বটে, কিন্তু দুর্গন্ধভোগ করিতে বাধ্য হয়। আর একটি কথা এই যে, পল্লীগ্রামে চাষী লোকদিগের একটি কারবার আছে, তাহারা কলুকে সরিষা কিংবা তিল দিয়া থাকে; কথা থাকে যে, সেরপ্রতি এত পরিমাণ তৈল দিতে হইবে। কলু যথাসময়ে তাহার বাটীতে তৈল ও খোল পঁহুছাইয়া দিয়া যৎকিঞ্চিৎ 'বানি' লইয়া যায় গৃহস্থও আপন তৈল-খোল বুঝিয়া লয়; কলুর কিন্তু, পরের তৈলে ঘানি গাছটি পাকিয়া যায়। ইহাও সেইপ্রকার, পরের তৈলে গাছ পাকে মাত্র।

লীলা-কীর্ত্তন গায়কের দুই চারি খানি গোস্বামী-গ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ খানি অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ খানি বৈষ্ণব মহোদয়দিগের অলঙ্কার শাস্ত্র। নায়ক-নায়িকার ভেদ প্রভৃতি সমস্ত রসই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

অতএব এই গ্রন্থ খানি অধ্যয়ন না করিলে, লীলা গান কীর্ত্তন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ইহার আবার একটি গুরুতর ব্যাপার আছে। একজন গায়ক গান করিতেছেন, তাহার পর আর একজন গায়ক গান করিবেন,—পূর্ব্ব নিয়োজিত যে রসের যে পদে গান রক্ষা করিবেন, পরবর্ত্তী গায়ককে সেই রসের সেই পদের অনুরূপ নবদ্বীপ লীলা অর্থাৎ গৌরচন্দ্র গান করিতে হইবে, তাহা হইলেই ব্রজ-লীলার পরিকর নবদ্বীপলীলায় যে কি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তাহা জানিয়া রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা জানিতে হইলে "স্বরূপ নির্ণয়" ও "গৌরগণোদ্দেশ" গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া "আখর" দেওয়াও একটি গুরুতর কার্য্য। পদের ভাব বজায় রাখিয়া রস পুষ্টি করিয়া আখর দিতে না পারিলে রসাভাস দোষ হয়, ইহাতে উপাসনার পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হয়; অতএব বিশেষ বিবেচনার সহিত সাবধান হইয়া আখর দেওয়া কর্ত্তব্য। ফলতঃ উপাসক ব্যক্তি ভিন্ন কেহ এই লীলা-গান করিবার অধিকারী হইতে পারেন না। দুঃখের বিষয়, এমন যে সাধনের ধন—চিন্ময়রস যাহাতে সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহার যে কতদূর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। * * *॥

শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের বঙ্গানুবাদ।

(১)

প্রেমাধিক্যে নরবপু করি অঙ্গীকার।
সুরবৃন্দ সদা করে উপাসনা যাঁর॥
স্বভজন পরিপাটী কর্ম্মযোগ-হীন।
শিখাইলা স্বরূপাস্তে যে ন্যাসী নবীন॥
লক্ষীবান সে চৈতন্য কভু কি আমার।
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আবার?

(২)

অভয় আশ্রয় স্থান সুরেশ বৃন্দের।
পরতম তত্ত্ব সর্ব্ব উপনিষদের॥
ইহ পরলোকে সর্ব্বধন মুনিদের।
মূর্ত্তিমান মধুরতা দাস্য ভকতের॥
অম্বুজ-লোচনা গোপকুলাঙ্গনা যত।
তাঁদের পবিত্র প্রেম সুধাসার ভূত॥
লক্ষীবান সে চৈতন্য কভু কি আমার।
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আবার?

(৩)

জগতে অতুলনীয় প্রেমভক্তি ধনে।
হেন স্বরূপের পোষ্টা কৃপামৃত দানে॥
অদ্বৈত আচার্য্যপ্রিয় শ্রীবাস-শরণ।
পরম পুরীরে যাঁর গুরু আচরণ॥
উৎকল অধিপে কৃপা প্রদানে তৎপর।
দীনের উদ্ধার কর্ত্তা হরি দুঃখ হর॥
লক্ষীবান সে চৈতন্য কভু কি আমার।
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আবার?

(৪)

অর্ব্বুদ কন্দর্পসম মধুর প্রভা'য়।
প্রভান্বিত, সর্ব্বজীবপ্রিয় যাঁর কায়॥
জিতেন্দ্রিয় যতীবৃন্দ শিরোবিভূষণ,
অরুণ করাভ যাঁর গৈরিক বসন॥
হিরণ্য সুষমা গঞ্জি অঙ্গরুচি যাঁর।
ভক্তি সুধাস্বাদে মত্ত প্রেম অবতার॥
লক্ষীবান সে চৈতন্য কভু কি আমার।
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আবার?

(৫)

হরেকৃষ্ণ মন্ত্র উচ্চে উচ্চারণ বশে।
নাচিত রসনা নাম-মূরতি পরশে॥
সংখ্যা রক্ষা হেতু কৃত গ্রন্থিতে সুন্দর,
কটি-সূত্রে, উদ্ভাসিত যাঁর বামকর॥
আকর্ণ-নয়ন, খেলারসে আকুঞ্চিত।
হইত যাঁহার ভুজ আজানুলম্বিত॥
লক্ষীবান সে চৈতন্য কভু কি আমার।
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আবার?

(৬)

সিন্ধুকূলে কুসুমিত উপবন চয়।
হেরি যাঁর বৃন্দারণ্য মুহুমনে হয়॥
সেই স্মৃতি সহজাত প্রেমের পীড়নে।
গত-ধৈর্য্য বিভূষিত সাত্বিক ভূষণে॥
কোথাও বা ভক্তিরসে রসিক যাঁহার।
নাচিত রসনা কৃষ্ণ বলি বারবার॥
সে চৈতন্য লক্ষীবান কভু কিগো আর
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আমার?

(৭)

রথারূঢ় নীলাচল-পতির সদনে।
বিপুল প্রেমের উর্ম্মিজনিত নর্ত্তনে,
রাজপথে মহাহ্লাদ মগ্ন অচেতন,
তনু যাঁর পঞ্চশর গরল খণ্ডন,
সহর্ষ কীর্ত্তন রত বৈষ্ণব নিচয়,
রাখিত বেষ্টিত করি' ব্যাকুল-হৃদয়॥
সে চৈতন্য লক্ষীবান কভু কিরে আর
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আমার?

(৮)

নয়নাম্বুধারাপাতে সিঞ্চিত ভূতল।
উচ্চ সংকীর্ত্তন রত আনন্দে বিহ্বল॥
কদম্ব কুসুমগুচ্ছ নবীন কেশর।
জিনিয়া নিবিড় রোমহর্ষে মনোহর॥
পরিবৃত সর্ব্বঅঙ্গ শোভার ভাণ্ডার।
ঘন স্বেদবিন্দু পুঞ্জে সিক্ত তনু যাঁর॥
লক্ষীবান সে চৈতন্য কভু কি আমার
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আবার?

(৯)

সুবিশ্বাস সমুজ্জল শুদ্ধ বুদ্ধিমান।
পড়িবেন গৌরাষ্টক যেই বিদ্যাবান॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অমলপদ আনন্দ-আকরে।
প্রেমেরলহরী তাঁর স্ফুরুক সত্বরে॥

(১০)

বন্দি' প্রভু শ্রীবিপিন-বিহারী-চরণ।
চিত্ত সিংহাসনোপরি করিয়া স্থাপন॥
গৌর-প্রেম-দূত রামদাসের আদেশে।
গৌড়ীয় ভাষায় গৌর অষ্টক প্রকাশে
শ্রীহরি-শ্রীআহ্লাদিনী সুত সত্যদাস।
ভক্তবৃন্দ কৃপা করি' পূর্ণ কর আশ॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র।

কৃপণের ধন।

লেখক—শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ বসু।

কৃপণ অতি যত্নে সঞ্চিতধনের রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করিয়া থাকে। অতি গোপনীয় স্থানে সুদৃঢ় পেটিকা মধ্যে ধনগুলি রক্ষা করিয়া নিরন্তর ধনের চিন্তাতেই কালযাপন করে। মধ্যে মধ্যে নিশীথ সময়ে—জগতের সকল প্রাণী নিদ্রায় অভিভূত হইলে—কৃপণ পেটিকা উদ্‌ঘাটন করিয়া সঞ্চিত ধনগুলি এরূপ সতর্কভাবে ও নিঃশব্দে পরীক্ষা করিয়া দেখে যে, যেন তাহার শব্দে গৃহস্থ কাহারও নিদ্রাভঙ্গ না হয়, বা রজনীচর কোন প্রাণী উহার শব্দ শুনিতে না পায়। ধনগুলিতে হাত লাগিলে পাছে মলিন হইয়া যায় বা ধনের আয়ু ক্ষয় হয়, এই ভয়ে কৃপণ ধনে হস্তটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করায় না। ধনের ক্ষয় কিছুতেই হইতে দেয় না, পরিপুষ্টি সাধনেই সতত চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধনের বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকে। আহার, বিহার, সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কিছুতেই কৃপণের মন থাকে না, মন থাকে কেবল ধনের দিকে। সমাজস্থ লোক বা আত্মীয় স্বজনগণের সহিত কৃপণ কথা কহিতেও ভালবাসে না। কারণ, কথাপ্রসঙ্গে গুপ্তধনের কথা পাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলে। ফলে কৃপণ ধনকেও রাখে অতি নিভৃতস্থানে এবং অপনাকেও নিভৃতস্থানে রাখিয়া সদাসর্ব্বক্ষণ ধন চিন্তাতেই রত থাকে। কৃপণের ধন প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। সচরাচর শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃপণ ধনের জন্য প্রাণ হারায় তথাপি সঞ্চিত ধনের ক্ষয় বাসনা করিয়া একটি পয়সাও ব্যয় করে না। কৃপণ! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ধন ও ধন্য তোমার ধনের আসক্তি। তোমার ন্যায় ধনপ্রিয় লোক জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজমান থাকুক ও তোমার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অপর সাধারণে পরমার্থ ধন সঞ্চয়ে একান্ত অনুরক্ত হউক, ইহাই ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর জীবের মঙ্গল জন্য, ভালমন্দ, সুখদুঃখ, আলোক অন্ধকার, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, দিবারাত্রি, প্রভৃতি সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃপণ ও দাতা তাঁহারই সৃষ্টি; আর তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু হইতেই জীবের উপকার সাধন হইতেছে এবং বিবিধ বিষয়ে জীবগণ বিবিধপ্রকারের উপকার লাভ করিয়া কৃতার্থ ও শিক্ষিত হইতেছে। এই কারণ বশতঃই মহাত্মাগণ জগতকে শিক্ষার স্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, জগতে কৃপণ হইতে জীবের কি শিক্ষা ও উপকার সাধন হইয়া থাকে।

কৃপণের ধনাসক্তি ও আচার ব্যবহার আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্থূল চক্ষে বড়ই গর্হিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপদেশ লাভেচ্ছুক সারগ্রাহী সাধুগণ উঁহাদিগকে অনুকরণীয় জ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন ও কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, হে প্রভো! কৃপণের ন্যায় তোমার নাম বা তোমার তত্ত্বরূপ মহাধনে আমার যেন অচল, অটল আসক্তি ও ভক্তি জন্মায়। কৃপণের ধনে যেরূপ অসাধারণ যত্ন ও ধনের রক্ষণাবেক্ষণে যেরূপ ঐকান্তিক মনোনিবেশ, তোমার নাম বা তোমার তত্ত্বরূপ পরমধনেও যেন তদ্রূপ যত্ন ও মনোনিবেশ জন্ম জন্মান্তরে লাভ করিতে পারি। কৃপণ যেরূপ গুপ্তস্থানে সুদৃঢ় পেটিকা মধ্যে ধন রক্ষা করিয়া, নিরন্তর ধন চিন্তাতেই কালযাপন করে, আমিও যেন সেইরূপ অতি গোপনীয় স্থান দেহাভ্যন্তরে অতিশয় দৃঢ় হৃদয় পেটিকা মধ্যে তোমার নাম বা তত্ত্বরূপ মহারত্ন রক্ষা করিয়া, নিরন্তর তোমার নাম জপ বা তোমার তত্ত্বের আলোচনাতেই কালক্ষেপ করিতে পারি। আর জগতের সকল জীব নিদ্রিত হইলেও, আমি যেন জাগরিত থাকিয়া, হৃদয়-পেটিকা উদ্ঘাটন করিয়া অমূল্যনিধি তোমার নাম বা তত্ত্ব বিধি অনুসারে নাড়িয়া চাড়িয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারি। কৃপণ যেরূপ ধন ক্ষয় না করিয়া, সঞ্চয় করিতে সতত যত্নবান থাকে, আমিও যেন সেইরূপ তোমার নাম বা তত্ত্বরত্নে হৃদয় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখিতে সর্ব্বদাই যত্নবান থাকি ও আহার নিদ্রায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তোমার নাম বা তত্ত্বের চর্চ্চাতেই মনকে নিরত নিযুক্ত রাখিতে পারি। কৃপণ যেমন গুপ্তধনের কথা ব্যক্ত করিবার ভয়ে আত্মীয়স্বজন ও অপরাপরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল বাসে না, আমিও যেন তেমনই করিয়া তোমার নামানুকীর্ত্তনাদি অতি গোপনে রাখিয়া, অসার ও ব্যর্থ কথায় কাহারও সহিত পরিমিত সময়ের বিন্দুমাত্রও নষ্ট না করিয়া, এবং কৃপণের ন্যায় অতি নিভৃতস্থানে থাকিয়া, তোমার নামানুকীর্ত্তন বা ভজন সাধনাদি কার্য্য অতি গোপন-ভাবে ও নির্ব্বিক্ষিপ্ত-চিত্তে সম্পাদন করিতে পারি। আর অধিক কি বলিব, প্রভো! কৃপণ যেরূপ ধনকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞানে, ধনের জন্য অবলীলাক্রমে প্রাণ হারায়, আমিও যেন সেইরূপ তোমার নামানুকীর্ত্তনাদি কর্ম্মকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক আদরের ধন জ্ঞান করিয়া, উহার জন্য অবলীলাক্রমে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে পারি।

এই শিক্ষাগুলি কৃপণের নিকট হইতে লাভ করিতে পারিলেই জীবের প্রভূত উপকার সংসাধিত হয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষা গুলিকার কল বহুৎ উপকার

আর কিছুই নাই। কারণ এই শিক্ষার ফলেই জীবের ভব-দুঃখ দূর হইয়া যায় ও নিত্য সুখের উদয় হইয়া থাকে।

কৃপণ ও কৃপণের সঞ্চিত ধনকে কবিগণ মধুমক্ষিকা ও মধুমক্ষিকার সঞ্চিত মধুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। মধুমক্ষিকাগণ বহু পরিশ্রমে সমস্ত দিন কুসুম-নিচয় হইতে মধু আহরণ করিয়া কেবলই মধুচক্রে সঞ্চয় করিতে থাকে। সঞ্চিত মধুর একবিন্দুও পান করে না। কিন্তু মধু অপহারক অনুসন্ধানে থাকিয়া, যখন বুঝিতে পারে যে, চক্রটি মধুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে; তখনই অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বা উপায়ান্তর দ্বারা মধুমক্ষিকাগণকে বিনষ্ট বা মধুচক্র হইতে বিতাড়িত করিয়া সমস্ত মধু অপহরণ করিয়া প্রস্থান করে। কৃপণের ধনও ঐ প্রকারে অপহৃত হইয়া থাকে। হয় তস্করে সুযোগ বুঝিয়া কৃপণের প্রাণ বধ করিয়া নিজর চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা অপহরণ করে, না হয় কৃপণের বার্দ্ধক্য কিংবা অসুস্থতা নিবন্ধন রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ বা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে—আত্মীয়স্বজনে বণ্টন করিয়া লয়। আত্মীয়স্বজন বা প্রকৃত উত্তরাধিকারী কেহ না থাকিলে, যাহার ভাগ্যে থাকে, সেই প্রাপ্ত হয় অথবা রাজার কর্ণগোচর হইলে, রাজা রাজকোষ-ভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, মধুমক্ষিকাদি যদি মধু সঞ্চয় না করে তবে মনুষ্যের নিত্য-ব্যবহার্য্য ও অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ যে মধু তাহা কেমন করিয়া ও কোথা হইতে পাওয়া যায়? বলিতে হইবে যে, জীবের উপকার সাধন জন্যই পরম কারুণিক পরমেশ্বর মধুমক্ষিকাকে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি ও সঞ্চয় কালে পিপীলিকা বা অন্য কোন কীট পতঙ্গাদিতে নষ্ট করিতে না পারে এইজন্য উপযুক্ত প্রহরণ সহ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। কৃপণের ধন সঞ্চয় ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রবৃত্তিদাতাও সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর, তিনি যে কাহাকে ভাঙ্গিয়া কাহাকে গড়েন কাহার লইয়া কাহাকে দেন ও কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্য করেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং স্বীকার করিতেই হয় যে, তিনি যাহা করেন সকলই মঙ্গলের জন্য। তাহা হইলেই, কৃপণের ধনাসক্তি ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মঙ্গলেরই জন্য বলিতে হইবে। হইতে পারে আমার ন্যায় অবিবেকীর চক্ষে, কৃপণের আচার, ব্যবহার, নিন্দনীয় ও অতি কুৎসিৎ। কিন্তু বিবেক ও বৈরাগ্য সম্পন্ন মহাত্মাগণের নিকট উহা যে প্রশংসনীয় এবং সাধারণের অনুকরণীয় ও শিক্ষার উপযুক্ত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কৃপণের ধন অনিত্য হইলেও কৃপণের আচরণানুযায়ী সঞ্চিত ও পরমার্থ ধন যে ভগবদ্ভক্তি, তাহা নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয়। কারণ এই মহাবস্তুকে

কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, এ মহাবস্তু দান করিলেও ক্ষয় হয় না, এ মহাবস্তু তস্করও অপহরণ করিতে পারে না, এ মহাবস্তু সঙ্গের সঙ্গী, আপদের উদ্ধারকর্ত্তা, বিপদের কাণ্ডারী ও পরিত্রাণের সম্বল। অতএব এই মহাবস্তু সঞ্চয়ের প্রণালী কৃপণের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়। কৃপণই এই মূল মন্ত্রের শিক্ষাগুরু।

—•—

শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল ভজন।*

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন হে ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলেই আমি নিজকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিদিগের বিনাশের জন্য, এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। এবম্বিধ কার্য্যাবলীর যে কোন একটী কার্য্য সাধনের নিমিত্তও তিনি সময় সময় আসিয়া থাকেন। ভগবানের এরূপ আগমনকে তাঁহার "অবতার" গ্রহণ বলা হয়। শ্রীভাগবতে উক্ত আছে "অবতারো হ্যসংখ্যেয়াঃ" ভগবানের অসংখ্য অবতার। তন্মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, এবং কল্কী এই দশাবতারই আমাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। যদিও এই সমুদয় অবতার তথাপি ইঁহাদের সকল গুলির উপাসনা হয় না। অধিকন্তু

* ভক্তিতে প্রকাশের জন্য এই প্রবন্ধটী আমাদের নিকট আসিয়াছে। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য "শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল ভজন"। আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিচারের জন্য এই প্রবন্ধটী ভক্তিতে মুদ্রিত করিলাম। উদ্দেশ্য—যদি কোন সহৃদয় পাঠক এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহার ঔচিত্য বিষয়ে কোন প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের গোচর করেন। আজ কাল অনেকে অনেক উদ্ভট বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রমাণ প্রয়োগের জন্য যথাশক্তি প্রযত্ন করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দু' একজন সুধীব্যক্তিও একটু সাধুসম্মত যুক্তিদ্বারা আপাততঃ নূতন নিবন্ধের রচনাও করিতেছেন। আমাদের কোন মতে পক্ষপাত নাই। যাহা ভক্তিশাস্ত্রসম্মত ও সাধারণের নিকেট আদরণীয় তাহারই যথোচিত সমাদর করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রথমে আমরা সাধারণকে আহ্বান করিতেছি, পরে আমরা সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিব। পরন্তু আমাদের ইহাও নিবেদন যে, কেহ যেন এই প্রবন্ধের মতকেই আমাদের মত বলিয়া গ্রহণ না করেন। সাধারণের মতামত জানিতে পারিলে পরে আমাদের মত প্রকাশ করিব। (ভঃ সঃ)

শক্তিরও তারতম্য করা হইয়াছে। "এতে চাংশঃকলাপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই সমুদয় শ্রীভগবানের অবতার হইলেও ইঁহারা অংশ কলা স্বরূপ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এজন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ অবতারও না বলিয়া "অবতারী" বলা হইয়া থাকে। আবার ক্রম বিকাশের দিক্‌দিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, ভূসৃষ্টির পর যখন ভূপৃষ্ঠ জলে নিমজ্জিত ছিল, তখন শ্রীভগবান্ শ্রেষ্ঠ মৎস্যরূপেই জলমধ্যে জীবগণের সঙ্গে বিহার করিয়া বেদকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে স্থলভাগ জলসীমা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে জল ও স্থলে বিচরণকারী কূর্ম্মরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠে পৃথিবীকে ধারণ করেন। তদনন্তর স্থলভাগ অত্যুন্নত হইলে ভগবান্ বরাহ রূপ ধারণ করিয়া দশনদ্বারা পৃথিবীকে জলমধ্য হইতে উঠাইলেন। অনন্তর শুধু স্থলচর (পশুরই) আবির্ভাব হয়; সুতরাং তিনিও অর্দ্ধ পশু ও অর্দ্ধ নরাকৃতি নরসিংহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নিধন করেন। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মানবের আবির্ভাব হইলে তিনি বামনরূপে বলিকে ছলনা করেন। তদনন্তর মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে শ্রীভগবানও পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া নানা প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিলেন। ইহার পরেই সমাজ পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণাবতার বলা হয়। তিনি পিতৃমাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, সেবক বাৎসল্য, পত্নীপ্রেম, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতির আদর্শস্থল হইয়া সমাজকে শিক্ষা প্রদান করেন। ক্রম বিকাশে যখন পর পর জীবসমূহ ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে ধরিয়া লওয়া হয়, তখন শ্রীভগবান্ ক্রমোন্নত জীবগণের নিকট ক্রমোন্নত ভাবে আসিয়াই তাহাদের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, সুতরাং শ্রীরামলক্ষ্মণ হইতে শ্রীকৃষ্ণবলরামকে উৎকৃষ্টতর বলিতে হইবে। এবং তাঁহাদিগের হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ উৎকৃষ্টতম বলাই যুক্তিসঙ্গত। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং অবতারী বলিয়াই তাঁহাকে অবতার শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তির অভাব মোটেই নাই। যুগ-ধর্ম্ম রক্ষাকারী যুগাবতার হিসাবে—"শুক্ল রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ" অর্থাৎ সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হরি, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ, কলিকালে পীতবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গই উপাস্য ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই অবতারগণের উপাসনা প্রণালীও ক্রমোৎকর্ষশীল। প্রথমতঃ শ্রীরামলক্ষ্মণেরই উপাসনা হইত বহু শতাব্দী পরে শ্রীশ্রীসীতারামের উপাসনা প্রচলিত হয়। দ্বাপর যুগেও প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণবল-

রামের উপাসনা প্রচলিত ছিল ইহার বহু শতাব্দী পরে শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করেন।*

তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করায় তাঁহার পার্ষদ অনুগত ভক্ত-বৃন্দও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহাকে শ্রীভগবান্ রূপে অবগত হইয়াও কেহ তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন নাই; তাঁহাকে গুরুরূপেই শুধু চিন্তা করিতেছেন। অনন্তর অদ্বৈতাদি ভক্তমণ্ডলী শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে তাঁহারই শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রচ্ছন্নভাবধারী বলিয়া উহাতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু ভক্তগণের ভক্তির প্রবল বন্যাস্রোতে উক্ত আপত্তি তৃণবৎ ভাসিয়া গেল। অতঃপর শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা প্রচার ও তাঁহার ভজন উপদেশ করিতে লাগিলেন। যথা—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে আমার প্রাণ রে॥"

ইহাতেও যাহার পাষাণ মন দ্রবীভূত হইল না, তাহাদিগকে পরম দয়াল প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দদেব—

"—— বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি॥"

এইরূপ প্রেম ও দীনতা দ্বারা শ্রীগৌরধর্ম্ম জগতের আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ইহাই মুখ্য উপদেশ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুরও ইহাই শিক্ষা। নিজকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ জ্ঞান করিবে; কেহ পদদলিত করিলেও উচ্চবাচ্য করিবে না। বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইবে; যে কেহ স্বীয় অনিষ্টসাধন করিলেও তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে না এবং অনাহারে মৃত্যু হইলেও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে না। সম্মান-লাভ-প্রয়াসীদিগকে এবং নীচজাতিদিগকে সম্মান প্রদান করিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবে। এইরূপ আচরণ সহকারে শ্রীহরির ভজনা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ ঘটে অর্থাৎ তাঁহার কৃপালাভ হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের তিরোভাবের পর হইতে সমাজে তাঁহা-

* লেখক মহাশয় এ বিষয়ের শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রমাণ দিয়া দেখাইতে পারিলে ভাল হইত। (ভঃ সঃ)

জের উপাসনাই প্রচলিত হয়। পক্ষান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গকে গুরু কল্পনা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনাও অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুই শ্রীগৌরাঙ্গ, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা সিদ্ধ হয়। তত্ত্ব হিসাবে চিন্তা করিলেও শ্রীগৌরাঙ্গকেই "স হি পরতত্ত্বং পরংমহ।" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতম ভগবান বলিয়া বলা হইয়াছে। ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইলেই ভগবানপদবাচ্য হয়েন। শ্রীকৃষ্ণে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পূর্ণ সমাবেশ ছিল, সুতরাং তিনি পূর্ণতম ভগবান, কিন্তু পরতত্ত্ব নহেন। অথচ শ্রীগৌরাঙ্গই পরতত্ত্ব। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের উপাসনা কীর্ত্তনবিলাসের জন্য। ইহা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রস পর্য্যন্ত। মধুর রসের উপাসনা করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের বামে তাঁহারই প্রাণবল্লভা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে স্থাপন করিতে হইবে। যেইরূপ শ্রীরামের বামে সীতা, শ্রীকৃষ্ণের বামে রাধা, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের বামে বিষ্ণুপ্রিয়া না হইবে কেন? আমরা বাঙ্গালী, শ্রীভগবান্ বাঙ্গালী জাতির উপর কৃপাপরায়ণ হইয়াই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি জগতের ঠাকুর হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ বলিব এবং প্রিয়াজীকেও বাঙ্গালীর ঠাকুরাণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বলিব।

যদি শ্রীরাম-সীতা, শ্রীরাধা-কৃষ্ণ ভজন শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন অশাস্ত্রীয় হইবার কোনও যুক্তি নাই। বিশেষতঃ শ্রীনরহরি প্রভৃতি ভক্তকুলতিলকগণ শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করিয়া সমাজে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের যতই প্রিয়তম হউন না কেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় প্রিয়তমা শ্রীগৌরাঙ্গের আর কেহ হইতে পারেন না। যিনি ধর্ম্মে কর্ম্মে সকল বিষয়েই অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাহাপেক্ষা প্রভুর বল্লভা আর কে হইতে পারেন।

অনেকে প্রশ্ন করেন—শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে কি প্রকারে স্থাপন করা যায়? তদুত্তরে আমি এই বলিতে চাহি যে, নিত্য নবদ্বীপ বিহারীর সন্ন্যাস কি সম্ভবে? শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেমন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" বলিয়া শাস্ত্রোক্তি আছে, আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গও স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে, তিনিও নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। তবে যে সন্ন্যাসগ্রহণ, উহা জীবোদ্ধারের জন্য কপটতা মাত্র। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।" পাষণ্ডী পাষণ্ডিদিগের উদ্ধারের জন্য আমাদের দয়াল প্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে

হয়। তাঁহার কাঙ্গাল বেশ দেখিয়া জীবের হৃদয় দ্রব হইবে ইহাই সন্ন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য, নতুবা সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজনই ছিল না। বিশেষতঃ কলিযুগে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ। যথা,—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেন সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

একব্যক্তি নদীতীর দিয়া আনন্দে ভ্রমণ করিতেছিল, হঠাৎ একখানা নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে যাত্রীগণ জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। ভ্রমণকারী তদ্দর্শনে বিকলচিত্ত হইয়া যদি গামছা পরিয়া জলে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক বিপন্ন ব্যক্তিদিগের উদ্ধারসাধন করে, তাহা হইলে উক্ত ভ্রমণকারীকে সন্ন্যাসী বা উদাসীন সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইবে কি? তাহা কখনও নহে। শ্রীগৌরাঙ্গও ভব-সমুদ্রে পতিত জীববৃন্দের দুর্গতি দর্শনে সামাজিক আবরণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহাদের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন।

নদীয়ানাগর রূপই তাঁহার স্বরূপ। তিনি শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীরামানন্দ রায়কে নদীয়ানাগর মূর্ত্তিই প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

"তবে তাঁরে মহাপ্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥"

নবঘনশ্যাম রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও কাঞ্চনগৌরী শ্রীমতী রাধা উভয়েই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে একরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ মূর্ত্তিতে অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণভাব লুকায়িত ভাবে রক্ষা করিয়া বাহিরে শ্রীরাধার ভাব, কান্তি ও বিলাস পরিগ্রহ পূর্ব্বক একদেহধারী শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে বিচরণ করিতেছেন।

সুতরাং শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াই কলি-জীবের উপাস্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ দ্বারা যখন এবম্বিধ উপাসনা প্রণালী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন আমরা নির্ব্বিবাদে ইহা গ্রহণ করিতে পারি।

শ্রীনিত্যানন্দ মার খাইয়াও প্রেম বিলাইয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় জীবের মঙ্গলার্থে কৃচ্ছ্রসাধন করেন নাই। কঠিন জীব যতই তাঁহার জীবনী পাঠ করিবে, ততই তাহার পাষাণ মন ক্রমশঃ গলিতে থাকিবে এবং অশ্রুবর্ষণ করিয়া আত্মশোধন পূর্ব্বক পবিত্র হইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার লীলায় পরকীয়া রসের অভাব; সুতরাং সমুদয় ভাব বিকশিত হইয়া মহাভাবের পোষণ করে না এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সর্ব্ববিধ রসের খেলাও চলে না।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

তাহা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনবিহারী ছিলেন, সুতরাং তিনি নিশাকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয়ন মন্দিরে গমন করিতেন না। কোন কোন দিন কীর্ত্তনানন্দে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সুতরাং বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠা, মান ইত্যাদি ভাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে বিরল নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের নিশাভাগে আগমন—প্রিয়াজীর পক্ষে যখন দুর্লভ ছিল, তখন প্রিয়াজীকে বাধ্য হইয়াই স্বকীয় বস্তুকে পরকীয় বস্তুর ন্যায় দুর্লভ ভাবেই চিন্তা করিতে হইত। অধিকন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে তিনি প্রিয়াজীর সম্পূর্ণ পরকীয় হইয়া পড়েন। ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রভুর সহিত প্রিয়াজীর মিলনের সম্ভাবনা রহিল না। পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভই ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহারা বল্লভ অর্থাৎ ভক্ত বা জীব বল্লভ হইলেন। মোটের উপর লীলাময় ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস মায়িক জীবের বোধগম্য ছিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সমুদয় লীলা প্রকারান্তরে প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্য জীবের বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মর্ম্ম বোধ করাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ লীলার কোন অংশ বাদ পড়িবার সম্ভাবনা নাই। তাই কলির জীব কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীচরণাশ্রয়ে ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ করতঃ প্রেমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হউক, ইহাই প্রার্থনা।

"পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই মহাবাক্য সার্থক হউক। তিনি জগতের প্রভু হইলেও বাঙ্গালীর নিজস্ব। তাঁহার সন্ন্যাস মূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ত্তি গৃহীর উপাস্য নহে। যাঁহারা ভেকাশ্রয় বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাস মূর্ত্তির উপাসনা করিতে পারেন। গৃহীর পক্ষে তাঁহার নদীয়া নাগর মূর্ত্তিই উপাস্য। বাঙ্গালীর সুদিন ফিরিয়া আসুক। গৃহে গৃহে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হউক।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ছাপাখানার পরিবর্ত্তন এবং সম্পাদক মহাশয়ের শারিরীক ও পারিবারিক অসুস্থতা নিবন্ধনই এবার পত্রিকা প্রকাশে এত বিলম্ব হইল, নূতন ছাপাখানার যত্নে এক্ষণে যথাসময়েই পত্রিকা প্রকাশ হইবে আশা করি। এক্ষণে ছাপাখানার কৃপা। (ভক্তি কার্য্যাধ্যক্ষ।)

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বাশ্রয় প্রাণ গোবিন্দ! ধন্য তোমার খেলা চাতুরী, কি ভাবে বিভোর করিয়া দিয়া যে কত ঘুরাইলে, কত ভোগ করাইলে, কত দেখাইলে, আশাতিরিক্ত কত কি পাওয়াইলে তবু ত সে ঘোরাফেরার বিরাম হইল না, ভোগবাসনার শেষ হইল না, দেখিবার পিপাসা নিবৃত্ত হইল না, আর পাব পাব এই যে দুর্জ্জয় আশা ইহারও ত শান্তি হইল না। লীলাময়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া এখন মনে হইতেছে, যাহা পাইয়াছি উহাই পাবার শেষ নয়, এবং যাহা দেখিয়াছি উহাই দেখিবার চরম নয়, যেন উহার পশ্চাতে একটা অতি মূল্যবান কিছু পাইবার এবং সুন্দর—অতি সুন্দর কোনও কিছু দেখিবার বস্তু আছে, যাহা পাইলে বা দেখিলে আর পাইবার বা দেখিবার আশা মোটেই থাকে না সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায়।

সাধু, গুরু ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি তুমিই সকলের আশ্রয়, তুমি জগতে এবং জগৎ তোমাতে নিরন্তর অধিষ্ঠিত রহিয়াছে — তোমাকে পাইলে এবং তোমার ভুবনমোহন রূপে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিলে আর কিছু পাইবার বা দেখিবার বাসনা থাকে না। কিন্তু দয়াময়! সে শুভযোগ আমার হয় কৈ? শাস্ত্র পড়িয়াছি গুরুমুখেও শুনিয়াছি তোমার প্রদর্শিত পথে চলিলে ও অকপটে তোমার আদেশ পালন করিলে তুমি আর্ত্তির মানবকে দেখা না দিয়া পার না; কিন্তু প্রভো! আমি তো তাহা পারি না তাই অতি কাতর প্রাণে প্রার্থনা প্রাণে প্রাণে আমায় বুঝাইয়া দাও, শুধু বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেও হইবে না, আদেশ মত কার্য্য করিবার শক্তি দাও, যাহাতে তোমার আদিষ্ট পথে চলিয়া, তোমাকে লাভ করিয়া প্রাণমন জুড়াইতে পারি, আকাঙ্খা নিবৃত্তি করিয়া এমন সুদুর্লভ মানব জন্ম সফল করিতে পারি।

যে যাহাই বলুক না কেন, আমি কিন্তু একবাক্যে বলিতে চাই যে, তোমার কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবে না। দাও, দাও, শক্তি দাও প্রভো! তোমার বলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতিকূল ভাব সকল দূর করিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমার নাম-গুণ কীর্ত্তনে আপনা ভুলিয়া চিরদিনের মত তোমার হইয়া জীবন জনম সফল করি। কৃপাময় দীনবন্ধু! দীনজনে কৃপা কর।

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
(তোমার) হৃদি বৃন্দাবনে কমল আসনে
শ্রীরাধিকা-সনে বিহর॥
নয়ন মুদিয়া বা চাহিয়া থাকি অথবা যেদিকে ফিরাই আঁখি
অন্তরে বাহিরে যেন নিরখি তব রূপ মনোহর॥"

তৃষিত নয়নে তোমা নিরখিব শুধু।

বল বল কবে দেখা পাব প্রেমময়।
প্রাণ মাঝে হেরে কবে জুড়াব হৃদয়॥
কতদিনে পোহাইবে এ দুঃখ যামিনী।
হৃদয় অম্বরে প্রকাশিবে দিনমণি।
দেখিতে পাইব কতদিনে তব কান্তি।
হৃদিমাঝে দেখা দিয়ে কবে দিবে শান্তি॥
শূন্যপ্রাণে আছি নাথ বড়ই দুর্ব্বল।
রাখিতে না পারি আর বারি অশ্রুজল।
আমি তব চির দাসী তুমি মনস্বামী।
তোমার আপন জানি সদা ভাবি আমি।
আছি পথপানে চেয়ে কবে দেখা দিবে।
ভালবাসি ব'লে আর কত বা কাঁদাবে॥
অশান্তি উদ্বেগ আর হা হুতাশ ল'য়ে।
থাকিতে না পারি আর আশা পথ চেয়ে॥
অপরাধি ব'লে যদি তুমি তেয়াগিবে।
যাব আর কারকাছে কে আর রাখিবে॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় তোমা বিনে।
জেনেও যাতনা দাও তাই দুঃখ মনে॥
(তাই) বুকেতে পাষাণ বাঁধি বলি কুবচন।
বল নাথ এ পাপের নাহি কি মোচন ?॥
বল বল কৃপা ক'রে কোন দণ্ড নিলে।
এ পাপের শাস্তি হয় দাও মোরে ব'লে।

জীবনান্ত হইলেও সাধিব যতনে।'
তবু যদি একবারও পাই তোমাধনে॥
সকলি সহিতে পারি যদি দেখা পাই।
তোমারে পাইলে আর কারে বা ডরাই॥
যতনে হৃদয়মাঝে পেতেছি আসন।
দয়াকরি আসি তাহে রাখ শ্রীচরণ॥
কিছু নাহি চাব আমি হব অনুগত।
কিছু না বলিব আর দুঃখ দাও যত॥
তুমি মোর প্রাণ সখা তুমি প্রাণ বঁধু।
তৃষিত নয়নে তোমা' নিরখিব শুধু॥

কলি-জীবের উপায়।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

দীনদয়াল, কাঙালের ঠাকুর, পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কলি-কলুষিত মলিন জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবানের নামই যে আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়, তাহা তিনি স্বয়ং কাঙালবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। দয়াল ঠাকুর কারুণ্য-বারিতে প্লাবিত হইয়া বলিয়াছেন, ভাই! একবার হরি বল'; প্রভু আমার রজককে হরি বলাইবার জন্য তাহার কাপড় কাচিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মরি! মরি! কি অপার করুণা! কি জীব-বৎসলতা!!

উপরে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে উহা প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গেরই মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃত পিযূষ। শ্লোকের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া সেইভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে বাস্তবিকই অমৃতত্ব লাভ হয়। প্রভু বলিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে হৃদয়দর্পণের সমস্ত মলিনতা বিদূরিত হয়, যাহাতে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়, যাহা নিখিল মঙ্গলদায়ক এবং বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ, যাহার অক্ষরে অক্ষরে সুধা ক্ষরিত হইতেছে, সেই পরমানন্দ-বিবর্দ্ধক, মনপ্রাণ-

স্নিগ্ধকর শ্রীকৃষ্ণনাম পরম জয়যুক্ত হউন। প্রভু ভক্তভাবে জীব শিক্ষার জন্য আরও বলিতেছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

ভগবানের অসীম করুণা, তিনি অনন্ত নাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক নামেই আপনার সমস্ত শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, আমি যে কোনও নাম গ্রহণ করিয়াই কৃতকৃত্য হইতে পারি। অধিকন্তু এতই দয়া যে, স্মরণ অর্থাৎ নাম গ্রহণের কালাকালও নির্দ্দেশ করেন নাই, যখন ইচ্ছা নাম লইতে পারি; কিন্তু হায়! আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, এমন নামেও আমার কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মিল না।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কলিযুগে নাম বিনা আর গতি নাই. নামসঙ্কীর্ত্তনই কলির মলিন জীবের একমাত্র সুগম ও শ্রেষ্ঠ পথ। সত্যযুগে ধ্যানধারণাদ্বারা, ত্রেতায় যাগ যজ্ঞাদি-দ্বারা, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনাদিদ্বারা জীবের পরমাগতি লাভ হইয়াছে; সত্যযুগে লোক সকল সত্যস্বরূপ ভগবানের ভাবে ভাবিত ছিলেন বিষয়াদিতে তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও আশক্তি ছিল না, তাঁহারা আত্মারাম ভগবানকে অন্তরে অন্তরে উপাসনা করিতেন। ত্রেতায় লোকের বহির্ভৌতিক বস্তুতে কিছু কিছু প্রেম হইয়াছিল সত্য কিন্তু যাগাদি দ্বারা ভৌতিক বস্তু সকল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহারা ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইতেন। দ্বাপরের লোকের ভোগবাসনা কিছু জন্মিয়াছিল, ভৌতিক বস্তু—বিষয়াদি তাহাদিগের সুখস্বচ্ছন্দের নিমিত্ত, এইরূপই ধারণা ছিল বলিয়া, শ্রীভগবানের সেবা—তাঁহার প্রীতির জন্য ঐ সকল বস্তু নিয়োজিত করিয়া ভগবদ্ভাব লাভ করিতেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগেই লোকের শ্রীভগবানে (নৃত্যাদিক) বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা জানিতেন ভগবদ্ভাবই সুখশান্তি নিকেতন, তাই তাঁহারা বিষয়াদিতে অল্পাধিক লিপ্ত থাকিলেও ভগবানেই তাঁহাদিগের অধিক আশক্তি ছিল। আমরা কলির বিষয়াসক্ত বহির্মুখ জীব আমাদিগের সে বিশ্বাস নাই, সে জ্ঞান নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে কাহারও কারও সে বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু কেবল বিশ্বাস

থাকিলেও কাজ হইবে না। ভগবান বড় দাতা, দরিদ্রের প্রতি তিনি মুক্তহস্ত ; কেবল এই বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ঘরে বসিয়া থাকিলে, অথবা ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিলেই দুঃখ ঘুচিবে না, রাজার নিকট যাওয়া চাই, আপনার সুখ দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদা চাই তাঁহাকে জানান চাই আমি প্রকৃত দরিদ্র, তবে তিনি অর্থ দিবেন, তবে দুঃখ ঘুচিবে। ভগবান দয়াময় ভগবান জীববৎসল, দীনবন্ধু, ভগবান অগতির গতি, কাঙ্গালের ঠাকুর, কিন্তু আমরা আসক্তিজড়িত, মায়াবদ্ধ, [illegible] আমাদের হৃদয়ও নিস্তেজ, আত্মোন্নতির জন্য কিছুমাত্র উদ্যম নাই। [illegible] আমাদিগের দুঃখে দুঃখী যে কেহ আছেন, আমাদিগের নয়ন জল মুছাইবার জন্য যে স্নেহময় পরম পিতা শ্রীভগবান বর্তমান রহিয়াছেন, এভাবই অনেকের আদৌ নাই, অতএব পরমার্থ লাভ করিয়া দুঃখ নিবৃত্তি করিবার উদ্যম কই। কেহ কেহ জানেন বটে ভগবান দয়াময় দুঃখবারণ, কিন্তু তাঁহারা মোহমুগ্ধ—অহংকারী, আপনারা ছুটাছুটী করিয়া ক্রমেই আবদ্ধ হইতেছেন। তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না যে, ভগবানের নিকট কাঁদিয়া আত্মনিবেদন করি। কাজে কাজেই দুঃখের অবসান হয় না।

ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন না করিলে ভগবানকে প্রাণের প্রাণ পরম সুহৃৎ জ্ঞান করিয়া ভাবিতে না পারিলে, শান্তি কোথায়? শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।"

আমাকে সর্ব্বজীবের পরমবন্ধু জানিয়া আমাতে নির্ভর করিলে জীবের চিরশান্তি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কি প্রকারে সে ভাব আসিবে? আমাদিগের আয়ু অতি অল্প তাহাতে আবার রোগ শোকাদি নানা বিঘ্ন, মন অতিশয় চঞ্চল, নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর বিষয়াদিতে আসক্ত হইয়া গাম্ভীর্য্য ও স্থিরতা হারাইয়াছি, প্রাণ অন্নগত, ধ্যানযোগে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। যে পথ সত্যযুগের সত্যসংকল্প মহাত্মাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, ক্ষুদ্রচেতা মায়ামুগ্ধ হইয়া আমরা সে পথে কিরূপে যাইব। ত্রেতাযুগের যাগযজ্ঞরূপ যে পথ তাহাও আমাদিগের নিকট অবরুদ্ধ। কারণ একে আয়ু অল্প, তাহাতে আবার ধৈর্য্যও নাই,—'গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি চাই,' স্বার্থ সিদ্ধিই আমাদিগের সংকল্প, আত্মোন্নতি বা ভগবৎ প্রীতি সাধন আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, অধিকন্তু যজ্ঞীয় দ্রব্য সকলও এখন

অতি দুর্লভ। তৎপর দ্বাপরের অর্চনা ও পরিচর্য্যারূপ পথ—কিন্তু চিত্ত স্থির না হইলে কিছুই হইবে না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি দ্বার দিয়া বিষয় সকল প্রবেশ করতঃ প্রলোভন দেখাইয়া মনকে কোথায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, এরূপ চঞ্চলমন লইয়া অর্চনাদি কিরূপে সম্ভব হয়? এখন উপায় কি? আমরা বড়ই নিরাশ্রয়, অবশ্য দয়ার পাত্র, তাই অনাথশরণ দীনদয়াল শ্রীভগবান স্বয়ং কাঙ্গালের বেশে দীনহীন অনাথ কাঙ্গালগণের মধ্যে আসিয়া কলির জীবের একমাত্র উপায়—শ্রীনামসংকীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছেন। প্রভু গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমতঃ আপনার ছাত্রগণকে লইয়া উচ্চরবে নাম সংকীর্ত্তন করেন। প্রভু হাতে তালি দিয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে করিতে শিষ্যগণের সহিত গাহিয়াছিলেন ;—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ)
(গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥)

সকলে প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কেহ বা হাতে-তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন, কেহ বা গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীনবদ্বীপে শুভ শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। ক্রমে এই সংকীর্ত্তন খোল, করতাল লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল, ক্রমে সহস্র সহস্র লোক নাচিয়া গাহিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় করিল। এই ঘটনাটী পদকর্ত্তা বাসুঘোষ একটী পদে নিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"আমার পরশমনির কি দিব তুলনা।
পরশমনির গুণে জগতের জীবগণে
নাচিয়া গাইয়া হইল সোনা ॥"

দীনদয়াল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই সুমধুর নাম সংকীর্ত্তনই—কলির জীবের পরমার্থলাভের উপায়। নাম সংকীর্ত্তনই ভগবদ্ভাব লাভ করিবার অতি সরল, সুগম ও শ্রেষ্ঠ পথ। আমরা যেরূপ চঞ্চল ও লঘুচিত্ত প্রভুও তদ্রূপ নাচগানের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানকে পাইবার উপায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। চিত্ত যতই চঞ্চল হউক না কেন, এই সংকীর্ত্তনের ভিতর প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই ক্রমশঃ ভগবচ্চরণে আসক্তি হইবে। ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয় চিন্তা আসিয়া মনকে টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু সংকীর্ত্তনকালে ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি সমস্তই অবরুদ্ধ থাকে, সে চিন্তা কিরূপে প্রবেশ করিবে? খোল করতালের মধুর

শঙ্খ ও হরিনামের গগনভেদী ধ্বনি শুনিয়া কি বিষয়ের গঞ্জনা কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে? চক্ষুমুদ্রিত থাকিতে, অথবা ভক্তগণের প্রতি, কি শ্রীভগবল্লীলাঘটিত কোনও চিত্রে আসক্ত থাকিতে কি অন্যরূপ সেখানে স্থান পাইতে পারে? রসনা শ্রীহরিনামরসে মজিয়া থাকিতে অন্য রসাস্বাদনে অবসর বা প্রবৃত্তি কোথায়? গাত্র প্রেমভরে ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তপদরেণুর স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কি সে অন্য কোনরূপ স্পর্শ অভিলাষ করিতে পারে? আজ সেই উদ্দণ্ড নৃত্য—আজ সেই মন মাতোয়ারা খোল করতালের মধুময় ধ্বনির সহিত স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবময় নৃত্য আরম্ভ হইলে কি অন্য ভাবের জন্য প্রাণ আকুল হয়? বাস্তবিকই এই মধুময় ভাব সম্বলিত মধুর সংকীর্তনে মনের চঞ্চলতা মনের অহংকার ও সন্দিগ্ধভাব সমস্তই বিদূরিত হইয়া যায়। মন উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবাবেশে বিভোর হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে গড়াইয়া পড়ে।

প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিলেন—প্রভু হাতে তালি দিয়া, খোল করতাল লইয়া, নাচিয়া নাচিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মধুময় শ্রীনাম প্রচার করিলেন। প্রভু হেলিয়া দুলিয়া প্রেমভরে বলিতেছেন—"হরি হরয়ে নমঃ" আবার কখন বলিতেছেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

যেমনই কোনও ভক্ত দেখিতেছেন, অমনি অকিঞ্চনভাবে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া কাতরস্বরে বলিতেছেন,—"আমায় দয়া কর, তোমরা কৃপা করিলেই শ্রীভবানের কৃপা হইবে।" প্রভু আমার ভক্তভাব ধারণ করিয়া আজ দীনাতিদীন, অবনতমস্তক, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিময়, পরিধানে মলিনবস্ত্র, রুক্ষকেশ, অবিরল নয়নধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে। নদিয়ার রাজা, পণ্ডিত শিরোমণি নিমাইচাঁদ আজ তৃণাদপি সুনীচ, আজ শচীর প্রাণধন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়বল্লভ, ভক্তগণের প্রাণের প্রাণ কাঙাল হইতে কাঙাল। আহার নাই, নিদ্রা নাই—নবনীত কোমল অঙ্গ কঙ্করময় কঠিন ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত, সর্ব্বাঙ্গে পুলক ও কম্প, মুখে মধুময় চিরশান্তিদাতা হরিনাম, প্রভুর বিচিত্র লীলা।

প্রভুর এই সমস্ত লীলা, রাজরাজেশ্বরের এই অকিঞ্চনতা, পণ্ডিতাগ্রগণ্যের এই অসামান্য বিনয়তা, ধর্ম্মময় শ্রীভগবানের এই দৈন্যতা সকলই জীব শিক্ষার জন্য, সমস্তই কলির মলিন দুর্ব্বল জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য। যিনি কলি-ভাবাপন্ন নহেন, যিনি দুর্ব্বল নহেন, যাঁহার চিত্ত পাপে কলুষিত হয় নাই, যাঁহার স্থির বিশ্বাস আছে যে, নিজ শক্তিতে ধ্যান ধারণা যাগযজ্ঞাদি করিয়া পরমপদ লাভ করিতে পারিবেন, তিনি এ শিক্ষা গ্রহণ না করিতে পারেন, তিনি এই পথ অবলম্বন না করিতে পারেন, কিন্তু আমরা—যাহারা অতি দুর্ব্বল, দু'পা হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি, যাহাদের পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, হাত ধরিয়া না লইলে যাহাদিগের একপাও চলিবার শক্তি নাই, পাপধূলিতে যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, বিষয়াশক্তিরূপ নিগড়ে যাহারা আবদ্ধ—তাহাদিগের দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কে এমন পাপী তাপীকে কোলে করিয়া লইবেন? কাঙালের সহিত কাঙাল সাজিয়া কে উদ্ধার করিবেন? দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন এমন কে আছেন। তাঁহার অনুসরণ কর; শ্রীগৌরাঙ্গ আগে আগে হরিবোল বলিয়া নাচিয়া নাচিয়া যে পথে চলিয়া যাইতেছেন সেই পথে গমন করাই আমাদিগের একমাত্র উপায়। এমন সুগম, এমন প্রশস্ত পথ আর কোথায় পাইব? কলিজীব, শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম আশ্রয় ভিন্ন তোমার আর অন্য উপায় নাই।

কৃষ্ণ-স্তোত্র।

(জয়) রাধা-রাস-রসিক নটনায়ক কলবেণুবাদক কৃষ্ণ হরে।
কংসকালীয় কেশীচানুর মর্দ্দন হে মধুসূদন কৈটভারে॥
রাধিকেশ! শৈশবে শিশুগণ সঙ্গে অনুক্ষণ ক্রীড়া নানুরতং।
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকৃপাং কুরু মামধমম্॥
(জয়) ব্রজগোপিনী-নয়নোৎপলচর্চ্চিত গো-পালগণাবৃত বংশীধর।
মৃগমদভূষিত কৌস্তভ শোভিত কণ্ঠবিলম্বিত রত্নহার॥
ব্রজপতে! যৌবনে কামিনীকাঞ্চন পরিজন বিষয়ানুরক্তং।
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকৃপাং কুরু মামধমম্॥
(জয়) হ্লাদিনী-শক্তি বিনোদিনী রাধিকারাধ্য সুরাগ্রণী কাম জয়।
সুর নর কিন্নর ভূচর খেচর বিদ্যাধরোরগ সর্ব্বময়॥

মামতিদীনং ভজন বিহীনং কুরুকৃপয়া ভবসাগরপারং।
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকৃপাং কুরু মামধমম্॥
(জয়) অমর-নিকর শিরোমুকুটোজ্জ্বল মণি রঞ্জিত রাজীবপাদ।
তব নামকীর্ত্তনে চরমভদ্রং দূরমপসরতি নিশাদঃ॥
ষড়রিপুতাড়নে জর্জ্জরিতমাং ত্রাণমনুকম্পয়া কুরু রিপুনাশং।
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকৃপাং কুরু মামধমম্॥
(জয়) শ্রুতিমূলে কুণ্ডল মকর বিরাজিত মুনিমোহন চূড়শির্ষে।
দ্বিজমান রক্ষণে বক্ষসি ভৃগুপদ চিহ্ন ধারণমপিহর্ষে॥
নকৃতং তবপদচিন্তনমপিকদা সদা হরিভক্তি বিহীনং।
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকৃপাং কুরু মামধমম॥
(জয়) ক্ষরতি সুধা সদা বদন সুধাকরো মৃদু মৃদু হসিত ত্রিভঙ্গ।
মোহিত মদন তদ্রূপ নিরীক্ষণেঽপসরতি দ্রুতরতি সঙ্গ॥
বিষয়ে বিতৃষ্ণা কদাচিন্নভবতি হরিকথামৃত পানহীনম্।
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকৃপা কুরু মামধমম্॥
(জয়) কটিতটে কিঙ্কিণী চরণে নপুর শোভিত পিধানে পীতধটী।
নবজলধর রুচি তেতনু দর্শনে বিমোহিতা গোপবধূটী॥
ধনাগম চিন্তনে পরিজন গতমম সে বন কালং।
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকৃপা কুরু মামধমম্॥
(জয়) মদনমোহন তব কান্তি বিলোকনে স্মর হর বিহ্বলিতাঙ্গে।
নৃত্যতি গায়তি ধাবতি মজ্জিত রূপরস সাগর তরঙ্গে।
পর হর যত্নপতেঽকিঞ্চন দুর্জ্জন হরিহর তৃষ্ণতি তারম।
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকৃপা কুরু মামধমম্॥

শ্রীহরিহর স্মৃতিরত্ন।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা।

"এ বেশে যে প্রাণ মজে নাহে শ্যাম
বৃন্দাবন বিনা মন মজে না।
যে তুমি সে আমি তথাপি হে স্বামী
এ মিলন সুখে মন ভরে না॥

কাঁহা সে মোহন, শ্রীবংশী বদন
বর্হাপীড়া শোভা চারে কেশ।
(আর) কাঁহা রাজ বেশ ওহে হৃষীকেশ
রাজবেশে নাহি মাধুরীর লেশ॥
কাঁহা বৃন্দাবন, মাধুরী-মোহন
ময়ূরের কেকা পিকের কুহু।
কাঁহা কুরুক্ষেত্র, হয় হস্তি অস্ত্র
বিকট রবেতে ডাকিছে মত্ত॥
মোর মন চাহে, সে নিকুঞ্জ মাহে
তোমার মুরলী মধুর তান।
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে লহরে লহরে
চুরি করি করি গোপীর প্রাণ॥
চল চল শ্যাম, বৃন্দাবন ধাম
মোর মন চাহে যমুনা তীর।
সে কদম্ব মূল নদী তরুকুল
সে পুলিন বন ধীর সমীর॥
তেমনি করিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া
আবার বাঁশী বাজাও শ্যাম।
চল চল যাই, সে সাধ মিটাই
অবলা রাধার রাখহ প্রাণ॥"
কুরুক্ষেত্রে প্যারী, পেয়ে বংশীধারী
করে নিবেদন আপন মনে।
শুনি সে কাহিনী শ্যাম গুণমণি
চলিলা আকুল শ্রীবৃন্দাবনে॥
এই ভাব ভরে হেরি রথোপরে
আপন নাথেরে শ্রীগৌরহরি।
পড়ে এক শ্লোক নাহি বুঝে লোক
রূপ শুনি দিলা প্রকাশ করি॥

যথাহি পদ্যাবল্যাং প্রকাশে—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-

স্তে চোম্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

চাহি জগন্নাথে　　গোরা চাঁদ মুখে
কত ভাবেশেতে কত কি বলে।
অচল সে রথ　　সচল সে পথে
দুই সাক্ষাৎ শ্রীনীলাচলে॥
গাহে দামোদর　　মধুর মধুর
সময় উচিত মধুর গান।
কখন উগ্র　　কখন মধুর
গোরা নাচে সুন্দর নাচিয়া যায়।
গোরা জগন্নাথে,　　কত রঙ্গ রথে
কতই আনন্দ করিয়া চলে।
যে কেহ দেখিল　　সেই ধন্য হৈল
তার ভাগ্য সীমা নাহি ভূতলে॥
সপ্ত সম্প্রদায়　　নাচে গৌর রায়
চৌদ্দ মাদল বাজিছে ঘোর।
গৌড়বাসীগণ　　করে সংকীর্ত্তন
দেহ পাসরা নাহি আনন্দ ওর॥
প্রেমে গর গর　　গোরা নটবর
ভক্ত গণ করে জগন্নাথ বলিতে নারে।
জয় জগন্নাথ　　উঠে অকস্মাৎ
লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি আনন্দ ভরে।
ভাব সেই রঙ্গ　　ওহে ভক্তবৃন্দ
সে লীলা-প্রসঙ্গ ভকত প্রাণ।
মাগে জগন্নাথ　　করি আত্মসাৎ
সে প্রেম সে সঙ্গ করহ দান॥

দীন—শ্রীরামচন্দ্র সেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী।(৬)

আজ কতদিন হইল নিমাই পূর্ব্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। আত্মীয়স্বজন—এক কথায় সমস্ত নদীয়াবাসীরই চিত্ত যেন নিরানন্দময়। তাহাদের এ বিরহসমুদ্রের সীমা নাই—কূল নাই। নিমাই ছিলেন নদীয়াবাসীগণের নয়নের আনন্দ—কতদিন তাহাকে দেখে নাই তাই যেন, নদীয়ার আনন্দ উৎসব নিভিয়া গিয়াছে। নিমাইর—কাঁচাসোণার ন্যায় প্রফুল্লিত অঙ্গকান্তি দেখিয়া তাহার ভক্তেরা—তাহার ভালবাসার পাত্রেরা ভালবাসার মিষ্ট নামকরণ করিয়াছিল। আজ তাহাদের সেই গৌরগুণমণি নদীয়ায় নাই—হৃদয় তাহাদের নিরানন্দ ত হইবেই।

এদিকে লক্ষ্মীদেবী প্রাণনাথের প্রবাস গমনের পর হইতে আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যাগই করিয়াছেন। স্বর্ণ কমলিনী যেন নিদাঘতাপে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। স্বামী তাঁহার উপর মাতার সেবার ভার দিয়া গিয়াছেন, তিনিও যথাসাধ্য শাশুড়ীর সেবা করেন। তাঁহার নিকট হইতে স্বীয় অশ্রু গোপন করিয়া প্রফুল্ল থাকিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু শচীর চক্ষুতে এসব এড়াইয়া যায় না। তিনি বধূটীকে নানামতে সান্ত্বনা দেন, অবসর পাইলেই তাহাকে কাছে লইয়া বসিয়া কত গল্প করেন। এইরূপে দিবসে লক্ষ্মী কতকটা সান্ত্বনা পান কিন্তু রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রা হয় না। সমস্ত রাত্র জাগিয়া ক্রন্দন করেন, চক্ষুজলে উপাধান সিক্ত হইয়া যায়। শচীমা এ সব কিছুই জানিতে পারেন না। কিন্তু তিনি বেশ লক্ষ্য করিতেছেন যে, বধূমাতার আর পূর্ব্বের মত কান্তি নাই, তেমন সোণার বরণ দেহ মলিন হইয়া যাইতেছে, শোভার আধার মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দেহ কৃশ, পূর্ব্বের মত কাজ করিবার ক্ষমতাও যেন দিন দিন লোপ পাইতেছে। এ সব দেখিয়া বৃদ্ধা বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহাদের প্রতিবাসী কন্যা চিত্রলেখার সহিত দেবীর বড় ভালবাসা, তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন, ভাবিলেন এ অবস্থায় সমবয়সী সখীর নিকট বসিয়া যদি মনোবেদনা হ্রাস করিতে পারে। কিন্তু মা ভুল বুঝিলেন, যাহার নিকট সহানুভূতি পাওয়া যায় তাহার নিকট প্রাণের বেদনা জানাইয়া হৃদয়ের রুদ্ধ অশ্রু খরবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তৃপ্ত হয় না। সখীকে প্রাণনাথের কথা তুলিতে দেখিয়া দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সখীর বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। চিত্রলেখা বুঝিলেন—এ দুরারোগ্য ব্যাধির

অন্য ঔষধ নাই ; তাই বসিয়া সখীকে গৌরগুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। বলিলেন সখী তুমি ত অবোধ বালিকা নহ, ধৈর্য্য ধারণ কর, পতি কাহার না বিদেশে যায়? তিনি যখন ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত গিয়াছেন, সত্বরই ফিরিয়া আসিবেন ; ভাবিয়া ভাবিয়া তোমার অমন সোণার অঙ্গ কালি করিতেছ কেন? নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া দেখ দেখি কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। দেবী সমস্তই শুনিলেন সমস্তই বুঝিলেন, কিন্তু স্থির হইতে পারিলেন না। এই বিষম বিরহ ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন না, দিন দিন আরও কৃশ হইয়া যাইতে লাগিলেন। আহারে রুচি নাই, রাত্রে নিদ্রা হয় না, শরীরও বুঝি আর বহেনা। ওঃ সে কি দুঃসহ বিরহ। ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে, অতি সত্য। শ্রীগৌরকে যে যে ভাল বাসিয়াছিল তাহাদিগকে এইরূপ বিরহ বেদনাই সহ্য করিতে হইয়াছিল। এইরূপ শত শত ভক্তের চিত্র বৈষ্ণবকবিগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের শত শত গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের সেই গ্রন্থাবলী আজ ভক্তের চক্ষে—জগতের চক্ষে, বিশ্বসাহিত্যের রাজ্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

বালিকা লক্ষ্মী তাহার এই অল্প বয়সে স্বামীকে অনন্ত নির্ভরে কি ভালই না বাসিয়াছিল। সেই স্বামী আজ কতদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বালিকা যে তাহাকে একবার দেখিতেও পায় না। সমগ্র দেহ মথিত করিয়া দুঃখের স্রোত উথলিয়া উঠিতেছে। যখন একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে তখন তাড়াতাড়ি গিয়া স্বামীর প্রদত্ত সেই ছিন্ন পৈতা ও পরিত্যক্ত কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়কে সাদরে বক্ষে ধারণ করেন। স্বামীর পদরজ দ্বারা ললাটে তিলক রচনা করেন। বক্ষের স্পন্দন অনেকটা থামিয়া যায়, বক্ষের গুরুভার অনেকটা নামিয়া যায়, হৃদয় যেন বাঞ্ছিতের পরশে কিয়ৎক্ষণের জন্য শীতল হইয়া পড়ে।

অতিকষ্টে এক একটী দিন এইরূপে কাটাইয়া ক্রমে চারিমাস অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ এখনও ফিরিলেন না। দেবী যেন আর সহ্য করিতে পারেন না। হৃদয় যেন তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, স্বামী তাঁহাকে তাঁহার বৃদ্ধা জননীর সেবার ভার দিয়া গিয়াছেন তাই স্বামীর আদেশ জানিয়া শ্বাশুড়ীকে সেবা করিবার সময় দেবীর হৃদয়ে যেন কোথা হইতে বল আইসে ; প্রাণনাথের আদেশ ভাবিয়া প্রাণটী তাহার নাচিয়া উঠে। কিন্তু সে ক্ষণিক উত্তেজনা ক্ষণিকেই নিভিয়া যায়। তাহার পর—তাহার পর যে আঁধার সেই আঁধারে হৃদয় ডুবিয়া যায়। চক্ষুর সমীপে কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়া যায়। হৃদয়

যেন সমস্ত হারাইয়া ফেলে। সে যে কি নিস্তব্ধ অব্যক্ত যন্ত্রণা তাহা বর্ণনাতীত।

শচীমা আর তাহার মুখের পানে চাহিতে পারেন না। দেখিতেছেন যেন বারিহীন নিদাঘের নির্দয় তাড়নায় স্বর্ণলতিকা অকালে শুকাইয়া যাইতেছে, সুষমায় ভরা স্নিগ্ধ কুসুমটা যেন ফুটিবার পূর্ব্বে মুকুলেই ঝরিয়া পড়িতে বসিয়াছে, শ্রান্তিহারিণী কলনাদিনী তটিনী যেন অকস্মাৎ মরুপ্রান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ধারা হারাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। কি শোচনীয় সে দৃশ্য। শচীমা ভাবিতেছেন তাহার নাকি নিতান্ত পাষাণ প্রাণ তাই এ দৃশ্য দেখিয়া আজও তিনি প্রাণ ধরিয়া বসিয়া আছেন। বিরহের পূর্ণবেদনা বক্ষে বহিয়া কে ঐ বিষাদ প্রতিমা? অহো! চক্ষু অন্ধ হও এ দৃশ্য যে আর দেখা যায় না। বধূর এ দুর্নিবার বেদনার দৃশ্যে শচী আপন বেদনা ভুলিয়াছেন। এখন ভাবনা বধূটীকে তাঁহার কিরূপে বাঁচাইয়া রাখিবেন। বালিকার এ অকূল বিরহ পাথার কিরূপে উত্তীর্ণ করাইয়া দিবেন। অহো! বধূমাতাটী কি তাহার বাঁচিবে না। হায়! হায়! একথা স্মরণ করিতেও যে তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে।

বৃদ্ধা শচী আবার ভাবিতেছেন হয়তঃ বা তাহার অন্য কোনরূপ ব্যাধি হইবে, তবে যাই না কেন একবার মুরারিকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাই। নিমাইত তাহাকেও আমাদের দেখিবার ভার দিয়া গিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত বড় ভাল বৈদ্য। একথাটী মনে হওয়ায় শচী যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মুরারির নিকট গিয়া বলিলেন, বাপ মুরারি! নিমাই আমার যে অবধি বিদেশে গিয়াছে বধূমাতা আমার যে সেই অবধি একেবারে শুকাইয়া যাইতেছে। একবার দেখিয়া তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিবি আয় বাপ। মুরারি বুঝিলেন যে দেবীর অসুখটা কি, মুরারি বলিলেন—আমি তাঁহার অসুখ ধরিতে পারিয়াছি মা, আমাকে আর যাইতে হইবে না। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি, ইহা সেবন করাইলে তিনি আরোগ্য হইয়া যাইবেন। শচীমা কিন্তু শুনিলেন না—মুরারির হাতটী ধরিয়া তাহাকে একেবারে বাড়ীতে টানিয়া আনিলেন, মুরারি আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া সেই বিষাদিনী দেবীপ্রতিমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। হায়! হায়! একি অবস্থা হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন দেবীকে এ যাত্রা বোধ করি—ফিরাইতে পারা যাইবে না। তিনি উদ্গত অশ্রু অতি কষ্টে লুকাইয়া বলিলেন, মা আমি বাড়ী গিয়া ব্যবস্থামত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি তাহা সেবন করিলেই রোগ

আরোগ্য হইয়া যাইবে, আপনি কিছুমাত্র ভাবিত হইবেন না। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আর অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না। হায়! হায়! স্বর্ণপ্রতিমা বালিকার এ কি শোচনীয় পরিণাম। তিনি বাড়ী গিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও জননীকে যাহা দেখিয়া আসিলেন সমস্তই বুঝাইয়া বলিলেন। এ রোগের যে অন্য ঔষধ নাই তাহা তিনি বুঝিলেন। তত্রাচ শচীমাকে তিনি প্রবোধ দিবার জন্য কয়েকটা বটীকা নারায়ণের চরণ তুলসীর রসের অনুপানসহ খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আর তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন তোমরা অবসর মত তাহাদের নিকট যাইয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিবে যেন গোরাচাঁদের বিরহ দুঃখ হইতে তাহারা সুস্থ হইতে পারে।

নারায়ণের চরণ তুলসী যে ঔষধের অনুপান, লক্ষ্মীদেবী সে ঔষধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই অচল নারায়ণ-চরণ-সংযুক্ত তুলসীদল তাঁহার সচল নারায়ণের ভাবনা ভার হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিতে পারিল কি? তাহা পারিল না।

দিবসের পর রাত্র আবার দিন তাহার পর সপ্তাহ, ক্রমে পক্ষ মাস, এইরূপে মাসের পর মাস চলিয়া গিয়া ক্রমে ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া গেল; তত্রাচ গৌর ফিরিলেন না। সখী চিত্রলেখা আর কত প্রবোধ দিবে। শচীমা, মালিনী দেবী প্রভৃতি বৃদ্ধারা আর কত বুঝাইবেন। দেবীর দেহ প্রতিদিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, মুখখানি কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায়ই দিন দিন ম্লান হইয়া যাইতেছে, বুঝি চির আঁধারে ঘেরিবার আর দেরী নাই।

এদিকে নিমাইচাঁদ বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পদ্মাবতীর ধারে ধারে চলিয়াছেন। নানাগ্রাম নানাবিধ নরনারী। যে গ্রামে তিনি পদার্পন করিতেছেন, গ্রামবাসিগণ সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছেন, সে গ্রামে যেন রোগ শোক বিদায় লইয়া দূরে পলাইয়া যাইতেছে। বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। নানাগ্রাম জনপদ প্রান্তর পার হইয়া তাঁহারা পণ্ডিত প্রধান বিক্রমপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই নিমাই পণ্ডিতের যশ সেই সব স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নিমাই পণ্ডিত দেশে, থাকিয়া ব্যাকরণের যে একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ তাহা সাদরে পাঠ করিয়া থাকে। এই বঙ্গদেশবাসী তপন মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণ দর্শনে পবিত্র হইয়া দেশ ত্যাগপূর্ব্বক কাশীধামে গিয়া বাস করিয়াছিল। তাঁহারই পুত্র রঘুনাথ ভট্ট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিমাইর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ও পিতামহী শোভাদেবী, তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট ঢাকা দক্ষিণগ্রামে তখনও জীবিত আছেন। নিমাই যখন তাঁহার মাতার গর্ভে তখন শচী দেবী তাঁহার শাশুড়ীর নিকট হইতে নবদ্বীপে চলিয়া আসিবার সময় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে গর্ভস্থ সন্তানকে একবার তাঁহাদিগকে দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু নানা কারণে শচী দেবী সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এক্ষণে মাতার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া নিমাই আপন লোকজনসহ শ্রীহট্টের পথ ধরিলেন। পিতামহ ভবনে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র তখন বাহিরের মণ্ডপে বসিয়া পুঁথি আকারের তালপত্রে চণ্ডীর প্রথম শ্লোকটী লিখিতেছেন। নিমাই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বীয় পরিচয় দিলে বৃদ্ধ অতি আনন্দে উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর তাড়াতাড়ি অন্দরে প্রবেশ করিয়া শোভা দেবীকে জানাইলেন যে এতদিন পরে তাঁহাদের সেই আদরের নাতিটি তাহাদিগকে দর্শন দিতে আসিয়াছে। শোভা দেবী বলিলেন সে যে আসিবে তাহা আমি গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম এবং আরও বুঝিয়াছি যে, সে নারায়ণের অবতার। উপেন্দ্রমিশ্র এ কথা বিশ্বাস করিলেন। নিমাইর আকৃতি দেখিয়া ঠিক এই কথাটাই যে মনে জাগিতেছিল। নিমাইকে তিনি যেখানে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন সেইখানে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন তালপত্রে তিনি চণ্ডীর প্রথম শ্লোকটীমাত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন এক্ষণে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি দৃঢ়রূপেই বুঝিলেন "নিমাই নারায়ণ।"

নিমাইর হাতটী ধরিয়া তিনি বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। শোভা দেবী তাঁহার মুখখানি দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। আহা! কি সুন্দর মুখ। গায়ের রং যেন চাঁপাফুলের মত। আদর করিয়া তাঁহাকে কাছে করিয়া লইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন।

শোভা দেবী বলিতেছেন,—ভাই যদি কষ্ট করিয়া এতদূরে বুড়িকে দেখা দিতে আসিলে তবে তোমার প্রকৃতরূপ একবার দেখাও।

নিমাই তাহার সেই অতিবৃদ্ধা পিতামহীর কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয়দেহে বৃদ্ধার ঈপ্সিত কৃষ্ণরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। বৃদ্ধা বড়ই চতুরা, বলিলেন—ভাই তুমি ত আর চিরদিন আমার নিকট থাকিবে না, তুমি চলিয়া গেলে তোমার রসরাজমূর্ত্তি ত আর ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইব না।

আমাকে একটী মূর্ত্তি দাও আমি তাহার পূজা করিব। নিমাই তাঁহাকে একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি দিলেন। তাহাতে শোভাদেবী বলিলেন না ভাই, শুধু এই মূর্ত্তি দিলে চলিবে না, আমি তোমার ঐ মূর্ত্তিরই পক্ষপাতী। নিমাই কি করিবেন তাঁহাকে একটী কালগৌরাঙ্গমূর্ত্তি আনিয়া দিয়া বলিলেন, ঠাকুর মা, আপনি উভয় মূর্ত্তিই আপনার নিকট রাখিয়া দিন, ইহা হইতেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তদবধি শ্রীহট্টে মিশ্রবংশে সাড়ম্বরে সেই যুগলমূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় এ স্থানেও রথের সময় মহাধুম হইয়া থাকে। মোট কথা মিশ্র-ভবনে এই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরের মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত "অভেদ-পরমাত্মনি"রূপে সাদরে পূজিত হইয়া আসিতেছে। গৌর-ভক্তগণের ইহা একটী দেখিবার জিনিস।

বৃদ্ধ-দম্পতি নিমাইকে দেখিবার পর আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। যেন তাঁহাদের সেই অভিলষিত মূর্ত্তিটী একবার দেখিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

চলুন পাঠক! আমরা একবার নদীয়ার মিশ্র-পুরন্দর ভবনে ফিরিয়া যাইয়া সেই অকাল-নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ বালিকা রত্নটীর সন্ধান লই। লক্ষ্মী-দেবীকে এখন আর দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। দেবীর অঙ্গের সে লাবণ্য-স্মৃতি আর নাই। শীর্ণ, ক্ষীণ বিবশা—দেবী শয্যাগতা। অকাল-জলদোদয়ে জ্যোতিহীন চন্দ্রমার ন্যায় আজ পরিম্লান। বুঝি সে শ্রান্ত দেহ জীবন-ভারবহনে অক্ষম। শচীমা এ সমস্ত দেখিয়া কপালে করাঘাত করিতেছেন। হায়! হায়! বউমা কি তবে তাহার বাঁচিবে না? তাহার নয়নপুতুলি নিমাই ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব। লক্ষ্মীদেবীর শয্যাপাশে শচী এখন আর একা নাই, মালিনী প্রভৃতি দুই একটী বয়োধিকা রমণী এখন সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। সখী চিত্রলেখা একদণ্ডও দেবীর কাছছাড়া হন না। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সকলেই যেন মূহ্যমান।

এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল, নিজজন-নিঠুর নিমাই এখনও ফিরিয়া আসিলেন না। লক্ষ্মীদেবীর আর দিন কাটে না। এখন তাহার বাসনা এ দেহ-কারা ভগ্ন করিয়া মুক্ত বিহঙ্গীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া প্রাণনাথ কোথায় আছেন তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়া আসেন। যেন সেই প্রিয়তমের কমনীয় অঙ্গ বেড়িয়া এই তৃষিত—ক্ষুধিত আত্মা চিরতরে সমাধি মগ্ন হইয়া পড়ে, দেবীর এমন যে ইহাই সর্ব্বদা কামনা।

দেবীর এইরূপ নিদারুণ দুঃখের দিনে একদা এক কালসর্প আসিয়া তাহার দক্ষিণপদাঙ্গুষ্ঠে দংশন করিল। অনেকেই তাঁহার নিকট শয়ন করিয়াছিলেন, কেহই দেখিতে পাইলেন না কিরূপে সেই ক্রুরসর্প আসিয়া তাঁহাকে দংশন করিয়া গেল। বিষের জ্বালায় কাতরা দেবী শচীকে উঠাইয়া বলিতেছেন, মা! মা! জ্বলে গেলুম আমাকে কালসর্পে দংশন করিয়াছে। এমন দিনে এ সর্ব্বনাশে সকলেই কেমন কাতর হইলেন বুঝিতে পারিতেছেন। সকলেই শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কত মাল-বৈদ্য আসিল, কত ঝাড়া হইল, চেষ্টার ক্রটী হইল না। কিন্তু সেই কালসর্পের বিষ কিছুতেই নামিল না। দেবী আপন আসন্ন কাল বুঝিয়া সকলকেই এ ব্যর্থ প্রয়াস হইতে বিরত হইতে বলিলেন। সখী চিত্রলেখার গলাটি জড়াইয়া বলিলেন, সখী এ সময় অনর্থক কাঁদিয়া কি করিবে, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহাই কর। আমার স্বামীর প্রদত্ত সেই পৈতা ও পাদুকা আনিয়া আমার বক্ষে দাও, সেই পদরজ আনিয়া আমার অঙ্গে মাখাইয়া দাও। দেবীর পিতামাতা এবং শ্রীবাস প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন সকলেই আসিয়াছিলেন। সকলেই ক্রন্দন করিতেছিলেন। দেবী তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, এ সময় আর গৃহমধ্যে থাকিতে আমি ইচ্ছা করি না। আমাকে গৃহের বাহির করুন। তাহাই করা হইল, নিমাইর সেই খড়মজোড়াটি দেবী বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। দেবী হরিনাম ভালবাসিতেন, তাই সকলে মিলিয়া দেবীর ইচ্ছায় তাঁহাকে হরিনাম-কীর্ত্তন-সুধা পান করাইতেছেন।

দেবীর ক্রমে শেষ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দৃশ্য যে আর দেখা যায় না। সকলেই এক নিদারুণ বেদনায় মুহ্যমান। তাহার উপর শচীকে লইয়া সকলেই বিব্রত। শচী যে পাগলিনীর মত হইয়াছেন। কখন ছুটিয়া গিয়া মৃতাবধূর গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইয়া দিতেছেন, কখনও বা তাহার চাঁদ মুখখানিতে চুম্বন দিয়া তাহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, আবার কখনও বা তাহার বক্ষে মাথা রাখিয়া আর উঠিতেছেন না। কাজেই শচীকে লইয়া মহা বিব্রত। ইহার মধ্যে অতি কষ্টে শেষকার্য্য সমাধা করিয়া সকলে গৃহে ফিরিলেন। নদীয়ার এই মিশ্রগৃহের নিদারুণ শোক-দৃশ্যে সমগ্র বিশ্ব যেন হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

বৈষ্ণব কবিগণ বলেন দেবীর প্রার্থনায় তাঁহার গৌরাঙ্গ-বিরহই সর্পাকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিরহ যাতনা হইতে মুক্ত করিয়াছিল। যাহাই হউক, দেবীর

এই বিরহ নিধ্যাতন তিথি ভক্তগণের বক্ষে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিল।

শচীমা গৃহে প্রবেশ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। ভূমিতে অঙ্গ আছাড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। গৃহস্থ পশু-পক্ষীগুলিও যেন নীরব ভাষায় তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। শচী একে বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাহার উপর এই নিদারুণ শোক। যে বধূমাতা তাহাকে সর্ব্বদা সেবা করিত, আদরিণী কন্যার ন্যায় মিষ্টমুখে মা বলিয়া সর্ব্বদা কাছে থাকিত, সেই বৌমা আর নাই; শত চেষ্টাতেও আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। এই বধূ-হীন নির্জ্জন—নিস্তব্ধ অন্ধকারপূর্ণ গৃহ, যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। হায়রে নিষ্ঠুর সর্প সেই সোণার অঙ্গে আঘাত না করিয়া আমাকে খাইলি না কেন? শচী এইরূপে কাঁদিতেছেন আর তাহার বধূমাতার গুণগুলি একটী একটী করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছেন। দুঃখ অপার অনন্ত, সে শোক অতল স্পর্শী গভীর। যে বধূমাতার মুখ চাহিয়া তিনি পুত্র-বিরহ সহ্য করিয়াছিলেন—সেই লক্ষ্মী বধূ আর নাই। এখন এই শোকের উপর পুত্র-বিরহও দ্বিগুণ হইল, তাহার উপর অভিমানও হইল, হায় নিষ্ঠুর পুত্র এ সময় তুমি কোথায়।

এই শোকে দুঃখে অতিবাহিত দীর্ঘ দিবসের পর একদিন শচী মা শ্রীবাসের মুখে শুনিলেন তাঁহার সেই প্রবাসী পুত্র, কাঙ্গালের সোণা—হারাণ রত্ন ফিরিয়া আসিতেছে। নিমাই আর অধিক দূরের পথে নাই।

এ সংবাদে শচী যেন প্রাণে বাঁচিয়া গেল। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেন অবলম্বনীয় কিছু পাইল। তাহার নিরাশাহত ব্যথিত প্রাণে যেন আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। আর সেই সর্পের ন্যায় হৃদয় শোষণকারী গভীর রুদ্ধ শোক যেন এই আনন্দের ঈষৎ উত্তেজনায় আহত হইয়া ভিতরে ভিতরে গর্জ্জিয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঈশ্বর-তত্ত্ব। (৩)

লেখক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল্।

অবয়ব-তত্ত্ব—এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে 'এক', এই যে মূলতত্ত্ব ইঁহার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ আছে কি না?

শ্রুতি বলেন "অপানিপাদঃ জবনো গৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ, শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি—অর্থাৎ হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পদ নাই অথচ চলিতে পারেন, কর্ণ নাই শুনিতে পান, চক্ষু নাই অথচ দেখিতে পান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন দুইই সত্য, হস্ত নাই সত্য—কেন না হস্ত-সৃষ্টির পূর্ব্বেও ভগবান ছিলেন; সুতরাং সৃষ্টহস্ত তাঁহার নয়। তাঁহার হস্ত তাঁহারই হস্ত, তাহা অসৃষ্ট, সুতরাং অপ্রাকৃত, আমাদের হস্তের স্থায় প্রাকৃত বা প্রকৃতির অন্তর্গত নয়। তাঁহার, চরণ, নয়ন, শ্রবণাদিও ঐরূপ।

আমরা যেমন হস্তদ্বারা গ্রহণ করি, চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, তিনিও সেইরূপ করেন। ক্রিয়া আছে করণ নাই—হইতে পারে না। নিষ্ক্রিয়ের করণ না থাকিতে পারে; কিন্তু শৃণোতি, পশ্যতি, গৃহ্নাতি, চলতি; অথচ শ্রবণ-দর্শন-গ্রহণ গমনের যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় নাই—এরূপ হয় না। সামঞ্জস্য এই যে ঐ সকল সৃষ্ট বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নয়, অপ্রাকৃত।

যুক্তি দ্বারাও দেখা যায় জগতের যাবতীয় প্রাণীর হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ আছে, বৃক্ষাদিরও আছে। তবে, যাহা হইতে ঐ সকল প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে না থাকিবে কেন? ফলে যাহা আছে, বীজেও তাহা ছিল; কার্য্যে যাহা আছে, কারণেও তাহা অবশ্যই আছে।

আবার যখন তিনি অবতার স্বীকার করিয়া নরাকৃতি ধারণ করেন, তখন তাহাতে হস্তপদাদি স্বভাবতঃই থাকে। সুতরাং ঈশ্বরের হস্তপদাদির আকৃতি নাই বলিলে খুব যে একটা বাহাদুরী হয় তাহা নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন যে, শ্রুতির একাংশ গ্রহণ করিয়া অপরাংশ বর্জ্জন করিলে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারা যায় না। যদি কেবল 'অপানি' স্বীকার কর, তাহা হইলে 'গৃহ্নাতি' পরিহার করিতে হয়। যদি কেবল 'গৃহ্নাতি' ধরা যায়, তাহা হইলে 'অপানি' অবজ্ঞা করিতে হয়। উভয়ের সম্মিলনে ও সামঞ্জস্যে সত্য অবশ্যই নিহিত আছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বেদে নির্বিশেষের বচন অপেক্ষা সবিশেষের সূত্র অধিক, সুতরাং 'সবিশেষ'ই শ্রুতির প্রধান লক্ষ্য।

তারপর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ভগবানের আকৃতি সুন্দর কি কদর্য্য, মনোহর কি কুৎসিত, রমণীয় কি ভীষণ, বিষাদজনক কি আনন্দময়?

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভয় বীভৎসাদি যাবতীয় রসের যিনি আধার, তাঁহার আকৃতিতে সকল রসেরই ভাব আছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য দার্শনিকগণ প্রথমে বলেন যে—'একে একই আছে, দুই নাই, কিন্তু দুইএ একও আছে আবার দুইও আছে, কিন্তু তিন নাই;

তিনে, এক, দুই ও তিন আছে, কিন্তু চারি নাই ইত্যাদি। আরও বলেন ব্যোমে ব্যোমই আছে মরুৎ নাই, কিন্তু মরুতে ব্যোমও আছে, মরুৎও আছে, তেজ নাই, তেজে ব্যোম, মরুৎ ও তেজ আছে কিন্তু অপ্ নাই। এইরূপে ক্ষিতিতে পঞ্চভূত সকলই আছে।

সেইরূপ হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, করুণ প্রভৃতি নানারস এক 'আদিতে সমস্তই বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ভগবান আদিরসের মূর্ত্তি বলিলেই সর্ব্বরসাকর বলা হইল। অতএব তিনি সুন্দর আদিরস সুন্দরেরই পরিচায়ক। তিনি সুন্দর, তিনি আনন্দময়, তিনি নিখিল মঙ্গল নিলয়, তিনি সত্যের নিবাসস্থল। "সত্যং শিব সুন্দর হরি রূপ অনুপম গুণ অগণন।"

দধি-মন্থন।

লেখক—শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ বসু।

এ মায়াময় সংসারে আসিয়া কেবল বিষয়ে মিশিয়া থাকা মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। বিষয় লালসার তৃপ্তি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে, বিষয় হইতে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক মায়াময় বিষয়ের অতীত পুরুষ যিনি তাঁহার তত্ত্ব অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করাই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অশিতি লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তে যে দয়াময়ের কৃপায় এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে—রিপুর বশে মোহের পাশে ও মায়ার কুহকে পড়িয়া সেই দয়াময় ভগবানের তত্ত্ব বিস্মরণ হইয়া বহু পুণ্য সঞ্চিত এই মনুষ্যজন্ম নষ্ট করা কদাচই উচিত নহে। মনুষ্যের মনুষ্যোচিত কর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহার অন্যথা হইলেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ হইয়া যায়। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ হইলেই, মনুষ্যে ও মনুষ্যেতর প্রাণিতে কিছুই প্রভেদ থাকে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান বিহীন মনুষ্য পশুর সমান। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন পশুরও যেমন নরেরও সেইরূপ। কিন্তু নরদেহে জ্ঞান বলে, ভগবৎ প্রাপ্তি হয় বলিয়াই নরের শ্রেষ্ঠতা। যে জ্ঞান বলে মানব শ্রেষ্ঠ হয়; মানবজন্ম লাভ করিয়া সেই জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইলেই মনুষ্যের মনুষ্যজন্ম যে বৃথা হয় তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত বিষয় ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অন্তত কিঞ্চিৎ সময়ও ভগবানের লীলা গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনে মনকে নিয়োগ

করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। অথবা মনকে একেবারে ভগবৎ পাদপদ্মে ব্যাপৃত রাখিয়া নির্লিপ্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করাও কোন অংশে আবশ্যেয় নহে।

মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বশে আনিতে পারিলেই অতি সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু মনকে বশে আনা দূরে থাকুক, আমরা মনকে ধরিতে পাই না দেখিতে পাই না, বা মন যে কোথায় আছে তাহার অনুসন্ধানও পাই না। সুতরাং কেহ কেহ বলিতে পারেন এরূপ অস্থির পদার্থকে একেবারে বশে আনিবার উপায় কি? প্রকৃত উপায় ভগবানের কৃপায় সৎসঙ্গ লাভে যাঁহারা মনকে বশে আনিয়া কৃতার্থ লাভ করিয়াছেন, তাহারাই বলিতে পারেন, অন্যের বলিবার শক্তি আছে কি না বলিতে পারি না। তবে ভগবানের লীলা-রহস্য আলোচনা ও যুক্তি দ্বারা এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, বিষয়-রসে মিশ্রিত মনকে মন্থন করিয়া ধারণ ও বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। এ বিষয়ে যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক, মনঃসংযোগ না করিলে সে কার্য্য হইতেই পারে না। মন হইল কার্য্য সাধনের প্রধান উপাদান। প্রথমতঃ মনকে স্থির করিয়া পরে কার্য্যে নিয়োগ করিতে হয়। ভগবত্তত্ত্ব সাধন করিতে হইলেও প্রথমে মনকে সুস্থির করিয়া পরে ভগবত্তত্ত্ব সাধনে নিযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্ব সাধনের নিমিত্ত মনকে সুস্থির করিবার পূর্ব্বে অন্বেষণ করিয়া বাহির ও ধারণ করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই আয়াসের নামই সাধন-ভজন। সাধন ভজন দ্বারা অতিশয় চঞ্চল মনকে সুস্থির করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে একবার লাগাইতে পারিলেই অবলীলাক্রমে মনুষ্যোচিত কার্য্য সাধন হইতে পারে। কিন্তু মন আমাদের কোথায়? মন কোথায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, মন খণ্ড বিখণ্ড ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া দারা, পুত্র গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি মায়িক বিষয়ের চিন্তায় এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। দুগ্ধে যেরূপ ভাবে নবনীত থাকে আমাদের মনও বিষয়-রসে ঠিক সেইরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই বিষয়-রস হইতে মনকে উদ্ধার করিতে হইলে, মন্থন দ্বারা দধি বা ঘোল হইতে যেরূপ নবনীত উত্তোলন করিতে হয়, সেইরূপ বিষয় রস মন্থন করিয়া ঐ মনকে নবনীতের ন্যায় তুলিয়া লইতে হয়।

প্রথমতঃ দুগ্ধ গরম করিয়া ঈষৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তাহাতে সাজা দিয়া দধি পাতিতে হয়। বিষয় রসকেও ব্যাকুলতাব তাপে গরম করিয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে ভাবের সাজা দিয়া দধি করিয়া লইতে হয়। হৃদয়-ভাণ্ডে ভাবের সাজায় দধি বেশ বসিলে পর একাগ্রতা-দণ্ড দৃঢ় বিশ্বাসের খুটিতে বিবেক আর বৈরাগ্যের রজ্জুতে বন্ধন করিয়া ভক্তির আকর্ষণী দুই হস্তে ধারণ করতঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিত বলিতে কৃষ্ণকেই লক্ষ্য রাখিয়া মন্থন দণ্ডকে ঘুরাইতে হয়। অর্থাৎ মনরূপ নবনীত তুলিবা শ্রীকৃষ্ণকেই অর্পণ করিব এইটি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া অনন্য চিত্তে ও পবিত্র ভাবে ভগবানের লীলাগুণ গান করিতে করিতে বিষয় র.কে মন্থন করিতে হয়। মন্থন করিতে করিতে যদি একবার মনকে বিষয় রস হইতে তুলিতে পারা যায় তাহা হইলে ভগবান আপনিই আসিয়া সেই উদ্ধৃত মনকে গ্রহণ করেন, অর্পণ বা নিবেদন করিবাব অপেক্ষাও করেন না। ইহার প্রমাণ শ্রীভগবানের ব্রজলীলায় মা যশোদার দধি-মন্থন ও শ্রীকৃষ্ণের নবনীত ভোজন।

বিষয়াসক্ত মনকে, শ্রীগোবিন্দ গোপালের পাদপদ্মে অনুরক্ত রাখিবার মানসে ঐরূপ ভাবে উদ্ধার করিয়া লইতে পারিলেই মনের জন্য আর কোন চিন্তা বা আযাস করিতে হয় না। নবনীতরূপী মন তখন জলেই পড়ুক, আর আঁধারেই থাকুক, কিম্বা উদ্ধেই উঠুক, অথবা গোপনেই থাকুক, সে মন কেবল ভগবান ব্যতীত আর কাহারও গ্রাহ্য নহে। ভগবান সেই মনকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া গ্রহণ করিবেন। মনকে তখন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার নিমিত্ত খুঁজিতে বা আহ্বান করিতে হইবে না; তিনি অন্তরে থাকিলেও অন্তর্য্যামীরূপে অন্তরাল হইতেই মনকে হরণ করিয়া লন। এই জন্যই তাঁহাকে ননীচোরা, মাখমচোরা ও মনচোরা বলে। ইহার প্রমাণ ব্রজলীলাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।—একদিন কতিপয় গোপরমণী কৃষ্ণদর্শনচ্ছলে মা যশোদাব নিকট আগমন করিয়া কৃষ্ণের ননীচুরি সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া বলিল—"মা! অতি নিভৃত স্থানে নবনীত রক্ষা করিলেও তোমার গোপাল তাহা চুরি করিয়া লয় এবং পাত্রাদি ভগ্ন করিয়া দেয়।" শ্রীকৃষ্ণের পাত্রাদি ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্য এই বুঝিতে হইবে যে, তিনি যেন ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে, তোমাদের মনরূপ নবনীত আমি স্বয়ং যখন অপহরণ করিলাম, তখন তোমাদের মন আমারই হইল—অতএব তোমাদের আর ভাণ্ড বা পাত্রের আবশ্যক কি? অথবা পাত্রাদি ছিদ্র করিয়া দিয়া তিনি জগজ্জীবকে দেখাইয়াছেন যে, যে পাত্র বা ভাণ্ডাদি হইতে আমি আমার নিমিত্ত সঞ্চিত অতি পবিত্র প্রেমামৃত অতি আগ্রহের সহিত একবার গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করি, সেই পাত্রে

বা ভাণ্ডে ভবিষ্যতে কখনও কোনরূপ কটু, তিক্ত ও কষায়াদি অতি অপবিত্র বিষয় রস যেন আর স্থান না পায়।

অতএব মনকে অন্য কার্য্যে প্রশ্রয় না দিয়া সদা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ ভাবে ভাবিত রাখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। মন এমনই জিনিস যে, যখন যাহাতে মজে, তখন তাহা হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বিষয়-রস পাইলে আর রক্ষা নাই। নিজেও মজে আর মালিককেও মজায়। কিন্তু যদি এই মনকে বিষয় বাসনা হইতে একবার মন্থন করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে তখন সে আর ঘোলরূপী বিষয়-বাসনায় অথবা জলরূপী মায়ার সহিত মিশ্রিত হয় না। মন বিষয় বা মায়াকে ছাড়িয়া উঠিলেই ভগবান তাহাকে গ্রহণ করেন। তখন ভগবানের সঙ্গে মনের এমন একটী মিশামিশি ভাব দাঁড়াইয়া যায় যে, মনও ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, আর ভগবানও মনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীমতী রাধিকা মানভঞ্জন লীলায় দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মন যখন যাহাতে মজে তাহাতেই একেবারে মিশিয়া থাকে। যখন বিষয়ে মজিয়া থাকে, তখন বিষয়াতীত সদ্বিষয়ের চিন্তাকে হৃদয়ে আনিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেও বিষয় চিন্তা ব্যতীত সৎচিন্তা কিছুতেই আসে না। আবার বিষয়াতীত সৎবিষয়ে মন মজিয়া থাকিলে কোনরূপ বিষয় চিন্তাকে হৃদয়ে আনিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেও সৎচিন্তা ব্যতীত অসৎচিন্তা কিছুতেই আসে না। এরূপ বাধ্য মনকে আমরা আপনদোষে, নশ্বর বিষয়ের চিন্তায় চিন্তিত থাকিতে দিয়া বিষয়াতীত অবিনশ্বর নিত্য ও সৎপদবাচ্য ভগবৎ তত্ত্বের চিন্তায় বঞ্চিত হইতেছি এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া, অকর্ত্তব্য কার্য্যে মনকে নিরন্তর নিযুক্ত রাখিয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল পান করিতেছি।

মন যদি নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় চিন্তিত থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে আর কোন বিষয়ের জন্যই চিন্তা করিতে হয় না। সেই জগৎ চিন্তামণিই আমাদের সকল চিন্তা ঘুচাইয়া দেন ও আমাদের চিন্তায় চিন্তিত থাকেন; একথা তিনি নিজমুখেই গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন। অতএব বিষয়-রসাসক্ত লোলুপ মনকে মন্থন দ্বারা উদ্ধার করিয়া ভগবানের সেবাদি কার্য্যে সতত নিযুক্ত রাখাই যে আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হাওড়া—১০৫নং থুরুট রোড, দি টিউটোরিয়াল প্রেস হইতে
ডি, সি, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ! মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও আপনাদিগের অনুগ্রহে শ্রীভক্তি পত্রিকা আজ অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করিল। আগামী মাস হইতে ১৯শ বর্ষে পদার্পণ করিবেন। এবার ভক্তি প্রকাশ করিতে অনেক গোলমাল ও বিপদ আপদ গিয়াছে, তাই দু'টো কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

গত চৈত্র মাসের ভক্তি বাহির করার পর আমরা ছাপাখানার পরিবর্ত্তন করি, নূতন ছাপাখানা হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিব এই প্রকার ধারণাই আমাদের ছিল. অবশ্য তজ্জন্য চেষ্টাও যথেষ্ট করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রেস ও প্রিণ্টার পরিবর্ত্তন জন্য নূতন করিয়া ঠিকানা বসন্ত হইতে হওয়ায় বহু বিলম্বে আপনাদিগের নিকট বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পত্রিকা পাঠান হইয়াছে। অদ্য শ্রাবণ মাসের পাঠাইলাম। অবশ্য এখন হইতে নির্দ্দিষ্ট সময় পত্রিকা প্রকাশের জন্য আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিতে ক্রটী করিব না।

তারপর যুদ্ধের দরুণ যেরূপ কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা চারি গুণ বেশী খরচ করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় কাগজ বা অন্যান্য দ্রব্য পাইতেছি না। তজ্জন্য বাধ্য হইয়া আমরা বৈশাখ মাস হইতে নানা রকম কাগজে ভক্তি ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছি, অবশ্য ইহাতেও আমাদের খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশী লাগিতেছে। তারপর আবার ছাপাখানার চার্জ্জও খুব বেশী হইয়াছে। এরূপক্ষেত্রে কাগজ পরিচালনা করা কতদূর ব্যয় সাপেক্ষ তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমরা যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভক্তিকে প্রকাশ করিতেছি। সকল পত্রিকারই মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, আমরা তাহা করিতে চাই না, কেবল আপনাদিগের উৎসাহ পাইলেই যথেষ্ট মনে করি। আশা করি, আপনারা নিজে নিজে যেমন ভক্তির গ্রাহক হইয়া সামান্য অর্থের বিনিময়ে একটী সাধু-কর্ম্মের সাহায্য করিতেছেন, সেইরূপ আপনাপন বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ২।৪ জন গ্রাহক করিয়া দিয়া যাহাতে ভক্তিখানি স্থায়ী হয়, তাহার জন্য সকলেই চেষ্টা করিবেন।

যাহাতে দীন ভক্তি-ভাণ্ডারের একটী পয়সাও অযথা ব্যয় না হয়, তাহার

চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যেরূপ দেশের অবস্থা তাহাতে নাটক, নভেল বা নানাপ্রকার গল্পগুজব ছাপাইতে পারিলে আমাদের প্রচারের জন্য ভাবিতে হইত না। পাঠকগণের এই ভীষণ কুরুচিপূর্ণ প্রবল ইচ্ছাস্রোতের মুখে এমন খাঁটি ধর্ম্মভাবময় পত্রিকা যে আপনারা এতদিন পর্য্যন্ত রাখিতে পারিয়াছেন, তাহার জন্যই আপনাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। আমরা আশা করি, আগামী বর্ষেও আপনারা ভক্তিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় 'াক 'দক ' ' 'ড়ে স্থান দানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

অন্যান্য বাবে আমরা ভাদ্র . .। .' কর নিকট ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া থাকি, এবাবে আমরা তাহা পাঠাইব না। কেন না, ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় ডাকঘর সমূহে নিয়ম হইয়াছে যে, অনরেজিষ্টারী কোনও ভিঃপিঃ গ্রহণ করা হইবে না, কাজেই ভক্তি একখণ্ড ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পূর্ব্বে গ্রাহকগণকে এক আনা বেশী দিলেই চলিত, এক্ষণে সেই স্থলে ৵০ তিন আনা বেশী দিতে হইবে, কিন্তু গ্রাহকগণ যদি মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে ঐ /০ এক আনাতেই হইবে। আমরা দুই দিকই দেখাইলাম। আপনারা দয়া করিয়া নিজ নিজ সাহায্য মণিঅর্ডারযোগে বা যাঁহার যেমন সুবিধা হইবে সেইভাবে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

পূর্ব্বে বহু মিনতি করিয়া সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও অনেকে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে পক্ষান্তরে দীনা ভক্তি ভাণ্ডারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন, আমরা সেই কারণেই এবার সময় থাকিতে সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইয়া রাখি যে, নিজ নিজ দেয় সাহায্য কৃপাপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিবেন। একান্তই যদি কেহ পাঠাইতে অসুবিধা বোধ করেন, তিনি আমাদিগকে জানাইবেন, আমরা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাঠাইব।

নূতন প্রেসের সাহায্যে আগামী ১৯শ বর্ষ অর্থাৎ ভাদ্র মাস হইতে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিয়া যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া যথাসময়ে পত্রিকা বাহির হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছি ও করিব। এক্ষণে আপনাদিগের কৃপা ও সহানুভূতিই আমাদের একমাত্র ভরসা। বর্ত্তমান ১৮শ বর্ষে অনেক গোলমাল হইয়াছে তজ্জন্য আপনারা পত্রিকা লওয়া বন্ধ না করিয়া একটু উৎসাহ দিতে থাকুন, দেখিবেন কিরূপ ভাবে পত্রিকার উন্নতি হয়।

আরও আনন্দের বিষয় যে, আগামী বর্ষ হইতে আমরা কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখকের সাহায্য পাইব বলিয়া আশা পাইয়াছি। তন্মধ্যে প্রভুপাদ

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কভূষণ, বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাদ্র মাস হইতে ইঁহাদের প্রবন্ধ ও কবিতাদি ভক্তির অঙ্গশোভা বর্দ্ধনে নিয়োজিত হইবে।

এক্ষণে আমাদিগের বিনীত নিবেদন—গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যার সাহায্য পাঠাইয়া এবং নিজ নিজ বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ২।৪ জন করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন। আপনারা সকলে অল্প অল্প সাহায্য করিলেও ভক্তি ভাণ্ডারের উন্নতি নিশ্চয় জানিবেন। অলমিতি।

বিনীত—ভক্তি সম্পাদক।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী। (৭)

(লেখক—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।)

প্রভু আশ্বিন মাসের প্রথমে পূর্ব্বদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, ফাল্গুনের শেষে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘ ছয়মাস কাল প্রবাস বাস ভক্তগণের পক্ষে ছয় যুগ বলিয়া মনে হইয়াছিল। শ্রীগৌর দেশে ফিরিতেছেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্তগণ, যাহারা তাঁহাকে একদণ্ড না দেখিয়া প্রাণে মরেন সেই ভক্তগণের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই। নিমাই ভগবান, প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিয়াছেন—জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য। কলির জীবের পরম সম্বল, সংকীর্ত্তন করিয়া, নাচিয়া গাহিয়া কিরূপে সহজে ভগবানকে লাভ করা যায় তাহাই দেখাইবার জন্য তাঁহার আগমন। ভক্তগণও তাই তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলেন,—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

এই ছয় মাসে নদীয়ার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই। এদিকে নবদ্বীপবাসিগণ নিমাই আসিতেছেন জানিয়া প্রেমানন্দে ভাসিল

উঠিলেন। গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপনা হইল। পথসকল নানাবিধ ধ্বজ-পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হইল। গৃহতোরণ পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত করা হইল।

লক্ষ্মীদেবী নাই, তাই এতদিন সকলেরই প্রাণে দুঃখ লাগিয়াছিল। আজ যেন কোথা হইতে প্রাণে আনন্দের বাণ ডাকিল। তাহাদের সর্ব্বস্ব ধন নিমাই চাঁদ ফিরিয়া আসিতেছেন। ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিল। সে আনন্দের চিত্র এইরূপ,—

ঠাকুর আইলা ঠাকুর আইলা পড়িল ঘোষণা।
চন্দনের ছড়া পথে দেই দিব্যাঙ্গনা॥
নানাচিত্রে বিরাজিত নগর চত্বর।
দ্বারে দ্বারে কলা রুইল গুবাক সুন্দর॥
সিন্দুর কজ্জল শঙ্খ চামর দর্পণ।
স্বস্তিক সিন্দুর দুর্ব্বা ধান্যাদি রোচন॥
দধি শঙ্খ জাতাঙ্কুর কুঙ্কুম কস্তুরি।
পূর্ণ ঘট চূত পল্লব সারি সারি॥
হংস শুক সারক ময়ুর সুনাদিত।
বসন্ত কোকিল গীত ভ্রমরের গীত॥
আবির চন্দন চুয়া ধূপ দীপ মধু।
গৌরচন্দ্র নিরখয়ে ঘরে কুল-বধূ॥
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ চামর জয়ধ্বনি,
উপাঙ্গ খামাক রুদ্র কাবিলাশ বেণু॥
সপ্ত স্বর সপ্ত মণ্ডল রবাব খমকে।
ডম্ফ বীণা ধুসরী বাজান সর্ব্বলোকে॥
বঙ্গ হৈতে নবদ্বীপে আইলা গৌরচন্দ্র।
আনন্দিত নবদ্বীপ গায় জয়ানন্দ॥

বহুদিন পরে শ্রীগৌর নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিলেন, সঙ্গে বহু দ্রব্য। ফিরিবার পথে বড় স্নেহ ও ভক্তি করিয়া বঙ্গদেশবাসিগণ তাঁহাকে বহু দ্রব্য উপহার দিয়াছেন। তাঁহারা এতদিন দূর হইতে নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া বুঝিলেন—তিনি কি বস্তু। সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে বুঝিল—তিনি নবদ্বীপ চন্দ্র—নদীয়ার অবতার। তিনি গৃহে ফিরিতেছেন দেখিয়া অনেকে অনেক দ্রব্য আনিয়া তাঁহার পূজা করিল। যথা শ্রীচৈতন্য

ভাগবতে,—
তবে প্রভু গৃহে আসিলেন হেন শুনি।
যাঁর যেন শক্তি সবে দিলা ধন আনি॥
সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে।
সভেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥
প্রভুও সবার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

আবার পূর্ব্বদেশবাসী বহু ছাত্র প্রভুর সহিত চলিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা নবদ্বীপে থাকিয়া প্রভুর নিকট পড়িবেন। শ্রীগৌর এইরূপে বহু দ্রব্য ও লোক-জন পরিবেষ্টিত হইয়া হাসিতে হাসিতে গঙ্গার তীরে অবতরণ করিলেন। পূর্ণ জনতায় গঙ্গার কূল পরিশোভিত। নদীয়াবাসী নিজজন সকলে তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছেন। এমন কি, নদীয়াবাসিনী কুলনারীবৃন্দও তাঁহাকে দেখিবার জন্য গঙ্গার ঘাটের শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন অপরাহ্ন, প্রভু আত্মীয়-স্বজন সকলকে একত্রে দেখিয়া মধুর ভাবে সকলের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। সেই শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাই, মুরারী প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়ভক্ত ও বয়স্যগণ তাঁহার দর্শন আশায় আজ আকুল আগ্রহে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রভু আমাদের বিনয়ের খনি, ভদ্রতার আদর্শ। সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যদিও নদীয়া-বাসীর প্রাণধন আজ বহুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়াছে, আনন্দের বিষয়ও বটে আর আনন্দিত যে না হইয়াছেন তাহাও নয় কিন্তু তথাপি সকলের মুখে সে রকম হাসি নাই। বহুদিন পরে তাহাদের বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইয়াও হৃদয় তেমন করিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে না। নিমাইচাঁদ সমস্তই দেখিলেন, তিনি সেই গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া মধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে অপূর্ব্ব হরি-সংকীর্ত্তনে সকলেরই চিত্ত-ব্যথা অনেকটা প্রশমিত হইল। সন্ধ্যাকালে সকলেই গৃহে আসিয়া পৌছিলেন।

শচীমা, মালিনী প্রভৃতি আত্মীয়া রমণীবৃন্দকে লইয়া মলিনবদনে ছলছলনেত্রে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। নিমাই বাড়ী আসিয়া সমস্ত দ্রব্য মাতার চরণ সমীপে রাখিলেন এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। মা কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া নিমাই মাতার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলেন- মুখখানি

বড়ই মলিন। শচীমা অতি কষ্টে সমস্ত দুঃখ বক্ষে চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুঃখের সপ্ত সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে কিন্তু চক্ষে জল নাই। শ্রীগৌর আবার একবার জননীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শচীমা মনে মনে পুত্রকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন কিন্তু একটী কথাও মুখে ফুটিতেছে না, কে যেন তাঁহার স্বরবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তখন শ্রীগৌর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

কেন হেন মাতা তোমার বিরস বদন।
তোমারে বিরস দেখি পোড়ে মোর মন॥ (চৈঃ, মঃ)

তিনি মনে মনে সমস্ত বুঝিতেছেন, তত্রাচ জননীকে প্রশ্ন করিতে ছাড়িলেন না। ইহারই নাম শ্রীভগবানের ভক্তকে পরীক্ষা। তিনি পরীক্ষা করুন, কিন্তু এ কথা শুনিয়া জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিলেন। যে নয়নবারি এতক্ষণ অতি কষ্টে রুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা যেন এক্ষণে প্রবল প্লাবনে কূল ছাপাইয়া চলিল। পুত্রের প্রশ্নোত্তরে কি বলিবেন—সেই নিদারুণ অমঙ্গল বাণী কিরূপে প্রাণের বাছাকে শুনাইবেন! কিন্তু কি করিবেন,—

কহিতে না পারে কিছু সকরুণ কণ্ঠ।
কহিল আমার বধূ গেলা ত বৈকুণ্ঠ॥ (চৈঃ মঃ)

নিমাই মানুষ হইয়া জন্মিয়াছেন, সুতরাং মানুষের মতই তাঁহাকে সকল ব্যবহার করিতে হইবে। তিনি প্রিয়তমার পরলোকগমন বার্ত্তা শ্রবণে নিদারুণ দুঃখে মাথাটী হেট করিলেন। সোণার কেতকী ফুলের মত মনোরম চক্ষু দুইটী জলভরে ছল ছল করিতে লাগিল।

এ বোল শুনিয়া প্রভু বিরস অন্তর।
ছল ছল করে আঁখি করুণার জল॥ (চৈঃ মঃ)

প্রাণপ্রিয়া লক্ষ্মী আর জীবিত নাই। প্রিয়তমার শত স্মৃতি আজ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যখন বিবাহ হয় নাই, লক্ষ্মীর সহিত একদিন গঙ্গার ঘাটে দেখা হইয়াছে, লক্ষ্মী একাকী নাই, সঙ্গে সঙ্গিনীরা আছে কিন্তু তাহার প্রাণে একটী সাধ জাগিতেছে। শ্রীগৌরের ঐ শত চাঁদ লাঞ্ছিত ত্রিলোকবাঞ্ছিত পদযুগল একবার বক্ষে ধারণ করেন। কিন্তু কিরূপে তাহা হইতে পারে ভাবিয়া রমণীসুলভ একটী চাতুরী করিলেন,—

গজমতি হার ছিল গলায় তাহার।
ছিড়িয়া ফেলিল ভূমে পড়িল অপার॥

বাম কর বক্ষে চাপি সেই মুক্তা তোলে।
কোথা পাব কোথা পাব এই বাক্য বোলে॥ (চৈঃ মঃ)

শ্রীগৌর প্রিয়তমার এই কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনি মোহিত হইয়া এক দৃষ্টে তাহার রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন।

"গৌরচন্দ্র লক্ষ্মী প্রতি চাহে এক দিঠে।"

দেবীর সঙ্গিনীরাও মুক্তাফলগুলি খুজিতে লাগিল। দেবীও সেইগুলি খুজিবার ছলে প্রভুর চরণ সমীপে আসায় তিনি রঙ্গ করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন লক্ষ্মীদেবী সেই পাদের ধূলি লইয়া সখীগণের অলক্ষিতে বক্ষে ও মস্তকে দিলেন। এই সমস্ত স্মৃতি আজ বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহার মর্ম্মে বড়ই আঘাত করিল। তিনি প্রিয়তমার প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া প্রবাসে গিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে একবার দেখা দিতেও পারেন নাই। বড় দুঃখে প্রভু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ক্ষণপরে তিনি নিজেই একটু স্থির হইলেন। তখন তাহার বয়স উনিশ বৎসর। দেশবিখ্যাত পণ্ডিত তিনি। অসংখ্য ছাত্র ও আত্মীয় স্বজন চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সকলের মুখের পানে তাকাইয়া একটু লজ্জিত হইলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া মাতাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। চতুর চূড়ামণি মাকে বলিতেছেন,—

"শোক না করিহ তুমি শুন মোর মাতা।
নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লিখেন বিধাতা॥" (চৈঃ মঃ)

কিন্তু শচীর অন্তরের প্রবল দুঃখ কি সহজে যাইবার? তখন নিমাইচাঁদ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন, তিনি মাতাকে বলিলেন,—"মা আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। তুমি শীঘ্র রন্ধন কর, অনেক দিন তোমার হাতে খাই নাই। আমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছি।" নিমাই তিন বার স্নান করিতেন। তিনি সেই আসন্ন সন্ধ্যায় বয়স্য ও ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন।

শচীমা তাহার স্নেহের বাছা নিমাইর মুখখানি দেখিয়া হৃদয়ে অনেক বল পাইয়াছেন। সুতরাং নিমাইর ক্ষুধা পাইয়াছে শুনিয়া,—

"সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা লই সর্ব্ব পরিজন॥" (চৈঃ মঃ)

শ্রীগৌর স্নান সমাপনান্তে দেবগৃহে গিয়া দেবতার আরতি করিলেন। ঠাকুরের ভোগ হইলে মায়ের কাছে গিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। শচীমা কত

দিন তাহার নিমাইকে কাছে লইয়া বসিয়া খাওয়াইতে পান নাই। স্নেহের বাছা তাহার কতদিন পথে পথে ঘুরিয়াছে; হয়ত সময়ে আহার জুটে নাই। বড় স্নেহে তিনি কাছে বসিয়া 'এটা খা, ওটা খা' বলিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। এত সুখেও হৃদয় তাহার দুঃখে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, পুত্র তাহার শয়নগৃহের পানে তাকাইতে পারিতেছে না। তাহার এই সমস্ত আনন্দ যেন কপটতাপূর্ণ। মুহূর্ত্তে শচীদেবীর মুখখানি আঁধার হইয়া গেল। তিনি অলক্ষ্যে চক্ষু দুইটী অঞ্চলে মুছিলেন।

প্রভু আহারান্তে বয়স্যগণের সহিত বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। মনে যাহাই থাকুক না কেন, মুখে সহাস্যে সকলের সহিত কৌতুক করিতেছেন। পূর্ব্বদেশের কথা অনুকরণ করিয়া সকলকে হাসাইবার চেষ্টা করিলেন। গোরকে বহুদিন পরে নিকটে পাইয়া সকলেই আনন্দিত কিন্তু প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সহিত হাস্যালাপে যোগদান করিতে পারিতেছেন না। শচীদেবীও মনের দুঃখে আড়ালে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তখন প্রভু কিছু গম্ভীর হইলেন। মাতার কাছে বসিয়া মধুর বচনে প্রবোধ দিলেন,—

"——মাতা! দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে সে ঘুচিবে কেমনে॥
এই মত কাল গতি কেহ কারো নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন যে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব এ সকল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হইল যে কার্য্য আর দুঃখ কেন তায়॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কে আছে ভাগ্যবতী॥" (চৈঃ ভাঃ)।

প্রভু বলিতেছেন, সকলেই শুনিতেছেন, তাঁহার মুখে যেন মধু বর্ষিত হইতেছে। তিনি আরও বলিলেন,—

"সংসার অনিত্য মাতা সবে কৃষ্ণ সত্য।
অমৃত ছাড়িয়া দেখ বিষ নহে পথ্য॥
অমৃতেরে বিষজ্ঞানে তাহা পরিহরি।
বিষয়ে অমৃত জ্ঞান খাইলে যে মরি॥

লক্ষ্মী বিভা করি চিন্তা নিবারিতে নারি।
সংসার করিল ধন উপার্জ্জন করি॥
কোথা লক্ষ্মী কোথা আমি কোথা এই অর্থ।
যত দেখ অর্থ আদি সকল অনর্থ॥
কমল পত্রের জল যেন স্থির নহে।
তেমন চঞ্চল জীব একত্র না রহে॥
না কান্দ না কান্দ মাতা না কর অক্ষেমা।
গদাধরে জগদানন্দে সমর্পিলা তোমা॥
আর নবদ্বীপ ছাড়ি না যাইব কোথা।
তোমা দেখি মন্দিরে থাকিব শচীমাতা॥ (জয়ানন্দ)

প্রভু এইরূপ বহু মধুর উপদেশ প্রদান করিয়া জননীকে ও প্রিয় বয়স্যগণকে শান্ত করিলেন। তিনি চতুর চূড়ামণি বলিয়া এই ভাবে আপ্তবর্গকে প্রবোধ দিতে পারিলেন। কিন্তু নিজের মনকে বুঝাইতে পারিলেন কি? সেই সরলা-বালার সরলতা মাখা পবিত্র মুখখানি ভুলিতে পারিলেন কি? সেই শান্ত একান্ত নির্ভরা তাঁহার প্রিয়া—যে তাঁহাকে ব্যতীত আর কিছু জানিত না—প্রিয় বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিল তাহার স্মৃতি কি ভুলিবার? যৌবনে যে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া গিয়াছে সে ভাল-বাসার অমিয় মাখান স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া যাইবার নহে। হৃদয়ের সে গভীর ক্ষত কোন দিন শুষ্ক হইবার নহে। যত পুরাতন সে সব স্মৃতি রাবণের চিতার ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে; সাতটী সাগরের জল ঢালিয়াও বুঝি তাহা নির্ব্বাপিত করা যায় না। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, সেই মুখখানি মনে পড়ে, সেই মধুমাখা কথাগুলি প্রাণে জাগে। প্রাণ যেন উধাও হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে চায়। হায়! হায়! কোথায় সে, সেই সাত রাজার ধন অমূল্য মাণিক যে সাত সাগরের অতল জলে চিরতরে লুকাইয়া গিয়াছে। শত হাহাকার বুক ফাটা আর্ত্তনাদের বিনিময়ে ক্ষণিকের তরেও আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সমগ্র প্রাণের অনুভূতি দিয়া যাহাকে আমার বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল—যাহার সহিত ক্ষণেকের তরে মিলনেও চক্ষের সমক্ষে সমগ্র পৃথিবী যেন কৌমুদী-স্নাত নিশিথিনীর মত হাসিয়া উঠিত—সেই যে প্রিয় তাহাকে আর ক্ষণিকের তরেও নিকটে পাওয়া যাইবে না, এ চিন্তা কি মর্ম্মভেদী!

শ্রীগৌর দেবতা, তিনি দেবতার মতই কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরের অনন্ত দুঃখ, অসীম ধৈর্য্য-বলে চাপিয়া রাখিয়া মাতাকে ও আত্মীয়বর্গকে মধুর বচনে প্রবোধ দিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের তুষ্টি বিধান ও লৌকিক আচার পূর্ণ করিবার জন্য অচিরে শ্রীসনাতন মিশ্রের ভক্তি-প্রতিমা কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরের তুমি।

(১)

পর প্রেমের প্রেমিক তুমি পরকে ভালবাস।
পরের ভাল দেখতে জান আপন ভাল নাশ॥
আপন বাঁশি কাটিয়ে ফেলে পর পরের ফাঁদে।
দুর্য্যোধনের বন্দী তুমি বিদুর ঘ'সে কাঁদে॥

(২)

পরের তরে পরাণ কাঁদে প্রিয় পরের ঘর।
আপন ভাবে যে তোমারে তারেই কর পর॥
গর্ভে ধরি আপন মাতা বাঁধা হাতে গলে।
পরের মাতা কোলে ক'রে নাচায় গোপাল ব'লে।

(৩)

আপনকে পর পরকে আপন ক'রতে তুমি জান।
আপন ভুলি পরের বোঝা মাথায় ক'রে আন॥
আপন পিতা বন্দী কাঁদে কারাগারে প'ড়ে।
পরকে ডাক বাবা ব'লে বাধা মাথায় ক'রে॥

(৪)

পরের বেলায় হাজার চোখে টকটকিয়ে দেখ।
আপন বেলায় দুটি আঁখি অন্ধ হ'য়ে থাক॥
চিরকালটা বহে শকড় চরণ কাঁধে ক'রে।
কাঠের তরি হ'ল সোণা একবার পা ধ'রে॥

(৫)

অ[illegible] তুমি পরের [illegible] বেলা।
আপন [illegible] কেশে পরে [illegible] হও কালা
[illegible] নাহি পেল।
পরের ছেলে [illegible] বিদেশ [illegible]॥

(৬)

আপন [illegible] না তুমি পার
আপন মানে ছাই [illegible]
লক্ষ্মী তোমার বক্ষে থেকে অন্ন নাহি পায়;
"দেহি পদ" ব'লে লোটাও গোয়ালিনীর পায়॥

(৭)

যে জন যত আপন ভাবে সেই তত পর অতি।
পরের গালি মিষ্ট, কটু আপন জনের স্তুতি॥
পরমে মনে পড়লে পরে পালাও আপন ছেড়ে।
তাইতে কেঁদে বিনোদিনী রথের চাকা ধ'রে॥

(৮)

পরের তুমি, পরের তুমি, পরের তুমি জানি।
পরের বাছা পর প্রিয় অন্ধ যষ্টিখানি॥
নইলে কেন কাঁথা ঝোলা ডোর কৌপীন ধ'রে।
কাঙ্গাল সেজে কাঙ্গাল ঠাকুর বেড়াও পরের দ্বারে॥

গীত।

আমি কেমনে বলিব, হে নাথ আমারে,
চরণে তুলিয়া নিও।
কেমনে বলিব, তৃষিত এ মুখে,
কৃপাবারি কণা দিও।
আমি ভূমণ্ডলে নিজ কর্ম্ম ফলে,
কুলাল চক্রবৎ ভ্রমি নানা স্থলে,
সারা প্রাণ দিয়ে নারিনু সাধিতে,
আমার যে করণীয়।

যে সব প্রতিজ্ঞা ছিল গর্ভবাসে,
পাসরিনু আসি এ বিষম দেশে,
আমিত ভুলেছি হে অনাথনাথ
তুমি যেন না ভুলিও ॥

শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

গোরা।

গোবিন্দস্ত চ রাধায়াঃ কৃপাবতীর্ণস্ত কলৌ।
আন্তবর্ণৌ সমাধায় "গোরা" ইতি সুবিখ্যাতঃ ॥

ক লি যুগে নদীয়ায় হ'ল অবতার।
খ হতে দেবগণ লাগে চমৎকার ॥
গ ণনা করিয়া দেখে এল রাধাকৃষ্ণ।
ঘ ন ঘন দৃষ্টি করে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
চ ল সবে অবনীতে বলে সুরগণ।
ছ লনা করিয়া বলে ছায়ার নন্দন ॥
জ ন্মিয়া শচীর ঘরে গোরা দ্বিজমণি।
ঝ ঙ্কার করায় জীবে হরিনাম ধ্বনি ॥
ট লাইল যোগীদের যোগ ধ্যান জ্ঞান।
ঠ কাইল দেবতার সেবা পূজা দান ॥
ড ঙ্কা মারি চলিযায় হরিনাম বলে।
ঢ ল ঢল প্রেম দেখি দুঃখে অঙ্গ জ্বলে ॥
ত পন ঠাকুর শুনি এতেক বচন।
থ ত মত লাগি বলে শুন বাছাধন ॥
দ য়া করি প্রভু মোর জীবের লাগিয়া।
ধ রনীর শ্রেষ্ঠ স্থান নবদ্বীপে গিয়া ॥
ন য়নে যাহারে দেখে বলে হরিনাম।
প বিত্র হইল ধরা পূর্ণ মনস্কাম ॥
ফ কিরের বেশে চল যাই নদীয়ায়।
ব মনের ভয় নাই যদি পড়ি পায় ॥

ভ ক্তি করি ছাড়ি যদি দেব অহঙ্কার।
ম তি যদি পদে রাখি আর ভয় কার!
য ম ভায়ার রাজ্যপাট যাবে ব'লে দুঃখ।
য় তন ফেলায়ে কাঁচে ভাব মহা সুখ॥
ল ক্ষ্য যদি থাকে ভাই গোরার চরণে।
ব সত হইবে ধ্রুব নিত্য বৃন্দাবনে॥
শ মনের কার্য্যভার সব ফুরাইবে।
য ড়রিপু কর্ম্মচারী বিস্তার হইবে॥
স ৎ সঙ্গে থাকি সদা ভাব গোরানিধি।
হ রিনাম মহা-মন্ত্র জপ নিরবধি॥
ক্ষ ণকাল ভুল যদি নামের মাধুরী।
পড়িবি বিষম ফেরে অধম "শ্রীহরি"॥

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরাঙ্গাচরণ।

(শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস পাঠক লিখিত।)

জগতের যাবতীয় জীব সুখের জন্ত সর্ব্বদা লালায়িত কিন্তু অনিত্য বিষয় বাসনা সমূলে বিনষ্ট না হইলে যে নিত্য সুখ পাওয়া যায় না তাহা কেহই বড় একটা ভাবিয়া দেখে না বা দেখিবার সুযোগও খোঁজে না। অনিত্য বিষয় বাসনা ক্ষয়ের একটী সমীচীন উপায় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যথা—পদ্যাবল্যাম—

কাষায়াম্বর ভোজনাদি-নিয়মান্নো বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীত-কলিন্দশৈল তনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি॥

অর্থাৎ রক্তবস্ত্র পরিধান, ভোজনাদির নিয়ম, অরণ্যে বাস, শাস্ত্রব্যাখ্যা, মৌনব্রতধারণ অথবা তীর্থপর্য্যটন এ সকল হইতে বিষয় বাসনা ক্ষয় হয় না কিন্তু সৌভাগ্যবতী যমুনা-তীরে নিত্য বিহারকারী শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ ভজন লেশমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার বাসনা ক্ষয় হয়। যাতনার যেটী মূল কারণ তাহা নষ্ট হইলে যেমন আর শান্তিলাভের বাকী থাকে না, তেমনি দুঃখভোগের একমাত্র কারণ বাসনা ক্ষয় হইলে সঙ্গে সঙ্গেই নিত্য সুখলাভ হইয়া থাকে।

"সর্ব্বাণামপি সিদ্ধানাং মূলংতচ্চরণার্চ্চণম্॥"

শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্ম পূজনই সকল প্রকার সিদ্ধির মূল। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"অয়ং সস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।

যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ॥ (১০।৮৪।৩৭)

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজ বিত্তদ্বারা ভগবানের আরাধনাই গৃহীর পরম মঙ্গলের পথ। ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান জীবের একমাত্র সম্বল শ্রীগোবিন্দ চরণ। যদি অনিত্য বাসনা ক্ষয় করিয়া নিত্য সুখ লাভ পূর্ব্বক সুদুস্তর ভবজলধিপার হইবার ইচ্ছা থাকে তবে শ্রীগোবিন্দ চরণ পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতিত শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই।

বিগ্রহ পূজার সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাঁহার ধ্যান, তাঁহার রূপের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন শ্রীচরণ আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেও শ্রীচরণে কি কি চিহ্ন আছে কোন চিহ্ন কি কি কার্য্য সাধন করে ইত্যাদি জানিতে বোধ হয় কোন আপত্তি নাই। তাই শাস্ত্রের সহিত ঐক্য রাখিয়া শ্রীচরণের চিহ্ন সকল ও তাহার মহিমা যথা জ্ঞান পদ্যাকারে প্রকাশ করিলাম, ভক্তগণ আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ করুন।—

মায়াজালে বিজড়িত নানাভাবে নিপীড়িত
হ'য়ে কেন ভবমাঝে এত দুঃখ সইরে।
জনম মরণ কত ভ্রমি ভবে অবিরত
কিন্তু ঘোরা-ফেরা করি সুখলাভ কইরে॥
এতে হবে ফললাভ এতে হবে অসদ্ভাব
ইহা উহা ধরি কেন বৃথা দুঃখ পাইরে।
শ্রীহরি চরণ বিনে গতি নাহি কোন দিনে
কায়মনোবাক্যে ভাই সার কর তাইরে॥
হের রে নয়নদুটী শ্রীচরণ পরিপাটী
সুবরণ সুঠামের তুলনাতো নাইরে।
সে চরণ চিহ্নচয় সই কর পরিচয়
যাবে পাপতাপ ভয় শ্মর পদ ভাইরে॥

(ধ্বজচিহ্ন)

শমন সদাই করিবারে রণ
ষড়রিপু আদি ল'য়ে সেনাগণ
করিতে তোমায় ভীম আক্রমণ
আসিতেছে ঐ সভীমবেগে।
স্মর চরণের ধ্বজ চিহ্নেরে

বিজয় নিশান দেখাও যেমেরে
ভকত হৃদয় কভু না ডরেরে
দেখাইলে ভয় কভু না লাগে ॥

(পদ্মচিহ্ন)

কেতকীকাননে ভ্রমিয়া বেড়াও
বল দেখি তাতে কিবা সুখ পাও
চরণ কমল চিহ্নেতে তাকাও
কণ্টক বেদনা রবেনা আর।
মন মধুকরে কমল মাঝারে
বসাও বারেক হরষ অন্তরে
শ্রীপাদপদ্মের মধু পান ক'রে
ভব ক্ষুধা তৃষ্ণা রবেনা আর ॥

(বজ্রচিহ্ন)

কিছু কিছু করি করিয়া অর্জ্জন
করিয়াছ পাপ পর্ব্বত প্রমাণ
নষ্ট করিতে নহ শক্তিমান
(এবে) তাহে যদি পাও ভয়।
হের ও চরণে বজ্র কি ভীষণ
পাপ গিরিপরে করিলে ঘাতন
হইবে চূর্ণ না কর চিন্তন
(তুমি) পাপেরে করিবে জয় ॥

(অঙ্কুশচিহ্ন)

বাসনা আমার সে মত্তকরী
যায় যথা তথা ভয় না করি
সে যে অতিশয় স্বেচ্ছাচারী
কেমনে বাধ্য করিব তায়।
শ্রীচরণে ঐ অঙ্কুশ রেখা
বিশ্ব মনোহর ঐ যায় দেখা
শাসিব বারণে স্মরি ঐ রেখা
নির্ভয় আর ভয় কি তায় ॥

(যব ও স্বস্তিকচিহ্ন)

ক্ষুধার পীড়নে দেখিলে আঁধার
স্মর যবচিহ্ন যাবে হাহাকার
পাইবে আহার নিখিল সংসার
হইবে হরির ভজনে রত।
স্মর স্বস্তিক হরসিত মনে
তুষিবেন হরি মঙ্গল দানে
অসার ভাবনা কর কি কারণে
তৎপর হও শরণাগত ॥

(ঊর্দ্ধরেখা ও অষ্টকোণ চিহ্ন)

শ্রীচরণের ঐ ঊর্দ্ধরেখা হের
ঊর্দ্ধগতির বাসনা প্রপূর
নিম্নগামী হ'য়ে দুঃখ ভোগ কর
স্মরণ করিয়া ভাসরে সুখে।
অনিমা লঘিমা প্রভৃতি চাও
সাধনা করিলে তাহাও পাও
ভক্তি সিদ্ধি আট বাসনা পূরাও
অষ্টকোন ঐ চিহ্ন দেখ ॥

(ধনু ও শঙ্খচিহ্ন)

ভকতের অরি নাশ করিবারে
শ্রীহরি চরণে ধনু রেখা ধরে
কি ভয় কি ভয় স্মররে স্মররে
অরি দল মাঝে বিজয়ী হও।
গম্ভীর নির্ঘোষে করিয়া বাদন
ভক্তের শত্রুরে করিতে তাড়ন
শঙ্খচিহ্ন হরি করেন ধারণ
স্মরণ করিয়া অভয় হও ॥

(চক্রচিহ্ন)

যুগ যুগান্তরে ধর্ম্ম রক্ষি বারে,

বিবিধ কল্পেতে নানা অবতারে
ধর্ম্মদ্বেষী নাশি এ চক্র দ্বারে
করেন শতত ভক্ত রক্ষণ।
হেরিয়ে সম্মুখে বিবিধ বিপ্লব
যদি পাও ভয় হরি ভক্ত সব
স্মর চক্রচিহ্ন যাবে ভয় সব
অনায়াসে হবে অরি দমন॥

(ত্রিকোণচিহ্ন)

রজগুণে ব্রহ্মা করেন সৃজন
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু করেন পালন
তমোগুণে শিব করেণ নিধন
ভিন্ন ভিন্ন গুণ করেন ধারণ।
এক হরি তিন গুণের আশ্রয়,
ত্রিকোণচিহ্ন তার পরিচয়
মুক্ত মুমুক্ষু বিষয়ী আশ্রয়
পুরিবে নিশ্চয় করিলে স্মরণ॥

(কলসচিহ্ন)

হের হের ঐ কলস চিহ্নেরে,
অমৃতে আছে ও কলস পূরে
অভিলাষি যত চলহ সত্বরে
কর আনন্দেতে অমৃত পান।
বিষয় মদিরা পানেতে বিহ্বল,
কেন নাশ কর আধ্যাত্মিক বল
সুধা তেয়াগিয়া কে চাহে গরল
পৃথিবীতে হেন কেবা অজ্ঞান॥

(চন্দ্র ও আকাশচিহ্ন)

কুমুদী রহিয়া লক্ষ ক্রোশান্তরে
তবু চাঁদে হেরি সুখি সে অন্তরে
পদ অনুগত তুমিও তাসরে
আনন্দ সাগরে হরিপদ শশি।
পৃথিবী ব্যাপিয়া গগন মণ্ডল
সে গগনাশ্রয় ও চরণতল
ব্যাপিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
দেখান মহিমা পদে প্রকাশি॥

(মৎস্য ও গোষ্পদ চিহ্ন)

তার অনুগত কামিনীগণেরে,
তুষিতে পুরিতে তাদের কামেরে
ধরেছেন হরি মৎস্য চিহ্নেরে
অপ্রাকৃত কাম স্মরিলে পূরে।
চরণে আশ্রয় ল'য়েছে যে জন,
অনায়াসে ভব তরিবে সেজন,
ডরেনা উর্ম্মি হেরে অগনণ
গোষ্পদ রেখা যদি গো স্মরে।

(জম্বুচিহ্ন)

এ ভারত ভূমে হয় যত বার
হ'য়েছেন ভগবান অবতার,
জম্বুদ্বীপে তার সর্ব্বলীলা সার
সমগ্র লীলা প্রকট হয়।
জম্বুদ্বীপ বাসী সে লীলা রসেতে
ভাসি ভাগ্যবান হ'য়েছে ধরাতে,
তাই জম্বুচিহ্ন ধরি চরণেতে,
ভারতবাসীর প্রাধান্য কয়॥

(ছত্রচিহ্ন)

ত্রিতাপ রোদ্রেতে দগ্ধ পুড়ে মর
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি সতত কর,
কিন্তু সে দাহিকা শক্তি প্রখর,
পোড়াতে ছাড়েনা শরীর তব।
হের শ্রীহরির রাতুল চরণে,
শোভিছে ছত্র উজ্জ্বল বরণে,

ঐ ছত্রতলে মস্তক ধারণে,
তাপত্রয় জ্বালা এড়াবে জীব ॥
ধরেছেন "বলী" যে চরণ শিরে
ঘন্ত গয়াসুর যে চরণ ধরে,
যে চরণ যোগী সদা ধ্যান করে,
সে চরণ বিনা উপায় কই।
এখন তোমার হবে যে কামন
স্মরিলে চরণ অভাব হবে না,
ছাড় ছাড় মন যত কুবাসনা,
সার কর রাঙ্গা চরণ ওই ॥

--0--

গৌড়ীয়-ভজন-বিভ্রাট।

গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (১৩২৭) মাসের ভক্তি পত্রিকায় "শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলভজন" শীর্ষক প্রবন্ধপাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। প্রভু সন্তানগণ এ সকল বিষয়ে এখনও নিশ্চেষ্ট কেন তাহা বুঝিলাম না।

হায়! হায়! কালের কি বিচিত্র গতি, দিনে দিনে হইল কি। এই জন্যই শ্রীঅদ্বৈতবিলাস গ্রন্থে বর্ণনা হইয়াছে,—

"এইরূপে তিনশত বর্ষ যাবে চলি।
তারপর সম্প্রদায়ে প্রবেশিবে কলি ॥"

প্রকৃতই আজ এতদিন পরে, এই মহাবাক্যটী কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, "শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল যখন একাঙ্গভুক্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তখন আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের পৃথক রূপে পূজা, অর্চ্চনার প্রয়োজন কি?"

তজ্জন্য আবার কেহ কেহ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পৃথক মন্ত্রসকলও প্রচার করিতেছেন।

আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, "অন্যান্য যুগে যেমন ভগবান অবতীর্ণ হওয়ায়, যুগলমূর্ত্তিতে তাঁহার আরাধনা হইয়া থাকে যেমন শ্রীসীতারাম, শ্রীরাধা কৃষ্ণ, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত একাসনে বসাইয়া প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে অর্চ্চনা করা হউক। কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীতে পরকিয়া রসেরও অভাব দেখা যায় না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সঙ্কীর্ত্তন-বিহারী ছিলেন, তখন কোন কোন দিন রাত্রি প্রভাত করিয়া বাড়ী আগমন করিতেন, সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মানিনী নায়িকার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। এবং শ্রীমহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা বলিলেও দোষ হইতে পারে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে কথাগুলির উত্তরে কেবল হাস্য করা ভিন্ন আর অন্য উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই সকল কথার জন্যই অনেকে বলেন যে, "মা অপেক্ষা বেদনী যে তাহাকে বলে ডাইন"—এক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপারও হইয়াছে তদ্রূপ। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যাহা কখনও কল্পনাতেও মনে করেন নাই, তাহাই এক্ষণ হাটে, বাজারে সর্ব্বসাধারণ লোকের মুখে শুনা যাইতেছে, ইহাপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে?

শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিখানি কি, তাঁহার তত্ত্ব কি এবং কি জন্যই বা তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাই যখন নিরূপণ করা হইতেছে না বা করিতেছেন না, তখন তাঁহাদিগকে কি বলা যাইতে পারে?

তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি আদ্যন্ত ভালরূপে পাঠ করেন, অভাবতঃ ঐ গ্রন্থের আদির তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদটী একবার মনোযোগ করিয়া দেখিবেন, তবেই সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে ও প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কেবল শ্রীনবদ্বীপ বিহারী রূপে প্রতিষ্ঠা করিলে যে, তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হইয়া পড়ে! নবদ্বীপ-বিহারী কেবল যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করায় তবেই তাঁহার পূর্ণত্বের প্রকাশ পাইয়াছিল ইহাই অভিজ্ঞের মত।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হওয়ার কারণ যাহা, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য প্রণেতা এবং শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাশয় বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদির প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

অর্থাৎ—শ্রীমতী রাধিকার প্রণয় মহিমাই বা কিরূপ, আর, যে প্রণয় দ্বারা আমার এই অপূর্ব্ব অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সম্পূর্ণ আস্বাদন করেন সেই মাধুর্য্যের আস্বাদনই বা কিরূপ, এবং আমার অনুভবে রাধিকার যে প্রকার সুখানুভব হয়, সেই সুখই বা কিরূপ, এই তিন প্রকার সুখানুভব লাভেচ্ছায় শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিতে আঢ্য অর্থাৎ আবৃত্ত হইয়া শ্রীশচীমাতার গর্ভরূপ সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপ হরি পূর্ণচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অনেকে এই ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন

ভাবে করিয়া থাকেন কিন্তু মূলে কোনই গোল নাই।

এই তিনটী অভিলাষ পূর্ণ করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান প্রয়োজন। আর যুগ প্রবর্তন করা কেবল আনুষঙ্গিক কার্য্য মাত্র।

প্রেম রস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হইলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥
এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
প্রেম ভক্তি শিখাইবে আপনি অবতরি।
রাধা ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।

* * * * *

রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ, দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি।
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥

ইহাই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ। এই অবস্থায় তাঁহাকে কেবল নদীয়া-বিহারী রূপে সংস্থাপন করিয়া, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বামে বসাইয়া অর্চ্চনা করিলে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে কয়জন তাঁহাকে মানিবে, এবং তাঁহার পূর্ণত্বই বা প্রাপ্ত হইবে কিরূপে?

যাহাই হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব কি, এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্ব

তাহা না জানিয়া বা না শুনিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বসাইয়া অর্চ্চনা করিলে চলিবে না। সর্ব্বাগ্রে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বামে বসিবার তাঁহার অধিকার আছে কি না, তাহা দেখা উচিৎ। কারণ সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার প্রেম লাভ করিবার জন্ম সর্ব্বদাই লালায়িত, এখনও পর্য্যন্ত যিনি ব্রজের বিল্ববনে তপস্যা করিয়াও যাঁহাকে লাভ করিতে পারেন নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর বামে বসাইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করা কি সম্ভব হয়? *

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রথমাঙ্কে ৩৭ শ্লোকে অধর্ম্মের সহিত, কলিরাজের কি কথোপকথন হইয়াছে তাহা শুনিলেই সকলের ভ্রম নিরসন হইয়া যাইবে, যথা—

ভূবোংংশ রূপামপরাঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়েতি
বিত্তাং পরিণীয় কান্তাং।
বৈরাগ্য শিক্ষাং প্রকটী করিষ্যন
হাস্যত্যথৈ নাং সন বাং নবীনঃ।

সেই দেব দেব পৃথিবীর অংশ স্বরূপ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া জগতে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার নিমিত্তই নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া সেই ষোড়শী প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিবেন। ইহাই হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলাতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিলাস করিবার অবসরই বা কোথায়? কারণ তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী রূপে সদাসর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে বিরাজিত।

এই জন্য শ্রীগৌর-লীলামৃত বর্ণিত প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থ সকলে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত বিবাহ ব্যতিত অন্য কোন কথাই বর্ণিত হয় নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত সকল আপনাপন অনুরাগ বশতঃ যাহা করিয়াছেন তাহাই উত্তম হইয়াছে, কিন্তু কেহই কখনও কোন স্থানে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বামে রাখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা স্থাপনা করেন নাই। আর ইহা কখন শুনাও যায় নাই এবং দেখিতেও পাই নাই। কি জানি পরে আরও কত দেখিব!

* শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা সকলকেই জানেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বামে বসাইয়া লক্ষ্মী দেবীকে বঞ্চিত করিবার কারণ কি? আমাদের মনে এ সন্দেহ সহজেই আইসে। (ভঃ সঃ)

কেহ কেহ বলেন যে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শাক করিয়া কথা একেবারেই মিথ্যা কথা। তবে ইদানীং শুনিতে পাওয়া যায় নবদ্বীপে ভেট বা দর্শনী আদায়ের জন্য কেহ কেহ করিয়াছেন। ব্যং বার জন্য করিয়াছেন উত্তম কথা। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাই যে প্রমাণ হইবে তাহার কোন কারণ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাতে, শ্রীগদা পণ্ডিত গোস্বামী, প্রভুর সমীপে সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেন, তাহার প্রমা এই দেখুন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গের শেষে ১২৮।১২৯ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"স তু গদাধর পণ্ডিত সত্তম সততমস্য সমীপস্থ স্থ...

অনুদিনং ভজতে নিজজীবিত প্রিয়তমং সমতিস্পৃহয়া যুতঃ

নিশি তদীয় সমীপগতস্থিরঃ শয়ন মুৎসুক এব কৃতাতিমঃ

বিহরণামৃতমস্য নিরন্তরং সমুপভুক্ত মনেন নিরন্তরং।"

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাধু-শ্রেষ্ঠ গদাধর পণ্ডিত নিরন্তর মহাপ্রভুর নিকটস্থ হইয়া প্রতিদিন নিজ প্রিয়তম প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গকে অতিশয় স্পৃহা সহকারে ভজনা করিতেন। এবং প্রতিদিন রজনীতে মহাপ্রভুর নিকটে স্থিরভাবে ঔৎসুক্য সহকারে শয়ন করিতেন ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবও নিরন্তর এই গদাধরের বিহারামৃত উত্তমরূপে উপভোগ করিতেন। ইহা ভিন্ন ঐ গ্রন্থের ষষ্ঠসর্গের ১২।১৩।১৪ শ্লোক পাঠ করিলেই অনেকের সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। আবার শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে বর্ণনা হইয়াছে—

মহা পরকাশে প্রভু বিশ্বম্ভর খায়।
গদাধর যোগায় তাম্বুল, প্রভু খায়॥
ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত আদি সব মহাপাত্র॥
মুরারিরে আজ্ঞা হইল মোর রূপ দেখ।
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেখ॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহা ধনুর্দ্ধর॥
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥ ইত্যাদি
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।

দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর ॥
গদাধর প্রাণনাথ মুরারি ঈশ্বর।

* * *

শ্রীঃ চিঃ ১৮।১৯।২০।২২।২৩।২৪।২৬ অধ্যায়ে অনেক কথাই বর্ণনা আছে তুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। অন্ত্যলীলার তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণন হইয়াছে যে,—

নিরন্তর গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কাত ॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে ॥

এই জন্যই বলিতেছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বসাইয় অর্চনা করিবার অবসর কোথায়? বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদি ১০ অধ্যায়ে বর্ণনা হইয়াছে যে,—

স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণে না করিলেন বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ নাগর" হেন স্তব নাহি বলে ॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধশাস্ত্রে এবং শ্রীগোস্বামী পাদগণ যাহা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে যত সংক্ষেপ হয় তত্ত্বগুলি উদ্ধৃত করা হইল। যথা—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ১৪৭।১৪৮।

শ্রীরাধা প্রেম রূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যাম সুন্দর বল্লভা
সাদ্য গৌর প্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম মধ্যে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতং—

গদাধর প্রাণনাথ আর্ত্তিহা শরণ প্রদঃ।
আকিঞ্চন প্রিয়প্রাণ গুণগ্রাম জিতেন্দ্রিয় ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত মহাপ্রভুর অষ্টকালিন স্মরণ মধ্যে—

শ্রীরাসাদিবিলাসবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট
ন্ তৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈঃ গায়দ্ভিরুল্লাসয়ন্।

শ্রীমান্ শ্রীল গদাধরেণ সহিতো নন্তাং
স্ব গৌর শয়নালয়েস্বপতি যস্তং গৌরমদ্যেমী

অগ্নি সংহিতায়াং চতুর্বিংশ.ত-তমোল্লাসে—

ব্রজ তত্রাপি যৎপৃষ্ঠে ত্বংহি শ্রীরাধিকা স্বয়ং
গদাধরঃ পণ্ডিতো সৌ বিখ্যাতা ধরণীতলে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদে—

পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
গদাইর গৌরাঙ্গ করি সর্ব্ব লোকে গায়॥

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকে অনেকেই উদাহরণ দিয়া থাকেন, সেই শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি দাস সরকার ঠাকুরের কৃত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গুণ বর্ণিত একটী পদ্য এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইতেছে। যথা—

"আমোর করুণা বান, অনাথ জনার প্রাণ, গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
জগতের চিত চোরা, গোকুল নাগর গোরা, যাঁর রসে উল্লাস সদাই॥
যাঁর মুখ নিরখিয়া, ভ্রমে পড়ে মুরছিয়া, তিলেক ধৈরজ নাহি মানে।
জলকেলি পাশাসারি, ফাগু খেলা আদি করি, কীর্ত্তনে নর্ত্তন যাঁর সনে॥
গদাধর প্রভুগুণে, দিবানিশি নাহি জানে, সুখের সায়রে সদা ভাসে।
প্রভুর মনেতে যাহা, সময় বুঝিয়া তাহা, যোগায়েন রহি প্রভু পাশে॥
একদিন শচীমাতা, তাম্বুল অর্পণে তথা, দেখি গদাধরের প্রতাপ।
ধরিয়া গদাইর হাতে, কহয়ে নিমাঞির সাথে, সতত রহিবে মোর বাপ॥
গৌরাঙ্গ গমন যথা, গদাধর চলে তথা, তিলেক ছাড়িতে নারে সঙ্গ।
শ্রীবাস অদ্বৈত সনে, কত সুখ ক্ষণে ক্ষণে, দেখি গোরা গদাধর রঙ্গ॥
গদাই গৌরাঙ্গ অঙ্গে, চন্দন লেপিয়া রঙ্গে, মালতির মালা দিয়ে গলে।
না জানি কি করে হিয়া, প্রাণনাথে নিরখিয়া, ভাসে দু'টী নয়নের জলে॥
প্রভুর শয়ন ঘরে, শয্যার রচনা করে, শয়ন করিলে গোরা রায়।
সদাই সমীপে শুইয়া, পূর্ব্ব কথা মৃত দিয়া, কত ভাব উথলে হিয়ায়॥
গৌরাঙ্গ গোকুলশশি, এ হেন আনন্দে ভাসি, নবদ্বীপে করিয়া বিহার।
জানাইয়া গদাধরে, পুরব প্রেমের ভরে, করিলা সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥

দুই পা, যে হইল গদাইর মনে, তাহা কে কহিবে এক মুখে।
গদা সহে, গিয়া গোপীনাথ গৃহে, বাস নিয়মিত সেবা সুখে॥
াসুখে, পণ্ডিতগোসাঞির মুখে, শুনেন শ্রীভাগবত কথা।
তিন ১৮।২৩ গানে, ধারা বহে দুনয়নে, কিবা সে অদ্ভুত প্রেম প্রথা॥
চয়ে উদ্ধৃত। হৈতে, গৌরমণ্ডল পথে, গমন করিতে বৃন্দাবনে।
র্দ্ধ যাহা, সেইক্ষণে ছাড়ি তাহা, চলে নিজ প্রাণনাথ সনে॥
ৌর গদাধর দোঁহে, সে সময় যাহা কহে, তাহা শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে।
কত না শপথ দিয়া, গদাধরে ফিরাইয়া, চলে প্রভু কাতর অন্তরে॥
গদাই গৌরাঙ্গ বলি, কাঁদে দুই বাহু তুলি, ভূমে পড়ে মূরছিত হইয়া।
সার্ব্বভৌম আদি যত গদাধরে কহি কত, নীলাচলে চলে যত্নে লইয়া॥
গদাধর ব্যাকুল প্রাণ, না ভায় ভোজন পান, বহে বারি নয়ন যুগলে।
কে বুঝে এ প্রেমধার, কতক দিবসে গোরা, আসিয়া মিলিলা নীলাচলে॥
পরাণ নাথেরে পাইয়া, গদাইর আনন্দ হিয়া, বিচ্ছেদ বেদন গেল দূরে।
আহা মরি মরি ভাই, ভুবনে উপমা নাই, গদাইর গুণে কে না ঝুরে॥
প্রভু নিত্যানন্দ ভালে, যাঁর লাগি নীলাচলে, আনিলা তণ্ডুল গৌর হৈতে।
গদাধর পাক কৈল, ভক্ষণে যে সুখ হইল, তাহার তুলনা নাই দিতে॥
নিত্যানন্দ বিমুখেরে, গদাই দেখিতে নারে, সে না দেখে গদাই বিমুখে।
কহে দাস নরহরি, গাও গাও মুখ ভরি, এ হেন গদাইর গান সুখে॥"

এবার আমরা এইখানেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম, বারান্তরে আবার এ বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। *

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী।

* ২।৩টী প্রবন্ধ আমরা এ সম্বন্ধে পাইয়াছি, সকলগুলিই প্রকাশিত হইবে। আমাদের মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে আরও ভক্ত পাঠকগণের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি। কাহারও সহিত বিবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে যে বাদ প্রতিবাদ প্রকাশ করা হইতেছে ইহা দ্বারা সত্য নিরূপিত হউক এবং ভ্রান্ত মতের সংশোধন হউক ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। যাহা হউক, আগামী বারে পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের প্রবন্ধ প্রকাশ করা যাইবে।

(ভঃ সঃ)

অষ্টাদশবর্ষ সম্পূর্ণ।